# গীতা শ্রী বিষ্ণু মোক্ষ

শ্রী সুদীপ কুমার ব্যানার্জ্জী

**সম্পাদনা ঃ**

শ্রী শ্রী আদ্যানাথ ট্রাস্ট

২৬/এ, কবি কিরণধন চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী

**প্রথম সংস্করণ ঃ**

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

**প্রচ্ছদ ঃ**

গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী

**অক্ষর বিন্যাস ঃ**

তাপসী আচার্য্য

**মুদ্রক ঃ**

শান্তি মুদ্রণ

৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন,

কল - ৯

## ।। উৎসর্গ ।।

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ও গুরুমায়ের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।
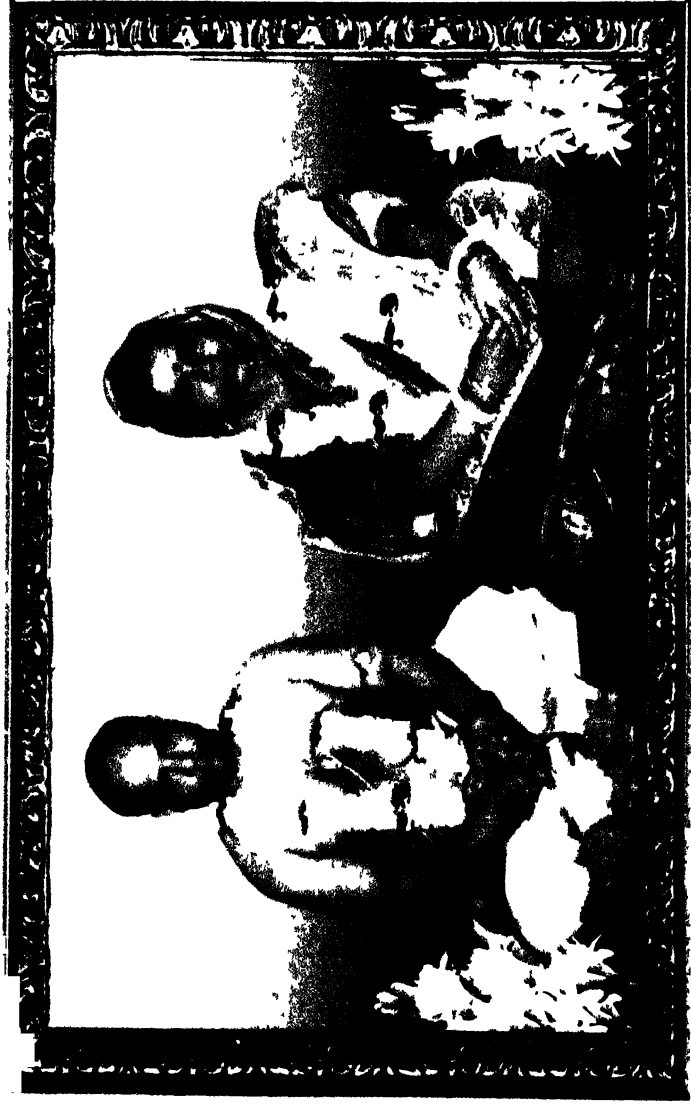
ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

# ভূমিকা

বর্তমান যুগে মানুষ সর্বদা ছুটে চলেছে তার কামনাকৃত বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে। যতই সে ছুটছে ততই সে জীবনযন্ত্রণায় হাবুডুবু খাচ্ছে এবং বৃষ্টিহীন ছেঁড়া মেঘের ন্যায় বিচরণ করছে। শান্তি চাইছে, কিন্তু পাচ্ছে না। ক্ষণিকের আনন্দ, ক্ষণিকের সুখ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেও সেই পথে ভেসে যাচ্ছে, আর প্রতি পদে পদে আঘাত পাচ্ছে। আর এই আঘাত পেতে পেতে নিজেকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে এক সময় আত্মহননের চেষ্টা পর্যন্তও করে ফেলছে।

জীবন হল ঈশ্বরের দান বা সৃষ্টি। তাকে নষ্ট করবার অধিকার কারুর নেই। কেউ যখন জীবন সৃষ্টি করতে পারে না, তখন তাকে শেষ করবার অধিকার তার নেই। "শান্তি" এই কথাটি খুবই ছোট কিন্তু তার ব্যাপ্তি বিশাল।

শ্রীমার কথায় — "শান্তি যদি চাও তবে নিজে শান্ত হও।" হ্যাঁ, নিজেকে শান্ত করতে পারলে তবেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া সম্ভব। আমরা সর্বদা আমাদের মনের দৌরাত্ম্যের মধ্যে বিচরণ করছি, মন যা চাইছে, যা বলছে তা পরিপূর্ণ কিভাবে করা যায় তার চেষ্টা করছি। মন হল অশান্ত এবং এই মনই হল সকল অশান্তির কারণস্বরূপ। এই মন শান্ত হলে তবেই আমরা শান্ত হব।

পুরাকালে বহু মুনি-ঋষি ঈশ্বরকে আপন দেহের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ দেখে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং চিরশান্তির রাজ্যে আপন আসন স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের দেখানো, বা তাঁদের উপদিষ্ট পথই হল প্রকৃত শান্তি বা মুক্তির পথ। সেই পথই অনুসরণ করা হল আমাদের প্রকৃত রূপে কর্তব্য। বর্তমান দ্রুততম যুগে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের কথা ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়েছি, তিনি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সর্বদা জ্বলন্ত অবস্থায় বসবাস করছেন। এক সময় এই ছুটতে ছুটতে যখন ছোটার ক্ষমতা কমে যাবে তখন বার্ধক্য এসে পড়বে আর দেহ কালের নিয়মে কালের করাল গ্রাসে পড়ে পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবে। প্রাণ— যা আজ আছে কাল শেষ হয়ে যাবে, সেই প্রাণকে ধরাই হল আমাদের একমাত্র কাজ। এই প্রাণকে ধরতে পারলে এবং এই প্রাণের কর্মের দ্বারা আপন মনকে স্থির করতে পারলে তবেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা সম্ভব— যা মুনি-ঋষি উপদিষ্ট সনাতন পথ।

প্রাণকর্ম করতে গেলে সদ্‌গুরুকরণের বিশেষ আবশ্যক। তিনি ব্যতীত প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি কি, তা জীব উপলব্ধি করতে পারে না।

গীতাই হল এই প্রাণকর্ম করবার Theory স্বরূপ। এই গীতার প্রতি অধ্যায় হল এক একটি প্রাণকর্মের সোপান। আমি বর্তমানে এই গীতার মধ্যেকার শ্লোকের ব্যাখ্যা গুলির সঙ্গে প্রাণকর্মের কি সম্পর্ক তা বোঝাবার চেষ্টা করেছি মাত্র, আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বা বিচার বুদ্ধিতে ও আমার শ্রীশ্রী পরম দয়াল গুরুদেবের কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা লেখার আকারে প্রকাশ করেছি মাত্র।

তাই আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব ও পরমা আরাধ্যা গুরুমাতা ঠাকুরাণীব নামানুসারে এই গীতার নাম ''গীতা শ্রী বিষ্ণু মোক্ষ'' রাখলাম। কারণ প্রাণকর্ম হল সম্পূর্ণ গুরুমুখীবিদ্যা। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত প্রাণকর্মের বা গীতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাধকের পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর নয়। তাই এই বইখানি আমি আমার পরম আরাধ্য ও পরমপ্রিয় শ্রী গুরুদেব এবং পরমারাধ্যা গুরুমাতা ঠাকুরাণীর পদতলে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

ঐ নামকরণেব অপর আরেকটি তাৎপর্য্য রয়েছে, তা হল — পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রী বিষ্ণুরূপী গুরুদেবের বিশেষ কৃপার দ্বারা সাধক গীতারূপী প্রাণকর্মে ব্রতী হলে, সাধক মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাই এই বইয়ের নাম ''গীতা শ্রী বিষ্ণু মোক্ষ''।

এই বইটি লিখতে আমায় সাহায্য করেছে, সিন্‌হা ঠাকুর, দিলীপদাদু, বুবুলদা, সুচিদি, দিলুদা, সন্দীপদা ও সকল ক্রিয়ান্বিত ও ক্রিয়ান্বিতারা।

এই বইটি লিখতে আমি সকল সময় শ্রী শ্রী পরম আরাধ্য দেওঘবের বাবার ''শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা''র বিশেষ সাহায্য নিয়েছি। তাই বহু ক্ষেত্রে হয়তো দেওঘরের বাবার গীতার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকলেও থাকতে পারে।

এছাড়া এই বইটির জন্য বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী সে বইয়ের প্রচ্ছদপট, ছবি ও কমপিউটারের সকল কাজ সম্পাদন করেছে। তাই পরম গুরুদেবের নিকট এদের সকলের আত্মিক উন্নতি প্রার্থনা করি। এই পুস্তকটি পড়ে যদি প্রাণকর্মীরা এবং পাঠক-পাঠিকারা সঠিক শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন, তাহলে আমার মত অধমের এই কাজ করা চির সার্থক হবে।

ইতি —

গুরুসেবক

# সূচীপত্র

ওঁ

শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ

ওঁ

# প্রস্তাবনা

জীবনে আমাকে যে কোনদিন লিখতে হবে তা আমি কোনদিন ভাবিনি, দাদু আমাকে অনেকবার বলেছেন "তুই লেখ্ না", কিন্তু তাঁর কথা বোঝার মত ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। তাই আমি তাঁকে একটা কথাই বলতাম, লিখব, নিশ্চয়ই লিখব, তুমি বলবে আর আমি লিখব। আজ লিখতে বসে তাঁর এই কথাগুলো বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে।

১৬/০১/১৬০০ তারিখের কথায় আসি। তখন সন্ধেবেলা, দিলীপদাদু হঠাৎ আমি আসতেই আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, এই শোন, আড়ালে চল, কথা আছে। বলে সে মন্দিরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল যে, "আচ্ছা দাদুর এই লিখিত নির্দেশ নামাগুলো কাকে দিয়ে পড়ানো যায় বলতো?" আমার উত্তর শোনার আগেই বলে দিল, "না, তুমি পড়তে পারবে না"। আমি অবশ্য সুচিদির নাম করেছিলাম, কারণ দাদুর হাতের লেখা ওর থেকে ভাল আর কেউ বুঝতে পারতো না।

তারপর নীচে হল ঘরে একের পর এক নির্দেশনামা পড়া হতে লাগল। ঘোষণা পত্রে আমাকে তিনি পরবর্ত্তী প্রচারক রেখে গেছেন শুনে দাদুর কথা সব মনে পড়ে যেতে থাকছিল বলে চোখ জলে ভরে আসছিল, আর মনে পড়ে যাচ্ছিল যে তাঁর উপর নির্ভর কতটুকু আমরা করতে পারি, সবাই আমরা তাঁর কাছে নেবার জন্য আসি,— কেউ কি তাকে কিছু দিতে আসি, না তাঁকে কিছু দিতে পারি! হ্যাঁ, দিতে পারি শুধু তাচ্ছিল্য, তিরস্কার আর আমি করব, আমি দেখব, আমি ছাড়া আর কেউ কিছু করবে না, কেউ তাঁকে দেখবে না— এই সব 'আমি-আমার' বোধকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে চলি। আর তিনি এই সকল তিরস্কার মস্তকে ধারণ করে শুধু আমাদের দিয়ে গেছেন বুকভরা পুরস্কার! এই ভেবে আরও বেশী করে কান্না আসছিল। পাঠক হয়তো ভাবতে পার যে আমি কাঁদছি কেন? আমি কাঁদছি এই ভেবে যে সবাইয়ের সকল কথা বলার

মত, শোনার মত, বোঝার মত এবং তাঁর উপদেশ দেওয়ার মত একজন লোকের দেহ তোমাদের সামনে খাড়া হল কিন্তু আমার-কথা বলার, উপদেশ শোনার, ভালবাসা জানানোর তো আর কেউ রইল না। কেউ তো আর বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বলবে না—"তোরা ছাড়া তো আমার— আর কেউ নেই রে!" সেই অভাব যে কত যন্ত্রণাদায়ক, সেই চির শীতল বটের আচ্ছাদন তো আর আমার মাথায় নেই, এই ভেবে আমি কাঁদছি। তিনি লিখিতভাবে আমাকে তাঁর স্থানাধিকারী বলে ঘোষণা করে গেছেন।

এরপর থেকে শুরু হয় আমার পরীক্ষা দেওয়ার পালা। একগুরুকে ছেড়ে অন্যগুরুকে মেনে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু একথা সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে গুরু কোন দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয় তিনি সর্ব ব্যাপক, গুরু কোন দেহ নয়, সে হল একটি শক্তি।

মানুষ যেমন মৃত্যুর পর বিন্দুতে লয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দু থেকে সূচনা হয়। গীতায় যেখানে বলেছে এক বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর বস্ত্র পরিধান করা, গুরুও সেইরূপ। গুরু কে? যাকে তুমি প্রত্যহ ক্রিয়ার আসনে বসে যোনিমুদ্রায় দর্শন কর, সেই প্রকৃত গুরু— সেই ভগবান আত্মনারায়ণ। আর এই গুরুশক্তি হচ্ছে, যে তোমায় দর্শন করাতে সাহায্য করে। কারণ সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, গুরু হল মাঝের সেই সেতু-বন্ধন যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। তিনি হলেন সেই মহাসিন্ধুর চিহ্নিত কান্ডারী। মহাসিন্ধুর ওপারে যে সঙ্গীত সর্বদা অনুরণিত হচ্ছে অর্থাৎ যে 'ওঁ'কার ধ্বনিত হচ্ছে তা তোমার শ্রুতিগোচরে তিনি নিয়ে আসেন।

আর গুরুশক্তি হল গুরুদেব যাকে এই কাজ প্রচার করবার আদেশ দেন, এই শক্তি তার ভিতর সঞ্চার বা বিস্তার লাভ করে। যেমনঃ — কাশীর বাবা থেকে দেওঘরের বাবা, তারপর দেওঘরের বাবা থেকে বলাগড়ের বাবা, আবার বলাগড়ের বাবা থেকে হাওড়ার বাবা, আবার হাওড়ার বাবা থেকে উত্তরপাড়ার বাবা—অর্থাৎ তুমি একটি পাত্রে জল রাখলে তারপর সেই পাত্রটি

থেকে জল অপর পাত্রে তার থেকে অপর পাত্রে, সেইরকম ব্যাপার।

তিনি হলেন সর্ববিষয়ের কর্তা— সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী, তাঁব অবস্থান সর্বব্যাপী। তাই তাঁর কোনরূপ অসম্মান করা মানে স্বয়ং শ্রীগুরুর আদেশকে এবং তাঁকে অপমান করা। তার ফলে তোমরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়বে, তোমাদের ক্রিয়া আঘাত প্রাপ্ত হবে। তাই তাঁকে মেনে না নিতে পার, তাঁকে অপমান বা তাঁকে অমর্য্যাদা করো না— এতে তোমাদের শুধু পাপ বৃদ্ধি পাবে। তাই সদাসর্বদা সতর্কতার সঙ্গে পথ চলবে, কারণ — আমাদের ইন্দ্রিয়দমনের কাজ এই ক্রিয়া, তাই ইন্দ্রিয়রা চাইবে আমাদের বিপদে ফেলতে, তার থেকে মুক্তির জন্য গুরুকে স্মরণ করতে হয়— বাঁচালে সেই বাঁচাবে, রাখলে সেই রাখবে। ফেললে, আবার সেই কোলে তুলে নেবে। তাঁর চেয়ে বড় বান্ধব, তাঁর চেয়ে বড় সুহৃদ তোমার আর কেউ নেই। তাই আমার শ্রীগুরুর মুখে শোনা কথাটি বলি, "যে ভগবান রুষ্ট হলে গুরুদেব তার ব্যবস্থা করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে তাঁকে বাঁচাবার বা তাকে মুক্ত করার বা মুক্তি দেওয়ার আর কেউ থাকে না"। তখন চারিদিক অন্ধকার আর তার মধ্যে গুমরে গুমরে নিজেকে মরতে হয়, সেখান হতে হাতে ধরে টেনে তোলার কেউ থাকে না।

মানুষের মন হল যত নষ্টের মূল। সে সদাসর্বদা তাকে নাচিয়ে বেড়ায়। মনের দুটি দিক আছে - এক হল সুমতি এবং অপরটা হল কুমতি। কিন্তু আমার বোধে বলে মানুষের মনের তিনটি দিক আছে - এক হল সুমতি যে সর্বদা যেটা ভালো বা যা করলে তোমার মঙ্গল হবে বা কল্যাণ হবে সেদিকে সে তোমায় সাহায্য করে, আবার অপরটা হল কুমতি সে সর্বদা তোমায় খারাপ পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। এর জন্যই তোমার মনে কুচিন্তাগুলি কুপথগুলিকে আশ্রয় করে চলতে বলে। আর তৃতীয়টি হল তুমি অর্থাৎ সেই 'আমি'। আমার বোধে বলে যে এবা শুধু তোমায় "এই পথে চল, ঐ পথে চল" এই ভাবে পরামর্শ দেয়, কিন্তু সেই পরামর্শ গ্রহণ করা, না-করা তোমার নিজের অর্থাৎ সেই 'আমি'র ব্যাপার, অর্থাৎ আত্মনারায়ণের। কারণ সে তোমায় চালনা করছে। এর জন্য আমরা একে আপন, ওকে পর করে দিই। তা করা কখন উচিৎ নয়, সদাসর্বদা মনে রাখবে সকলেই তোমার আপন। এর জন্য তোমায় অবশ্য কঠিন

আঘাত খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে একটা কথা মনে রাখবে, আমরা সকলে হলাম লতানে গাছের মত কান্ডহীন। কারণ যখন কান্ড আমাদের শক্ত হবে তখন কিন্তু আমাদের কান্ডজ্ঞান হাবানোর কোন প্রশ্ন থাকবে না। তবে জীবনে পথ চলতে গেলে বা মুক্তির পথ অনুসরণ করতে গেলে একটি শক্ত বট-বৃক্ষের প্রয়োজন হয়, যাকে আঁকড়ে ধরে আমাদের চলতে হবে, উপরে উঠতে হবে, আর সেই বটবৃক্ষ হল গুরু, সেই তোমার আপন। সেই তোমায় পথ চলতে সাহায্য করবে। সেই তোমায় বলে দেবে কোন পথ অনুসরণ করবে। কারণ তাঁর কাছ হতে, তুমি জেনে রাখবে, কোন আঘাত তুমি পাবে না, পেলে সেই তোমায় মলম লাগাবে। তাই পরাশ্রয়ী জীব থেকে ধীরে ধীরে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার চেষ্টা কর। কারণ চেষ্টা চাই, চেষ্টা থাকলে ঈশ্বরও তোমায় সাহায্য করবেন। ঈশ্বর সর্বদা দেখেন সে তাঁর জন্য কতটা ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতাও দরকার, তবে তুমি ক্রিয়ার উন্নতি করতে পারবে। অনেকে নানা প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রিয়া করে। যেমন - বাড়ি হোক,গাড়ি হোক, অর্থ হোক ইত্যাদি।

অর্থের চিন্তা সহ ক্রিয়া করা বা গুরুর কাছে প্রার্থনা করা ভাল, তবে সেই অর্থ, হাতে গোনা অর্থ নয়—পরমার্থ। আর সেইখানেই আমাদের যত গাফিলতি,যত একঘেয়েমি এসে চেপে ধরে। হ্যাঁ, এই রকম জিনিস আমাদের সকলের মনে আসতে পারে, তবে মনে রেখো তা বেশীদিনের জন্য নয়, যদি তোমার নিজের জেদ থাকে। এই জেদ অন্য জায়গায় না দেখিয়ে এই ক্রিয়ায় দেখাও,তাহলে তুমি ক্রিয়ায় জয়ী হবে। তাহলে ক্রিয়া করতে হলে জেদেরও বিশেষ প্রয়োজন। মনে সর্বদা ধরে রাখতে হবে যে যতই বিপদ আসুক, আসুক ঝড়,আসুক তুফান,আমি 'ক্রিয়া' তোমায় ছাড়ব না। তবেই তুমি জিতবে। তখন দেখবে, তুমি ছাড়তে চাইলেও ক্রিয়া তোমায় ছাড়বে না— তখন সে নিজে তুমি বা তুমি নিজে সে, আর দুই-এ মিলে এক অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম। তখনই তোমার হল আসল পৈতে এবং তখন তুমি হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। বর্তমানে দ্রুততম যুগে মানুষের মনের বহু পরিবর্তন ঘটেছে, যা আর পূর্বের মত নেই। এই যন্ত্র চালিত যুগে বা বর্তমানের মানুষের কথায় কম্পিউটার চালিত যুগে মানুষের ভক্তি-ভাব অনেক কমে গেছে, যা আমার শ্রী গুরুদেবও বলে গেছেন — যে

"কাশীর বাবার থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ভক্তি-ভাব বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্তিভাব কমতে কমতে এখন আর নেই বললেই চলে"।

এখন মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে অর্থ লাভের প্রবল চেষ্টা। কোন রকমে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার কথা এখন আর কেউ চিন্তা করে না, তারা এখন চায় সুন্দর বাড়ী, একটা ভাল কোম্পানীর নাম সাঁটা গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, আরও অনেক কিছু। আর কেউ চায় না যে — "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" বর্তমানে তা Modify হয়ে হয়েছে — "আমার সন্তান ও আমি যেন থাকি টাকার সিংহাসনে"।

শুধু অর্থই নয় আরও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে হিংসা, অপরকে মেরে কি করে আগে যাবো তার প্রবল চেষ্টা। বর্তমানে মানুষ অপরের ভাল হলে তা সহ্য করতে পারে না। আর দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে কাম বা sex -এর প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু এর থেকে তারা নিজেকে সরাতে চায় না, বরং আরো বেশী করে তার মধ্যে ঢুকতে চায়, এই ক্ষুধা থেকে সে কোনদিন নিবৃত্তি পায় না।

কিন্তু যতই এই সবের মধ্যে আটকে থাকুক না কেন কখনও কোনদিন তারা মৃত্যুকে আটকাতে পারবে না, সে এক সময় আসবে, আর মোক্ষম কোপ সে তাঁর বুকের উপর বসাবে আর সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তখন পড়ে থাকবে তার বাড়ী, গাড়ি, টাকা-পয়সা আর বউ, ছেলে আরো কত কি।

আজ ছেলের জন্মদিন হলে বাবা-মা আনন্দে বাড়ীতে party দেয়, ছেলে cake কাটে, কিন্তু একবারও কি তারা ভেবে দেখে যে, আজ যার জন্য এই আনন্দ উৎসব সে আরও একটা বছর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল— যাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারুর নেই , বা তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। 'জন্মিলেই মরিতে হইবে' ইহা ধ্রুব সত্য ঘটনা। তার অন্যথা করা যায় না বা কিছু হয় না। তাই এই দেহ থাকতে থাকতে কিছু করে নাও, এর পর ভবিষ্যতে তুমি যে মনুষ্য জন্ম নিয়ে আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই, 'জন্মিলেই মরিতে হইবে', তা যেমন সত্য তেমনি মরিলেই জন্মিতে হইবে এটাও তেমনই

সত্য। তাই এই আবর্তন, এই মায়া-বন্ধন হতে বেরোনোর জন্য গীতারূপী এই দেহকে গীতায় যে পথের কথা বলা আছে সেই পথ ধরে এগোনো দরকার। তাই গীতা পড়া বা তার পথ অনুসরণ করা উচিত— যা বর্তমানে অতীব দুর্লভ।

তাই প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। স্রোতের অনুকূলে তো সকলে সাঁতার কাটতে পারে এবং এগোয়ও খুব ভাল, অনেকটা করে। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে কখনও প্রথমে অনুকূল স্রোত প্রবাহিত হয় না, সাধক সেই, যে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে এগোতে থাকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। চেষ্টা থাকলে, স্রোতের গতিমুখ উলটে যায়, তখন আর প্রতিকূলতা থাকে না। তখন অনুকূলতাই সাধকের পথে অগ্রগতিতে সাহায্য করে এবং সে মোহানায় পৌঁছে যায় ও সাগরে মিলিত হয়।

এই পথে এগোনোর জন্য হেথা-হোথা যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি তোমার দেহের মধ্যে সদাসর্বদা জ্বলন্ত অবস্থায় সূর্য্যের চেয়েও উজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে অবস্থান করছেন। আর এই দেহই হল তোমার গীতা। এই দেহের প্রতিটি অংশ মহাভারতের এক একটি চরিত্র। বর্তমানে এই নিয়ে এবার আলোচনা করব।

তিনি সদাসর্বদা জ্বলন্ত অবস্থায় আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন বলেই আমাদের হাতে ধারণ শক্তি, পায়ে চলার শক্তি, চোখে দৃষ্টি শক্তি, কানে শ্রবণ শক্তি, নাকে ঘ্রাণ শক্তি আছে। যেদিন তিনি এই দেহটি ছেড়ে চলে যাবেন, সেদিন এই দেহটি শবে পরিণত হবে। তাই এই দেহ থাকতে থাকতে কিছু করে নেওয়া দরকার, বা এই দেহ থাকতে থাকতে মৃত্যুকে চিনে নেওয়া বা তার সঙ্গে মিলে যাওয়া ভাল। তাহলে আর এই আসা-যাওয়ার আবর্তনে পড়তে হবে না— হবে চির-মুক্তি, চির-আনন্দ, চির-শান্তি। এই অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে সাধককে কঠোর সাধনা করতে হবে। ক্রিয়ারূপ যোগ-কৌশল হল সেই একমাত্র পথ, যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ক্রিয়া হল Practical এবং গীতা হল তার Theory। ক্রিয়া করলে সাধক ও সাধিকারা তিন জন্মে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, যা আমার শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী।

# মহাভারতের চরিত্রাঙ্কন

এখন, মহাভারতের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব এবং তাদের সঙ্গে আমাদের দেহের কি সম্বন্ধ তাই আলোচনা করার চেষ্টা করব। মহাভারতের চরিত্র, কেননা, এই মহাভারতই হল আমাদের দেহটি। এর সম্মুখ ভাগ হল, কুরু পক্ষ বা কৌরব পক্ষ এবং পশ্চাৎ ভাগ হল, পান্ডব পক্ষ।

**ধৃতরাষ্ট্র ঃ—** ধৃতরাষ্ট্র মহাভারতের একটি বিশেষ চরিত্র। যে হল অন্ধ, যে হল পুত্র স্নেহে কাতর, সেই হল আমাদের অহং ইত্যাকার 'মন'। যে সদাসর্বদা মাছির মত উড়ে বেড়ায়, যে আপন কার্য্য চরিতার্থ করতে তৎপর। যার মধ্যে ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে অর্থাৎ সে যেমন বিষ্ঠাতে বসে তেমনি খাবারেও বসে— এই মনের গতি অসীম, ঠিক খরস্রোতা নদীর মত, যা সদা চঞ্চল, যা হল বাঁধনহারা স্রোতের মত, যার গতি-প্রকৃতির কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। সে সামনে যা পায়, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। জোর করে তাকে বাধা দিতে গেলে সে বেঁকে বসে। তবে নিরন্তর চেষ্টা থাকা একান্ত দরকার। হোঁচট খেয়ে পড়বে, আবার উঠবে। এই চলা-চলের মধ্যে আটকে থেকো। যেন পিছিয়ে পড়ছ বলে থেমে যেও না, তাহলে এই মনের গতি আরও দ্রুত থেকে দ্রুততর ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই বলি শ্রীগুরুদেব তোমার মধ্যে যে ক্রিয়ারূপী বীজ রোপণ করেছেন, তা এক সময় না এক সময় ফলপ্রসব করবেই। তাই তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাও। চেষ্টার ফল কখনও বিফলে যায় না। সেই লক্ষ্যে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে যদি তা একবার না একবার লক্ষ্যে লেগে যায় তাহলে তো কেল্লা ফতে। তখন কামনা-বাসনারূপী পুত্রের দমন হয় এবং মন-রূপী ধৃতরাষ্ট্র স্তব্ধ ও স্থির রূপে পরিবর্তিত হয়। তাই দুর্যোধনের দমন দরকার। কিন্তু সাধক, মনে রেখো, সাধন পথে সে কখনও একেবারে মরে না। সে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে, তার জন্য সাধককে সদাসর্বদা

সতর্ক থাকতে হয়।

**যুধিষ্ঠির ঃ—** যুধিষ্ঠির সেই, যিনি যুদ্ধে বা সাধন সমরে সর্বদা স্থির, অর্থাৎ স্থিরত্বাবস্থা। সেখানে ভাল মন্দের বিচার বিবেচনা আসে। যে সর্বদা ধর্মের পথে চলে, যে অধর্মকে চেনে কিন্তু সেই পথে চলে না। পঞ্চচক্র বা পঞ্চতত্ত্ব মিলিত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বা যে চক্রে মিলিত হয়, তাই হল যুধিষ্ঠির অর্থাৎ আমাদের কণ্ঠের পেছনে যে চক্রটি অবস্থিত (বিশুদ্ধাখ্য ) তাই হল যুধিষ্ঠির। যখন সাধনার দ্বারায় শ্বাস কণ্ঠ হতে ভ্রূর মধ্যে স্থির হয় এবং শ্বাস আরো উর্দ্ধে গমন করে সুষুম্না নাড়ীতে অবস্থান করে; তখন সুষুম্না নাড়ীর দ্বার খুলে যায় এবং সহস্রার ভেদ করে সাধক মুক্তাবস্থা লাভ করে, তাই যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলাভ পদবাচ্য।

**ভীম ঃ—** ভীম হল বায়ুতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যা দুই নাক দিয়ে সকল জীবদেহের মধ্যে প্রবহমান, যা বন্ধ হয়ে গেলে জীবদেহ শবে পরিণত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা সকল জীবদেহে জীবন-স্বরূপ, যা জন্ম থেকে জীবনকালতক জীবদেহের বৃদ্ধি সাধন করে। জীবদেহের সকল দৌরাত্ম্য এর দ্বারা পালিত হয়। এই প্রাণবায়ুর দৌরাত্ম্যের মাধ্যমেই জীবের দেহে ও মনে মায়া, মমতা, অহংকার, কৌটিল্য, হিংসা, বিদ্বেষ, ভালবাসা, ক্রোধ ইত্যাদি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। আর যখন তা সহ্যের বাইরে চলে যায় তখন জীব তার দেহ নাশের কথা চিন্তা করে এবং মধ্যে মধ্যে তা করেও বসে। তাই এই প্রাণবায়ুরূপী শ্বাসের গতিপথ উল্টো করা দরকার অর্থাৎ যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে তখন তোমার শ্বাস এই দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে নির্গত হত না, তখন তা সুষুম্না পথে যাতায়াত করত। তাই তোমার এই শ্বাসকে উল্টো পথে চালনা করে অন্তর্মুখী করতে হবে। তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হবে এবং ভীম শান্ত ও স্থির হবে।

**অর্জুন ঃ—** অর্জুন হল তেজস্তত্ত্ব। অর্জুন কে? সাধন সমরে অর্জুন হল সাধক নিজে, যে সকল তেজস্তত্ত্বের সমাহার। তাই প্রাণায়াম রূপ যোগ-

কৌশলের মাধ্যমে বাণক্ষেপণ করতে থাক। চেষ্টা করতে থাক, এই ভাবে চেষ্টা করতে করতে লক্ষ্য এক সময় স্থির হবেই। তখন পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। পাখী, কারণ সে আকাশে বিচরণ করে এবং সে খেচরের প্রতীক। খেচর, কারণ খ-অর্থাৎ আকাশ আর চোখ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রতীক। আকাশের প্রকাশের পর নক্ষত্রের প্রকাশ যখন হয় তখন মন অন্য কোনদিকে ধাবিত হয় না। তখন মন ও বুদ্ধি ঐ নক্ষত্রে স্থির হয়। আর লক্ষ্য স্থির হলে প্রাণ স্থির হবে। আর প্রাণ স্থির হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এর পর সকল সময় তাঁকে স্মরণে রেখে, তাঁর নির্দেশ মেনে এগিয়ে চলতে থাক। তা হ'লেই তুমি স্বর্গের পথের অর্থাৎ মুক্তির পথের সন্ধান পাবে।

**নকুল ও সহদেব ঃ—** নকুল ও সহদেব হ'ল যথাক্রমে, জলতত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্ব। জলতত্ত্ব হল আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত চক্রের মধ্যে একটি, যা হল- 'স্বাধিষ্ঠান'। আর 'সহদেব' হল 'ক্ষিতিতত্ত্ব, অর্থাৎ মূলাধার। নকুল যে সদাসর্বদা শান্ত, যেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন, যেখানে অপার শান্তি। আর নকুল হল মোহের প্রতীক। সে সর্বদা সাধককে মোহজালে আবদ্ধ করে ফেলে এবং সাধকের সাধনা নষ্ট করে দেয়। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি মেনকার মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁর সাধনা ভঙ্গ হয়েছিল। সহদেব হল ভয়ের প্রতীক। সাধক সাধিকারা সাধনা করতে গেলে নানা রকম ভয়ে ভীত হয়ে সাধনা ত্যাগ করে, তা কখনও উচিৎ নয়। প্রাণায়াম করবার সময় যখন নভশ্চর বায়ুর শব্দ প্রকাশিত হয়,তখন মনে ভয়ের উদ্রেক হয়, তখন প্রাণায়াম নিম্নাভিমুখী হয় অর্থাৎ শ্বাস নাক দিয়ে বেড়িয়ে যায় এবং তা মূলাধারে গিয়ে আঘাত করে এবং কম্পনের সৃষ্টি হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তা নাভিতে গিয়ে আঘাত করে এবং উর্দ্ধমুখে ধাবিত হয় এবং হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে। তখন প্রবল পুরুষাকার দ্বারা তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। তখন ভয় দূরে পালায় এবং সাধকের জয় হয়।

**দ্রৌপদী ঃ—** দ্রৌপদী হল মহাভারতের একটি বিশেষ চরিত্র। যে হল শীঘ্রগতিসম্পন্না। সে অহং জ্ঞানে আবর্তিত। সে পঞ্চচক্রের গভীর মধ্যে

আবর্তিত হয়। ষষ্ঠচক্রেও তার গতি আছে। সে শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থচৈতন্যের নিকট কামনা-বাসনারূপ কার্য্য চরিতার্থ করার প্রার্থনা করে— সকলই সাধনের উদ্দেশ্যে।

**দ্রুপদ ঃ**— দ্রুপদ হ'ল "অন্তর্য্যামিত্ব" শক্তিসম্পন্ন মনের দ্রুতগতি।

**ভীষ্ম ঃ**— ভীষ্ম হল ভয়ের প্রতীক। সে সকল কিছু ঘটনা ঘটবার আগে আশঙ্কাগ্রস্ত। সে মনকে সকল বিষয় সম্বন্ধে আগে থেকে সাবধান করে অর্থাৎ ভীষ্ম হল অকারণ আশংঙ্কাজনিত ভয়।

**দ্রোণাচার্য্য ঃ**— দ্রোণ হ'ল জেদের প্রতীক যা উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষাগুরু। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে সাধকের সবার আগে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন জেদ, অর্থাৎ জেদ থাকলে সাধক সাধনায় বিশেষ উন্নতি করে। কিন্তু তা যদি উল্টো হয়, তাহলে সাধকের সাধনা উল্টো ফল প্রসব করে ।

**কুন্তী ঃ**— কুন্তী হল দেহের ও মনের শক্তি। যে সকল বিষয়ে মনে শক্তি সঞ্চার করে এবং সাধনা করতে প্রেরণা যোগায়— অর্থাৎ কুন্তি হ'ল আমাদের জীবদেহের সাধন-ইচ্ছা শক্তি।

**দুর্যোধন ঃ**— দুর্যোধন হল কাম রিপু। সে সদাসর্বদা কামনা-বাসনার মধ্যে অন্ধ; সে সর্বদা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঘৃণ্যতম কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না। তার অহংকার হল দেহের বল, তাই দুর্যোধন দমন হওয়া দরকার। দুর্যোধন দমন না হলে, তাঁকে পাওয়ার বাসনা আকাশকুসুম।

**দুঃশাসন ঃ**— কামবল হ'ল দুঃশাসন। সে সর্বদা কামান্ধ। সে সর্বদা ইন্দ্রিয়জনিত দেহসুখে বিশ্বাসী, সে সাধনাকে ভর্ৎসনা করে।

তাই বিশ্বাস দ্বারা সাধকের দেহসুখ ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়কে শ্রীগুরুর পদতলে অর্পণ করা একান্ত দরকার। তার যে জন্য এই পৃথিবীতে আসা, যে জন্য এই মনুষ্য দেহ ধারণ করা, সেই কাজে ব্রতী হ'তে হবে।

**সঞ্জয় ঃ—** সঞ্জয় হল মনের সম্যক গতি অর্থাৎ সম্মুখে কি ঘটছে বা কি ঘটবে তার বিষয়ে মনকে জ্ঞান প্রদান করে। সঞ্জয় তাহলে কে? সাধকের সাধনার দ্বারা যখন প্রাণ আজ্ঞাচক্রে স্থির করা সম্ভব হয়, তখন তার দেহস্থিত বিবেক জেগে ওঠে, সঞ্জয় সেই বিবেক স্বরূপ।

**গান্ডীব ঃ—** গান্ডীব হল অর্জুনের ধনুক, যা হল আমাদের দেহের মেরুদন্ড। তার উপর 'ওঁ'-কার রূপ বাণ ক্ষেপণের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক ক্রিয়ারূপী যোগ সাধনা করে। যোগ অর্থাৎ যুক্ত হওয়া। যার অর্থ হল নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া, আর যারা হতে পারে তারাই হল যোগী।

এখন এই পর্যন্তই থাক পরে অর্থাৎ ভবিষ্যতে এই নিয়ে পুনরায় আলোচনা করবার চেষ্টা করব। বর্তমানে গীতার শ্লোকগুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি। আমার শ্রীগুরুদেব পূর্বে সকল ক্রিয়ান্বিত ও ক্রিয়ান্বিতাদের কাছে তাঁর গীতা লেখা এবং তার সঙ্গে আমাদের অজপার কি সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে তাঁর এই নশ্বর দেহ তিনি ১৪ই জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে রাত ১টা ৫৮ মিনিটে উত্তরায়ণের সন্ধিক্ষণে ত্যাগ করেন। পাঠক পাঠিকারা যেন মনে না করেন তাঁর ঐ অসম্পূর্ণ কাজ আমি পূরণ করছি। তা করার মত ক্ষমতা বা জ্ঞান কোনটাই আমার মধ্যে নেই। আমার নিজস্ব বোধে যা বলে, তাই আমি এই লেখার আকারে প্রকাশ করছি। জানিনা, তা পাঠক পাঠিকাগণের গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। আমি আবার বলছি, এটা দাদু যা করতে পারেন নি তা করা নয়, আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বলে তা ভাষায় ব্যক্ত করছি মাত্র।

গীতা শ্রী বিষ্ণু মোক্ষ

# প্রথমোঽধ্যায়ঃ

## অর্জুন বিষাদ যোগ

**ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।**
**মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।।১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ধৃতরাষ্ট্র হল আমাদের অহং ইত্যাকার মন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর সঞ্জয় হল, যার সম্যক প্রকারে জ্ঞান হয়েছে অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন জীব।

আমাদের দেহের শ্বাস , জন্মানোর পূর্বেকার অবস্থায় অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যখন আমরা ছিলাম, তখন বায়ু মেরুদন্ড বরাবর যে সুষুম্না নাড়ী আছে তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হত কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তা আমাদের দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল আর তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল মায়ার বাঁধন। এরপর থেকেই শ্বাসের গতির পরিমাণ যত বৃদ্ধি হতে লাগল আমাদের দেহের মধ্যে গজিয়ে উঠল মায়া, মোহ, কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ, শোক, তাপ ইত্যাদি দিয়ে গড়া মন। এই মন তার দেহের সম্বন্ধে সঞ্জয় অর্থাৎ আমাদের বিবেক বা আমাদের সৎ চিন্তাশক্তি (বহু প্রচেষ্টা বা বিশেষ মনোনিবেশের মধ্যে দিয়ে আমবা সঠিক প্রাণকর্ম করে মনকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করতে পারলে যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে, তাই হল বিবেক।) কে জিজ্ঞাসা করল (আমাদের এই দেহই হল সেই ক্ষেত্র যেখানে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দুই আছে। এরা একত্রিত হয়ে এই দেহের সৃষ্টি হয়েছে।) এর মধ্যে যুদ্ধার্থী ও পান্ডবদের অবস্থান কোথায় বা তারা এই দেহঘটে অবস্থান করে কি করল বা কি করছে। এখানে যুদ্ধার্থী হল আমাদের দেহের রিপুগুলি, যার দমনের জন্য আমাদের এই যুদ্ধ, আর পান্ডব হল আমাদের দেহের পঞ্চচক্র অর্থাৎ আমাদের কণ্ঠের পিছন থেকে গুহ্যদ্বারের ১" উপর পর্যন্ত যে চক্রগুলি আছে তা। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির হল বিশুদ্ধাখ্য, ভীম হল অনাহত, অর্জুন হল মণিপুর, নকুল হল স্বাধিষ্ঠান, সহদেব হল মূলাধার এবং সকলে হল কুন্তীর পুত্র অর্থাৎ কুন্তী হল সাধন ইচ্ছাশক্তি।

পাহাড়ী ঠাকুর

**দৃষ্ট্বা তু পান্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।**
**আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সঞ্জয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান মনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বললেন যে দুর্যোধন অর্থাৎ দুর্মতিরূপ কামনা-বাসনাপূর্ণ মন পঞ্চতত্ত্বের আত্মরাজ্যে স্থাপিত হওয়ার জন্য সমরে অর্থাৎ সাধন সমরে বা প্রাণকর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দেখে দ্রোণাচার্য্য অর্থাৎ জেদ, যা দুইপক্ষেরই গুরু, তার উদ্দেশ্যে গমন করে তাকে বললেন---

**পশ্যৈতাং পান্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীংচমূম্।**
**ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩**

**তাৎপর্য্য ঃ—** হে পরমারাধ্য গুরুদেব, তুমি আমার দেহের মধ্যে জেদরূপে অবস্থান করে আমার প্রাণকে জাগ্রত কর। আপনি আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বা পঞ্চপান্ডব যথাক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠির অর্থাৎ প্রতিচক্রের অবস্থানগুলি আমাদের দেহের মধ্যে কোথায়, তা বুঝিয়ে দিন।

**অত্রশূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুন সমা যুধি।**
**যুযুধান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪**
**ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।**
**পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫**
**যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।**
**সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।।৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** এখানে পূর্ব্বে আলোচিত চরিত্রগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, যা পূর্বে আলোচিত হয়নি। যেমনঃ- মহারথ অর্থাৎ - দেহ, যুযুধান অর্থাৎ সুমতি, দ্রুপদ অর্থাৎ - অন্তর্যামিত্ব শক্তি, ধৃষ্টকেতু অর্থাৎ - অনুভব, চেকিতান অর্থাৎ - প্রণবধ্বনি, কাশিরাজ অর্থাৎ মহৎ জ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য্যের মত জ্যোতিঃ, বীর্য্যবান্ অর্থাৎ প্রকাশ, পূরুজিৎ অর্থাৎ

- প্রাণের স্থিরাবস্থা, কুন্তিভোজ অর্থাৎ আনন্দ, শৈব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ, বিক্রান্ত অর্থাৎ বিক্রমশালী, সৌভদ্র অর্থাৎ বিশেষ নির্ভয়ে ক্রোধ। দ্রৌপদেয়াশ্চ অর্থাৎ দৌপদীর তনয় অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যা আমাদের এই মহারথ বা দেহের মধ্যে অবস্থিত। উপরিউক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বোঝাতে গেলে বলতে হয়, আমাদের এই দেহের মধ্যে ভীমরূপী বায়ু— যাকে প্রাণায়াম বলে, আবার অর্জুন রূপী তেজস্তত্ত্ব অর্থাৎ তেজ আছে। সেই তেজরূপী বায়ুর দ্বারা দেহের মধ্যে জেদকে জাগ্রত করে প্রাণায়াম রূপী বায়ুকে আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাপথে চালিত করলে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে মহাজ্যোতির, যা সবিতৃমন্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল, তাই হল ব্রহ্মজ্যোতি, এর প্রকাশ হয়। তখন মনের মধ্যে আর কোন চঞ্চলতা থাকে না। তখন মন স্থির হয়, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় কোনরূপ ভাবনাচিন্তা দেহের মধ্যে স্থান পায় না। এছাড়া পঞ্চতত্ত্বরূপী দেহের পঞ্চ চক্রের প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" কার ধ্বনি শোনা যায়। তার মাধ্যমে মনের মধ্যে মহা আনন্দের সৃষ্টি হয়।

**অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।**
**নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থংতান্ ব্রবীমি তে।।৭**

**তাৎপর্য্য ঃ—** রাজা দুর্মতি অর্থাৎ দুর্যোধন জেদরূপী দ্রোণাচার্য্যকে বললেন আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল রিপু প্রবল পরাক্রমী, তাদেরকে যুদ্ধে অগ্রসর হতে আজ্ঞা জানান।

অর্থাৎ আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল রিপু আছে তাদের প্রাদুর্ভাব কমানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের ক্রিয়া করা। এই ক্রিয়াই হল যুদ্ধ আর এই দেহই হল সেই যুদ্ধক্ষেত্র আর যুদ্ধ হচ্ছে দেহ-আমির সঙ্গে 'আমার-আমি'র। তাই 'আমার-আমির' সঙ্গে মিলিত হতে গেলে দেহরূপী আমি কখনই তা মেনে নেবে না বা সহ্য করবে না। তার জন্য দেহের মধ্যস্থ রিপু সকল সাধন যুদ্ধে সাধককে হারানোর চেষ্টা করবে বা বাধা দেবে। এই সাধন-যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাই দেহ-আমির সকল রিপু একত্র হয়ে আক্রমণ করে যাতে সাধক সাধনায় বা প্রাণকর্মে অবতীর্ণ না হন।

**ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।**
**অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।। ৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত রিপুগুলি হল ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়, কর্ণ অর্থাৎ কানে যা শুনে থাকে তাই বিশ্বাস করে, কৃপ অর্থাৎ কৃপা, সমিতিঞ্জয় অর্থাৎ সমরবিজয়ী, অশ্বত্থামা অর্থাৎ আশা যা করা যায় তা বাস্তবায়িত করা দুরূহ ব্যাপার, সৌমদত্তি অর্থাৎ ভ্রম ও সংশয়— এই সকল রিপুগুলি জাগরিত হয়।

**অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।**
**নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ।।৯**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের দেহের মধ্যে যে তিন প্রকার মতি আছে তার মধ্যে কুমতি মনের ভাবকে উল্টো পথে চালনা করে অর্থাৎ সাধনা করতে গেলে সাধকের মনে নানান চিন্তার উদয় করে সাধককে ঠিক মত সাধনা করতে দেয় না। এই শ্লোকটির মধ্যে কুমতিকে সাহায্যকারী আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত রিপুদ্বয়কে বলা হয়েছে যারা শক্তিতে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। তারা আমরণ এই কুমতিকে রক্ষার জন্যে লেগে থাকে। এই চঞ্চল রিপুগুলিই হল সাধকের সাধনাভঙ্গকারী বা যোগীর যোগবিঘ্নকারী শত্রু।

**অপর্য্যাপ্তম্ তদস্মাকমং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।**
**পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।।১০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়, এই ভয় হ'ল সাধকের পরম শত্রু। এই ভয়কে রক্ষা করার জন্য যে সকল সৈন্যগণ বা রিপুগণ আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত, তারা সাধককে সাধনায় উত্তীর্ণ হতে দেয় না — ভয় হল সাধকের সাধনা বিঘ্নকারী, ভয় থাকলে সাধক সাধন-যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারে না। সে সাধনায় অসমর্থই থাকে, সে কখনই সফল হতে পারে না। ভীম হল পঞ্চতত্ত্বের অধীন, ভীম হল প্রাণবায়ু, অর্থাৎ ভীমরূপী প্রাণবায়ুরূপ প্রাণায়াম যখন সাধকের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তখন ভয়ের নাশ হয়। ভয় তখন আর অধিকক্ষণ তার থাকতে

পারে না এবং ভয় চলে গেলে সাধক সাধনযুদ্ধে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ভয় হল সাধকের সাধনায় বাধা স্বরূপ, ভয় থাকলে সাধক সাধনায় উত্তীর্ণ হতে অসমর্থ হয় আর ভীমরূপী প্রাণায়াম হল সাধনযুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার সমর্থ হাতিয়ার।

**অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।**
**ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।।১১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কুমতি দেহের মধ্যে অবস্থিত অহংকার, ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি রূপ রিপুসকল, যারা কুমতির কার্য্যসিদ্ধি রক্ষার্থে আপন ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে জীবের প্রাণনাশ করতেও ইন্ধন জোগায়, সাধনায় সাধকের ভীষ্মরূপী ভয়কে রক্ষা করে। তাদের প্রবেশদ্বার অর্থে চক্রের প্রবেশ দ্বার অর্থাৎ আগমরূপী দ্বারে অবস্থান করে ভয়কে রক্ষা করে। কারণ ভয় যদি অন্তর্হিত হয় তা হলে সাধক সাধনায় অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে। তাই এখানে ভয়কে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

**তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।**
**সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কুরুবৃদ্ধ পিতামহ অর্থাৎ ভীষ্ম বা ভয় যে দুই পক্ষেরই পিতামহ, কারণ ভয় দুই পক্ষের মধ্যেই বিচরণ করছে। পান্ডব পক্ষে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে যে ভয় আছে, আবার সাধকের সাধনে ব্যাঘাৎকারী রিপুগুলির মধ্যেও সেই ভয় আছে। তাই ভয়ের পরিমাণ বেশী হলে কুমতি রূপী মন আনন্দিত হয়, কারণ সেই ভয় মনের মধ্যে সঞ্চারিত হলে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটে, সাধক একমনে সাধনা করতে পারে না— এতে কুমতি অর্থাৎ দুর্য্যোধন খুব আনন্দিত হয়। সাধক তখন সাধনায় বিঘ্ন ঘটার জন্য নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাই হল সিংহনাদরূপী শঙ্খ যা কুমতির দ্বারা বাজান সম্ভব হয় অর্থাৎ তখন কুমতি আনন্দিত হয়।

**ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।**
**সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ।।১৩**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কুমতির প্রভাবে এবং তার আশ্রিত রিপুগুলির মধ্যে একপ্রকার বায়ু আছে যাকে নভশ্চর বায়ু বলে। সেই বায়ুর প্রভাবে সাধন কালে নানা প্রকার শব্দের উদয় হয়, আর সেই সকল শব্দ সাধকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে, এর কারণে সাধকের মনে যে নানারূপ চিন্তার উদয় হয় তা এই মনের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তাকে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় এবং সাধনা ত্যাগ করে ঐ সকল ভয়জনিত চিন্তার দিকে মন ধাবিত হয়।

**ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।**
**মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ভয় জনিত চিন্তার ফলে মন বিচলিত হয়ে সাধনার চিন্তা মস্তিষ্ক থেকে প্রায় দূরীভূত হয়ে যায়। তখন সাধকের চাই স্মরণ অর্থাৎ শ্রীগুরুর স্মরণ, যার ফলে মন হতে ভয় পালায় এবং প্রাণায়ামের ধ্বনি শোনা যায়। এই প্রাণায়ামের ধ্বনিই হল আকাশের ধ্বনি এবং এটাই হল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খ বাজানো। অর্জুন হল তেজস্তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ হল — শ্রী অর্থে দুই চক্ষুর মাঝে অর্থাৎ দুই ভ্রূর মাঝে মনরূপী বায়ুকে স্থির করা, কৃষ্ অর্থে কর্ষণ করা এবং ণ অর্থে হল শ্বাসরূপী শব্দ।

অর্থাৎ দুই ভ্রূর মাঝে দৃষ্টি স্থির করে চক্রে চক্রে প্রাণায়ামরূপী হলের দ্বারা দেহ মৃত্তিকা কর্ষণের ফলে যে শব্দের উদয় হয় তাই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খ নিনাদ।

**পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।**
**পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।।১৫**
**অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।**
**নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ।।১৬**
**কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।**
**ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭**
**দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।**
**সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** 'পাঞ্চজন্যং হৃষিকেশ' অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যিনি ঈশ্বর তিনি হৃষিকেশ। সাধক সাধন করবার সময় প্রাণায়াম করতে করতে যখন তন্ময় হয়ে পড়েন বা স্থির ভাব আসে অর্থাৎ সাধনা করতে করতে মাঝে মাঝে আমাদের মন একটি বিশেষ ধ্বনির প্রকাশে বা জ্যোতির প্রকাশে স্থির হয়ে পড়ে, তখন নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে কোনরূপ শ্বাস নির্গত হয় না। না প্রবেশ করে, না বহিরাগমন করে বা তখন বর্হিজগতের কোন খেয়ালই থাকে না, তখন বিশাল এক আকাশের সৃষ্টি হয় যা শুভ্র বর্ণের, পীত বর্ণের বা নীলাভ যুক্ত হতে পারে। তখন আমাদের দেহস্থিত নভশ্চর বায়ুর দ্বারা শঙ্খ ধ্বনি অথবা ঘন্টার ধ্বনি, বেণুর ধ্বনি, ভৃঙ্গের ধ্বনি, বীণার ধ্বনি বা বজ্রের ধ্বনি শোনা যায়। কোন কোন সময়ে মন আরও গভীরে স্থিরীকৃত হলে প্রণব ধ্বনি বা ওঁকার ধ্বনি সাধক সাধিকার শ্রুতিগোচর হয়, তখন বহিঃজগতের কোন চিন্তা, কোন রূপ-কল্পনা বা 'আমি-আমার' বোধ এসব কিছুই থাকে না। এটাই ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, অর্জুন, কাশীরাজ প্রভৃতি রিপুগণের শঙ্খধ্বনি, যা গীতার এই শ্লোকটিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। শিখণ্ডী অর্থাৎ মহৎ জ্যোতির মধ্যস্থিত জ্যোতিরূপী নক্ষত্র যার দর্শনে মনের মধ্যে কোনরূপ চিন্তা বা কল্পনার উদয় হয় না। এই অবস্থা ভঙ্গের পর অর্থাৎ এই স্থিরাবস্থা ভঙ্গ হবার পর মনের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাই সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনা।

**স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।**
**নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।।১৯**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হলে অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপী যোগ বা সৎগুরু প্রদর্শিত পথে চালিত হতে শুরু হলে বা রিপু দমন কার্য্য মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত, যা গীতায় পৃথিবী হতে আকাশের কথা বলা হয়েছে সেই কার্য্য শুরু হলে আমাদের দেহের রিপু-সকল দমিত হতে শুরু করে। সেই শব্দরূপী শ্বাসকার্য্যকেই গীতায় তুমুল শব্দ রূপে বলা হয়েছে। যা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের বা দুর্মতিরূপ রিপুগণের বা ইন্দ্রিয়গণের হৃদয়বিদীর্ণকারক।

**অথব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।**
**প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পান্ডবঃ।।**
**হৃষীকেশং তদাবাক্যমিদমাহ মহীপতেঃ।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ-** অর্জুন হল তেজস্তত্ত্ব যা হল আমাদের নাভির পেছনের চক্র অর্থাৎ মণিপুর। আর অর্জুনকে কপিধ্বজ বলা হয়, অর্থাৎ প্রাণবায়ুরূপী শক্তি, যা হল আমাদের দেহের মাধ্যাকর্ষণরূপী শক্তি। যা আমাদের দুই নাসিকার মধ্যে দিয়ে সদা সর্বদা প্রবহমান। সেইহেতু সাধক সাধনা আরম্ভ করলে তাকে পেটে অর্থাৎ নাভিতে চাপ দিয়ে শ্বাস দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করান এবং দেহের বাইরে বহিরাগমন করান। নাভির মধ্যে যে বায়ু রয়েছে তাই জীবদেহের প্রাণরূপ শক্তি। নাভি হতে ঐ বায়ু বিচ্ছিন্ন হলে জীবদেহ মৃতদেহে বা শবদেহে পরিণত হয়। অর্জুন রূপ তেজস্তত্ত্ব এই নাভিমূলের বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং এর সহিত যুক্ত। তাই অর্জুনকে কপিধ্বজ বলা হয়। সেইজন্যেই অর্জুনের রথের মাথায় যে পতাকা আছে তার চিহ্ন একটি হনুমান বা কপি। অর্জুন তার গাণ্ডীব বা ধনু উত্তোলন করে অর্থাৎ মেরুদন্ড সোজা করে বসে 'ওঁ'কার রূপ বাণ নিক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা কূটস্থ চৈতন্যরূপ মহান জ্যোতিকে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করে।

**সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।।২১**
**যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।**
**কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।।২২**
**যোৎস্যমানান্ বেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।**
**ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** অচ্যুত কথার অর্থ হল ক্ষরিত হওয়া। অ + ক অর্থাৎ যার নাশ নাই বা ক্ষয় নাই, অর্থাৎ তিনিই হলেন কূটস্থচৈতন্যরূপী আত্মা, যা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে বিশেষ ভাবে নজর রাখা দরকার আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত দুর্মতিরূপ রিপু সকলকে, কারণ এরাই সাধনায় অগ্রসর হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। সেইজন্যে অর্জুনরূপী দেহরথ

ঐ রিপুগণের সম্মুখস্থলে এবং যে সকল রিপু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সাহায্য করে,তাদের সম্মুখস্থলে অর্থাৎ দুই রিপুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থলে স্থাপন করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থ চৈতন্যের কাছে প্রার্থনা করা।

**এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।**
**সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।২৪**
**ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।**
**উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সঞ্জয় অর্থাৎ আমাদের দেহের মধ্যে বিশেষ অন্তর্যামিত্ব শক্তি, তার দ্বারা মনরূপী ধৃতরাষ্ট্রকে 'ভারত' সম্বোধন করে বলা হচ্ছে (ভারত কথার অর্থ হল ভা + রত অর্থাৎ ভালে যে সকল সাধক-সাধিকা সদা সর্বদা রত থাকেন তাকে ভারত বলে) যে তাঁকে দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত স্থানে অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করতে, 'গুড়াকেশেন ভারত' এর অর্থ নিদ্রারূপী রিপুকে যিনি জয় করেছেন তাকে 'গুড়াকেশেন ভারত' বলে সম্বোধন করা হয়। তখন জেদরূপী দ্রোণ ও ভয়রূপী ভীষ্মের প্রকাশ ঘটে এবং মনের মধ্যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। তখন সাধককে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থলে মনোনিবেশ করে শরীর রূপ রথকে প্রাণায়াম রূপ ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা অবলোকন করা উচিৎ।

**তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।**
**আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।**
**শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মনরূপী ধৃতরাষ্ট্র সদা সর্বদা চঞ্চল। দুই ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সাধনা করা খুবই অসম্ভব কাজ, কারণ জেদরূপী এবং ভয়রূপী দুর্মতিরূপ রিপুদ্বয় সর্বদা বাধার সৃষ্টি করে, দুই ভ্রূর মাঝখানে বা ভালে মনোনিবেশ করতে দেয় না। এই সকল রিপুগুলি মায়ার দ্বারা আবিষ্ট। মায়া— যতকাল মনপ্রাণ দেহ, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী, আত্মীয়, পরিজন ইত্যাদির মধ্যে সাধক আবিষ্ট থাকে ততদিন সাধনায় উন্নতি হওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাই এই কুস্বভাব যুক্ত বা কুপ্রবৃত্তি সমুদয়কে অবলোকন করা সাধকের বিশেষ রূপে দরকার।

**তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।**
**কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।।২৭**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধনা, সাধক সাধিকারা সাধারণত বাল্যকালে বা কৈশোর কালে বা যৌবন কালে বা বার্ধক্যে শুরু করে। বর্তমানে বাল্যকালে বা কিশোর অবস্থায় সাধন অভ্যাস করা বা সাধনা আরম্ভ করা নেই বললেই চলে। সে যাই হোক, যে সময় থেকেই সাধনা আরম্ভ করা হোক না কেন, আমাদের মন সর্বদাই চায় দেহ সুখ ও ইন্দ্রিয় সুখের দাসত্ব করতে। সাধন আরম্ভ কালে জীবের বা সাধক সাধিকার মনে তখন নানা প্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হয়, তখন মনের মধ্যে নানারূপ আলোড়ন হয় এবং এত কাল যার দাসত্ব করে এসেছি তাকে বা তাদের দমন করতে হবে, যাদের দ্বারা দেহসুখ ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতির দ্বারা পরিতৃপ্তি পেয়ে এসেছি, তাদের দমন করতে হবে তা ভেবে মধ্যে মধ্যে মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েআর তখন এর হাত হতে মুক্তি পাবার একমাত্র হাতিয়ার হল নিজের মনের ভাব সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী কূটস্থচৈতন্যের নিকট সব কিছু জ্ঞাপন করা।

**দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।**
**সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।।২৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মনুষ্যদেহের সম্মুখভাগ হল কুরুপক্ষ বা কৌরব পক্ষ অর্থাৎ দেহের সম্মুখভাগে ইন্দ্রিয়দের খেলা। সেখানেই আছে পুরুষ ও নারীর ভেদ আর এই মনুষ্যদেহের পশ্চাৎভাগ হল পুরুপক্ষ বা পান্ডব পক্ষ যা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় বহির্ভূত। যেখানে নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ নেই অর্থাৎ একজন পুরুষ ও নারীকে যদি পিছন ফিরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ দেহদ্বয়কে দূর হতে দেখে পৃথক পৃথক লিঙ্গের দেহ বলে চিহ্নিত করা যায় না, তাই আমাদের মন এতকাল অর্থাৎ সাধনারম্ভ কালের পূর্ব হতে দেহের সম্মুখ ভাগস্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বর্তমানে অর্থাৎ সাধনারম্ভ কালে তাদেরকে দমন করতে হবে, এই কথা ভেবে মন শুষ্ক ও বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। এরও উপায় কূটস্থচৈতন্য রূপী আত্মনারায়ণ এর নিকট তা জ্ঞাপন করা।

**বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।**
**গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।।২৯**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধন কালে সাধকের মনের মধ্যে ভয়জনিত কারণে বা শোকজনিত কারণে বা ইন্দ্রিয়সুখজনিত কারণে নানারূপ চিন্তার উদয় হয় এবং তখন সাধক সাধনার কথা ভুলে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণের কথা ভুলে গিয়ে ঐ চিন্তায় মনোনিবেশ করে বা মন ঐ চিন্তার প্রতি ধাবিত হয়। এর ফলে মেরুদন্ড সিধা করে প্রাণায়াম রূপ যোগ সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে, তখন আর ক্রিয়া হয় না। তখন আসনে বসে নানারূপ চিন্তার উদয় হয় এবং শ্বাসের তালে তালে মেরুদন্ড সোজা থাকে না তা বেঁকে যায়, একেই অর্জুনের গাণ্ডীব খসে পড়া বলা হয়েছে। এই প্রকার নানারূপ চিন্তার ফলে দেহের মধ্যস্থিত দুর্মতিরূপ রিপুগণ বা ইন্দ্রিয়রূপী ভাবগুলি যা সাধনায় ক্ষতি করে বা সাধনায় ব্যঘাত ঘটায় তারা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

**ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।**
**নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কেশব কথার অর্থ হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অথবা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনগুণ রূপী বায়ু যাঁর শাসনাধীন তিনিই কেশব। সেইহেতু কেশব হল আত্মনারায়ণ, শ্রী কূটস্থচৈতন্য। সাধনাভ্যাসকালে ইন্দ্রিয় জনিত সুখ বা ভোগলালসার জন্য প্রাণের মধ্যে সর্বদা আকুলি বিকুলি করে, এ ছেড়ে ক্রিয়া কেন করব? ক্রিয়া করে কি হবে? ক্রিয়ার থেকে ইন্দ্রিয় সুখ শ্রেষ্ঠ নয় কেন? এইসমস্ত বিপরীতমুখী চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়। এর ফলে সঠিক সাধনা হতে নিবৃত্ত হওয়ার আশা পোষণ করে।

**ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।**
**ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবদেহ সদাসর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের দিকে ধাবিত হয়। সুখ কি? তা অনেকেই জানে না। সুখ হল সকল বন্ধন হতে মুক্তি যেখানে কোন আবর্তন নেই, যেখানে নেই কোন বন্ধন, নেই কোন 'আমি-আমার'বোধ।

যেখানে আছে শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি। কিন্তু জীবদেহ ইন্দ্রিয় সুখকেই বড় করে দেখে, তাকেই পেতে চায়। কিন্তু জীবদেহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়। যতই সে ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি লালায়িত হয় ততই সে বাধা ও বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, তা থেকে সে মুক্তি পায় না, যা মহাজনের কাছে ঋণের মত সুদে আসলে বৃদ্ধি পায়। যা থেকে সে নিষ্কৃতি পায় না এবং সেই টাকা শোধ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করে, এবং আবার ফিরে আসতে হয়। সেই ফিরে আসার পালা বা এই আবর্তনের পালা সে কোনদিনই খন্ডাতে পারে না। তাই সে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ভোগকেই নিজের প্রকৃত সুখ বা নিজের স্বজন বলে বিবেচিত করে মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। সাধনার দ্বারা ভাবী অন্তরজগতের সুখ সে আর চায় না। জীব পরিণামদর্শী নয় তাই ভাবী অন্তররাজ্য স্থাপিত হলে যে সুখ লাভ হবে, যে বাধা সরে যাবে, যে বন্ধন মুছে যাবে, যে টানাপোড়েন, যে আসা- যাওয়া আর থাকবে না, সে সব আশা পরিত্যাগ করে। এই সকল কথা চিন্তা করে, তখনই তার মন বারবার বলে ওঠে চাইনা জয়, চাইনা সুখ, চাই ভোগ, চাই লালসা।।

**কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।**<br>
**যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২**<br>
**ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।**<br>
**আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।।৩৩**<br>
**মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।**<br>
**এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।।৩৪**<br>
**অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।**<br>
**নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।।৩৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মনুষ্য দেহ, সাধনাভ্যাস থেকে ইন্দ্রিয়সুখে এত বেশী লালায়িত যে, সে সাধনা করতে চায় না। সে সদা ইন্দ্রিয় সুখের দিকে ধাবিত হয়। সাধনা করতে গেলে শরীর ক্ষয় হবে, মন ক্ষয় হবে এবং জীবনও ক্ষয় হবে, মৃত্যু আরও নিকটে আসবে। যতদিন পর্যন্ত না মৃত্যু আসবে ততদিন পর্যন্ত জড় পদার্থ হয়ে পড়ে থাকতে হবে, ভীষ্মরূপী ভীষণ ভয় সাধক-সাধিকাকে চেপে ধরে, তখন সে সাধনা হতে বিরত থাকতে চায়, তখন তার মনে প্রশ্ন জাগে—

দেহ সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, যা প্রকৃতির দান তা উপভোগ করব না কেন? কিন্তু সাধক সাধিকারা জানে না, জেনেও বোঝে না যে সেই প্রকৃতির দান, এই দেহ সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ, প্রকৃতির নিয়মেই দেহ থেকে চলে যাবে। চিরস্থায়ী কেউ হয় না, কেউ হবেও না। তাকেও একদিন মৃত্যু মুখে পতিত হতে হবে এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমে কাটাতে হবে। আমার শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত বাণী থেকে এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেছিলেন, "এই ক্রিয়া করলে কারও মৃত্যুযোগ থাকলেও তা খন্ডিত হতে পারে, কারও ৫০ বছর আয়ু থাকলে তা ৮০ বছর হতে পারে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে ইচ্ছা মৃত্যু হতে পারে।"

এদের দমন করবার প্রয়োজন কি? কারণ ভোগ্য বস্তু ভোগ বেশি দিন করা যায় না, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে, সেই কর্মফল কোনদিন নষ্ট হবার নয়। ভোগ্য বস্তু ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ, দেহসুখ, যদি Loan হয় তাহলে ক্রিয়াযোগসাধনা হল Fixed Deposit, যা বৃদ্ধি পায়।

**পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।**
**তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।।**
**স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** বিপক্ষগণ বা ইন্দ্রিয়গণ আমাদের দেহের সঙ্গে যুক্ত, তাদের দমন করলে কোনরূপ ক্ষতি দেহে সাধিত হবে না। কাউকে খুন করলে, কারুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিলে, তাদেরকে আততায়ী বলে। আততায়ীকে দমন করা ধর্মক্ষেত্রে কোনরূপ পাপ নয়। অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে আসার জন্য যে সমস্ত রিপুগুলি বাধার সৃষ্টি করে তাদের দমন করলে কোনরূপ পাপ হয় না। ইন্দ্রিয়গণ এতদিন পর্যন্ত স্বজন হিসাবে দেহ সুখে মত্ত ছিল, তাই তাদেরকে দমন করতে দেহ জড়পিন্ডবৎ হয়ে পড়ে।

**যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।**
**কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭**
**কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।**
**কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন।।৩৮**

**তাৎপর্য্য.ঃ—** শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদানকালে কূটস্থচৈতন্য ভগবান শ্রী আত্মনারায়ণকে দর্শন করিয়ে দেন, এর পর হতে সাধক-সাধিকা সাধনাভ্যাস কালে কূটস্থের প্রকাশ পরিলক্ষিত করতে পারে। তারপর হতে দুর্মতিরূপ রিপুসকল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তারা দেহের মধ্যে নানারূপ রোগ, শোক, তাপ ইত্যাদির সৃষ্টি করে, দেহ থেকে অনেক সময় প্রাণকে আলাদা করার চেষ্টা করে, সেই প্রাণনাশ কোন সাধক সাধিকার জীবন নাশ নয়— তা হল সুমতিরূপ যে সকল রিপুগণ সাধককে সাধনায় উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করে, তাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা। তাদের কুল পর্যন্ত ক্ষয় করতে উদ্যত হয়, কুল অর্থাৎ পৃথিবী। কণ্ঠ থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত যে সকল চক্র রয়েছে, তা হল কুলসকল। কুল অর্থাৎ কু- পৃথিবী, ল- যিনি ধারণ করে আছেন, অর্থাৎ কণ্ঠ থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত রিপুসকলকে পৃথিবী বলে, আর ঐ সকলের সমষ্টি যিনি ধারণ করে আছেন, তিনি হলেন সেই প্রাণরূপী তেজস্তত্ত্ব অর্থাৎ মণিপুর। জীব পরমপরা প্রসূত বংশকে কুল বলে জানে, যা সঠিক নয়। এই পৃথিবীর মধ্যে নানা রূপ দেহের পাপ কার্য্য হয়ে থাকে, তা হলে জীব কেন সেই পাপ হতে মুক্ত হবার উপায় খুঁজবে না?

**কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।**
**ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যুত।।৩৯**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কুল কথার অর্থ প্রাণ। আর এই প্রাণকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই কূটস্থচৈতন্যরূপী শ্রী আত্মনারায়ণ। এই প্রাণনাশ হলে জীব বংশ উৎপাদন করতে পারে না অর্থাৎ প্রাণই যখন না রইল তখন সে বংশ-উৎপাদন কার্য্য করবে কি করে, তাহলে বংশ উৎপাদন হল না। আর প্রাণ থাকলে বংশ উৎপাদন জনিত কার্য্য করে কামপুত্র লাভ করে এবং প্রাণের ক্ষয় হয়। কিন্তু এই যৌগিক ক্রিয়া করলে প্রাণ ক্ষয় হবার সম্ভাবনা থাকেনা অর্থাৎ এতে প্রাণের বৃদ্ধি হয়। গুরুদেব যে যৌগিক ক্রিয়ার বীজ তোমার দেহের মধ্যে রোপণ করেছেন, তা সময়ে অর্থাৎ সাধনায় উত্তীর্ণ হলে জ্ঞানরূপ পুত্র লাভ হয়। এই প্রাণের ক্রিয়া করলে প্রাণের নাশ বা কুলক্ষয় হয় না, বরং না করলে প্রাণের গতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্থির প্রাণ কখনও নষ্ট হয় না কিন্তু চঞ্চল প্রাণ এই

চঞ্চলতা বৃদ্ধিজনিত কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

**অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।**
**স্ত্রীষুদুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবদেহের দুটি দিক আছে একটি স্ত্রী বা নারী প্রকৃতি আর অপরটি হল পুরুষ বা নর প্রকৃতি। সাধনাভ্যাসকালে সাধকের মনে নানারূপ সংশয় সৃষ্টি হয়। যেহেতু এই আত্মক্রিয়া রিপুদমনের ক্রিয়া, সেইহেতু সাধক-সাধিকাগণ মনে করেন যে তাঁদের শরীরস্থ যে সকল রিপুর সহিত এতকাল সঙ্গ করে আসছেন তাদের দমন হলে বা দমন করলে তাঁরা ধর্মক্ষেত্রে থেকেও পাপকার্য্যে লিপ্ত হবেন কিন্তু তা ভুল। শরীরস্থ যে সকল রিপু দেহসুখ, ইন্দ্রিয়-সুখে লালায়িত, তাদের বৃদ্ধির কারণে মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় এর ফলে প্রাণের ক্ষয় হয়। এর ফলে তারা সাধনা থেকে পিছিয়ে পড়ে। কারণ ধর্মক্ষেত্রে এই সকল রিপুর নাশ না হলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না।

তখন দেহের মধ্যে স্ত্রীরূপী রিপুগুলি চঞ্চলাপ্রকৃতি হয়ে,পরে সাধনাভ্যাসের ফলে সেই চঞ্চলা প্রকৃতি পরা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞানরূপী পুত্রের জন্ম হয়।

**সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।**
**পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের দেহের উপরিভাগ স্বর্গ এবং অধঃভাগ নরক অর্থাৎ কন্ঠ থেকে ভ্রূ পর্যন্ত স্বর্গ এবং কন্ঠ থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত নরক। এই দুই অবস্থাকে একত্রিত করে রেখেছে প্রাণরূপী আত্মা। সদা সর্ব্বদা সাধককে আজ্ঞা চক্রে অবস্থান করে সাধনা করতে হবে। এর ফলে মন যখন সেই আজ্ঞাচক্রে স্থির হবে তখন মূলাধারস্থিত বায়বীশক্তিরূপিনী সেই বায়ু আজ্ঞাচক্রে গিয়ে স্থির হয় এবং কুলকুন্ডলিনী চৈতন্যাবস্থা লাভ করে। এটাই হল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপী কূটস্থে পিন্ডদান, যাকে বিষ্ণুপদে পিন্ডদান বলা হয়। কাশীর বাবার ক্রিয়াযোগ বাণীতে আমরা পড়েছি ক্রিয়া করলে পূর্ব্বের সপ্তমপুরুষ ও পরের

সপ্তম পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এইরূপে পিন্ডদানের ফলে নরক পথগামী অর্থাৎ কন্ঠের নীচে যে সপ্তরিপু সকল এবং ঊর্দ্ধাভিমুখে অর্থাৎ কন্ঠ থেকে ভ্রূর মধ্যে যে সপ্ত রিপু আছে তাদের মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে, কোন জীবদেহরূপী পূর্ব্বের সপ্তম পুরুষ বা পরের সপ্তম পুরুষের মুক্তির কথা এখানে বলা হয় নি।

**দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।**
**উৎসাদন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আত্মাই হল প্রকৃত কুল। আত্মাই এই প্রাণকে ধরে আছে। আত্ম কর্মই হল সনাতন ধর্ম, যা আত্মার সঙ্গে যুক্ত। এই আত্মকর্ম করবার সময় ইন্দ্রিয়সুখ জনিত কারণে মনের মধ্যে নানারূপ সংশয় ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। আর জীব এই আত্মকর্ম করাকে অমূলক বলে বিবেচনা করে।

**উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।**
**নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।৪৩**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আত্মক্রিয়া করতে বসলে সদাসর্বদা দৃষ্টি ভালে বা দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত স্থানে স্থাপন করা প্রয়োজন, কিন্তু বহির্জগতের নানারূপ চিন্তা সর্বদা মনুষ্যদিগকে আবিষ্ট করে রাখে। সেগুলো হল দুর্মতি রূপ রিপুর ক্রিয়া। এর ফলে সাধনাভ্যাসকালে দুই ভ্রূর মধ্য থেকে দৃষ্টি সরে যায় এবং নানারূপ চিন্তা মনকে গ্রাস করে এবং তখন দৃষ্টি কন্ঠ থেকে ভ্রূর মধ্যে স্থির না থেকে, কন্ঠ থেকে গুহ্য দ্বারের মধ্যে স্থিরীকৃত হয়। তাকে অধর্ম্মরূপী নরকবাস বলা হয়ে থাকে। দেহের নিম্ন ভাগে যেহেতু তমোগুণের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশমান তাই একে নরক বলে এবং সাধক তামসিক প্রবৃত্তির দাস হয়ে নরক বাস করে।

**অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।**
**যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবদেহ ইন্দ্রিয় সুখকে বড় করে দেখে। অন্তর রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় এদের দমন করাকে পাপবোধ করে।

**যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।**
**ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবদেহ যেহেতু ইন্দ্রিয়াসক্ত তাই তারা সাধনার কথা ভুলে গিয়ে, সাধনায় উন্নতি করার আশা ছেড়ে দিয়ে সেই ইন্দ্রিয় সুখ অধিক কি করে লাভ করা যায়, সেই দিকে চিন্তা করে। ইন্দ্রিয় সুখে অত্যধিক আসক্ত হলে জীবের এইরূপ ভাব হয়ে থাকে। তখন তারা ইন্দ্রিয় সুখকে দমন করবার কার্য্য করতে চায় না।

**এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।**
**বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিগ্নমানসঃ।।৪৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** এইরূপ চিন্তা আসার ফলে সাধক শ্বাসের সহিত যে 'ওঁ'কার ক্রিয়া করে, যে আত্মধর্ম পালন করে, তার মধ্যে শিথিলতা দেখা দেয়; তখন 'ওঁ'কার রূপী প্রাণায়াম আর হয় না, তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধক আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি স্থাপন করে চুপ করে বসে থাকে। অনেক সময় কোন চক্রেই মনোনিবেশ হয় না, বসে বসে শুধু বহির্জগতের চিন্তাই করে, বহির্জগতে ইন্দ্রিয়সুখের উন্মত্ততার কথাই ভাবে। এটাই অর্জুনের গান্ডীব ছেড়ে রথে চুপ করে ব'সে পড়া।

**।। ইতি অর্জুন বিষাদ যোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

## সাংখ্য-যোগ

**তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।**
**বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবদেহের মন মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। যখন সে সাংসারিক জগতে থাকে অর্থাৎ নিজের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তখন সে এর ব্যাপকতা বুঝতে পারে না। সাধন ক্ষেত্রে যখন সাধক-হিসাবে জীব অবতরণ করে, তখন এই সকল মায়া, মমতা প্রভৃতির থেকে নিজেকে দুরে রাখতে হয়; কারণ এই মায়া-মমতা সাধনায় সাধকের বিশাল ক্ষতি করে। তাই সাধনাভ্যাসকালে শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থচৈতন্যের নিকট সদা সর্বদা নিজ চক্ষু নির্গত বারিধারা সহ করজোড়ে প্রার্থনা করতে হয় যে আমায় সাধনায় উন্নীত কর, আমায় মায়ামুক্ত কর।

**কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।**
**অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।।২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আত্মক্রিয়া করবার সময় শ্বাস ছয় চক্রের মধ্যে যাতায়াত করে। সেই সময় মন যদি কূটস্থচৈতন্যের মধ্যে আকৃষ্ট না থাকে তা হলে মন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী কূটস্থ হতে সরে যায় এবং নানারূপ ইন্দ্রিয় বিষয়ক চিন্তায় মন ধাবিত হয়। প্রাণের চঞ্চল গতি স্থির করার নামই হল আত্মধর্ম আর স্থিতিরূপ ধর্ম না করার নামই হল অধর্ম। ক্রিয়া অভ্যাস কালে সাধক একটি বিশেষ চঞ্চল প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হয়। এর ফলে সাধকের মনের মধ্যে আমি-আমার বোধ জাগ্রত হয়, যা হল মোহ। আর এই মোহ সাধন পথে চলতে গেলে কখন এসে উপস্থিত হয় তা সাধক বুঝতেই পারে না। এরা দপ্ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো আসে ও সাধককে তার নাগপাশে আবদ্ধ করে।

**ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।**
**ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সত্ত্ব, রজ, তমঃ জীবদেহ এই তিন-গুণের অধিকারী। যারাই আত্মক্রিয়া করে তারাই ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করবার জন্য এই দেহ আমির সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি— এই আশা, অর্থাৎ রজগুণ হতে সত্ত্বগুণ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। তাই যারা এই আত্মকর্ম পেয়েছে অথবা আত্মধর্ম পালন করছে, বা আত্মক্রিয়া করছে তাদের চক্র স্মরণ না করে ইন্দ্রিয় সুখের চিন্তা করা কখনই উচিত নয় বা ইন্দ্রিয়দের উদ্দেশ্যে কাতরতা এই কর্মে নিযুক্ত সাধকদের কখনই শোভা পায় না। তাই মেরুদন্ড সিধে করে বসে যো - সো করে প্রতি চক্রে চক্রে শ্বাস টানা ও ফেলা অভ্যাস করা একান্ত দরকার এবং আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

**কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।**
**ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধক সাধনাভ্যাসকালে নানারূপ ভয়ে ভীত এবং নানারূপ ইন্দ্রিয়জনিত সুখের বশবর্তী হয়ে দেহে ক্রিয়া না করবার জেদ উৎপন্ন হয়। তার থেকে নিস্তার পাবার জন্য কূটস্থচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন (মধু কথার অর্থ - মায়া, মোহ ইত্যাদি, আর সূদন অর্থাৎ যিনি তা নাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থচৈতন্য এর নাশ করে থাকেন, যখন সাধক সাধনায় প্রবল চেষ্টা করে এবং উত্তীর্ণ হয়, তখন তার মধ্যে হতে এই মায়া মোহ ইত্যাদি চলে যায়।)। এর নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করা উচিৎ যে তার মধ্য থেকে জেদ ও ভয়কে, কি করে পরাস্ত সে করবে ? কি ভাবে, কোনপথে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওঁকাররূপী বাণ ক্ষেপণ করলে তাদের নাশ হবে?

**গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্**
**শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।**
**হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব**
**ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধন পথে অবতীর্ণ হবার পূর্বে সদাসর্বদা ভয় ও জেদ এই দুই কার্য্য জীবকে ধারণ করে রেখেছে এবং তাদের ইচ্ছানুসারে সে এতকাল চালিত হয়েছে। তার সাধন পথে অবতীর্ণ হবার পর ইন্দ্রিয়দমন করতে গিয়ে ভয় ও জেদ সাধকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ কূটস্থচৈতন্য রূপী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের কাছে তার একটাই প্রার্থনা হওয়া উচিত, যে— কি করে আমি এদের বধ করব? সাধনা করতে করতে যখন মন বারবার একই প্রার্থনা কূটস্থচৈতন্যের কাছে করে, তখন তিনি প্রসন্ন হলে ভয় ও জেদ সাধকের হৃদয় হতে বিতারিত হয়। অনেকের ধারণা ভয় ও জেদ মন থেকে বিতারিত হলে আসক্তি এসে পথ রোধ করে কিন্তু তা সঠিক নয়। ভয় ও জেদের নাশ হলে আসক্তিরও নাশ হয়।

**ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো**
**যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।**
**যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-**
**স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।।৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের দেহের সম্মুখভাগ ইন্দ্রিয়াধীন। সাধনাকালে বা ইন্দ্রিয়দমন ক্রিয়া শুরু করার পূর্বে আমাদের মন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়-যেমন আমরা এই দমনক্রিয়া কেন করব, আমরা ইন্দ্রিয়জনিত দেহসুখ থেকে বিরত থেকে কেন দেহগত ইন্দ্রিয়ভোগ করব না, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এসব দমনে আমাদের প্রয়োজন কি, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা আমাদের প্রার্থনীয়?

**কাপর্ণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ**
**পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।**
**যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে**
**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধন অভ্যাস কালে নানা রকম সন্দেহ আমাদের

মনের মধ্যে আসতে থাকে কারণ আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাই আমরা অহং জ্ঞানে মত্ত। আমরা সর্বদা যে কোন কার্য্য করবার আগে তার ফলের আশা করে থাকি অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের লক্ষ্য হওয়ায় আমাদের চিত্তে চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় এবং দুই নাসিকা দিয়ে যে শ্বাস নির্গত হচ্ছে তার মধ্যে শিথিলতা আসে অর্থাৎ স্থিরত্ব ভঙ্গ হয়। তাই কোনটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য ভগবান শ্রীকূটস্থচৈতন্যরূপী শ্রীগুরুদেবের নিকট নিরন্তর প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের জানা উচিত, কোন পথে গেলে আমরা চির মুক্তি এবং চির আনন্দ পাব?

**নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ**
**যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।**
**অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং**
**রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** দেহরাজ্যে যিনি সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন অর্থাৎ সাধনায় সাহায্যকারী যে সকল রিপু সাধককে সাধনায় অগ্রসর হতে সাহায্য করছে তারা ইন্দ্রিয় দমন বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। তাই ইন্দ্রিয় দমন কাজ শুরু হলে মনের মধ্যে ভয় ও বিষাদের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয় কার্য্য হতে ইন্দ্রিয় দমন কার্য্যই অধিক শ্রেষ্ঠ এবং এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন তুমি যোগী হও।

**এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।**
**ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।৯**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণকে ধারণ করে আছে আত্মা। আমাদের দেহস্থিত আত্মা 'মন', সে চঞ্চল, সে চঞ্চল। হলেই দেহের মধ্যস্থিত সকল ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুগণের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, আর প্রাণ স্থির হলে ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্ম্য আর থাকে না। সুতরাং প্রাণই ইন্দ্রিয়গণের চঞ্চলতার কারণ, তার অপ্রকাশে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়ে পড়ে।

**তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।**
**সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মোহ সাধকের মহা শত্রু ,যা তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জুনকে দুর্বল করে দেয়, অর্থাৎ সাধকের সাধনার শিথিলতা দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্যে কূটস্থচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়ে তার মোহ নাশ করার জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

**অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।**
**গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।১১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতির অধীন। বাল্যাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্ম্য কিছুটা কম ছিল অর্থাৎ শিথিল ছিল বা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। বাল্যকাল হতে কৈশোর, কৈশোর থেকে যখন যৌবনে পদার্পণ করল, তখন দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকা কামনা বাসনারূপ রিপুগুলির প্রাবল্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল এবং তখন দেহ, ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা দেহসুখ ও ইন্দ্রিয়সুখের দিকে তারা অধিক লালায়িত হতে থাকল এবং এরপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে যৌবনকাল চলে গিয়ে বার্ধক্য আসতে থাকে। তখন রিপুদের প্রাবল্য, যা পূর্বে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা পূর্বের ন্যায় রয়ে যায় কিন্তু দেহ সুখের উদ্দেশ্যে যে সকল ইন্দ্রিয়গুলি ভোগাসক্ত সেইগুলি প্রকৃতির নিয়মে শিথিল হয়ে যায়। মনে আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল কিন্তু কার্য্য করবার ক্ষমতা চলে গেল অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে. যে এই সকলই অনিত্য। যা সদাসর্বদা বিদ্যমান এবং সর্বত্র সমপ্রকারে থাকে, যা কোনদিন নাশপ্রাপ্ত হয় না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তাই নিত্য বস্তু। আর আমরা সেই অনিত্য বস্তুর পিছনে সদা ধাবমান, এই অনিত্য লাভের আশায় আমরা সর্বদা হানাহানি, হিংসা-হিংসি, খুন-খারাপি ইত্যাদি করে থাকি, অর্থাৎ উপরিউক্ত এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে "বুঝেও বুঝে না মন, সবই যে অনিত্য"। সেই অনিত্য বস্তু না পেলে মন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে— সে আমায় দিল না, সে আমার করল না, ওটা আমি

পেলাম না, এই সকল নানারূপ চাহিদা মনের মধ্যে ভিড় করে এবং মন শোকাচ্ছাদিত হয়। এর ফলে দুর্মতিরূপ রিপুগুলির প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়, কুলধর্ম বা আত্মধর্ম নষ্ট হয় এবং বিষ্ণুপদে পিন্ডদান লোপপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই গীতায় অর্থাৎ প্রাণের ভগবান উজ্জ্বলতম প্রকাশ করে অর্থাৎ নিজের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে হাস্যমুখে বলেন, তুমি অজ্ঞানীর মত শোক করছ অথচ বিজ্ঞের মত মুখে বড় বড় কথা বলছ, বিজ্ঞ কথার অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞান কথার অর্থ সকল বিষয়ে জানা, অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে জানেন, তিনিই হলেন প্রকৃত জ্ঞানী। আর তাঁর কাছে আত্মজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তাঁর নিকট কোনরূপ আমি-আমার বোধ থাকে না, তার ফলে তাঁর নিকট মায়া-মমতা, শোকতাপ কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই বুদ্ধি, এই জ্ঞান যাঁর মধ্যে জন্মেছে তিনিই পণ্ডিত। তিনিই সাধনা করে প্রাণায়ামরূপ বেদ পাঠ করে সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এইরূপ ব্যক্তি কোনকিছু কামনা বা বাসনার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। তারফলে তার মধ্যে শোকতাপ কোনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

**ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।**
**ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।।১২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ভগবান কূটস্থচৈতন্য হলেন আত্মনারায়ণ, তিনি সকল জীবদেহের মধ্যে সবিতৃমণ্ডলের ন্যায় অবস্থান করছেন। স্থির প্রাণরূপ আত্মনারায়ণ, যিনি স্থির হয়েছেন শুধু তাহার মধ্যেই বিদ্যমান নন। তিনি সকল জীবদেহের মধ্যেই বিদ্যমান। জীবের জন্ম মৃত্যু সকল কিছু বিন্দু থেকে সৃষ্টি ও বিন্দুতেই লয়প্রাপ্তি অর্থাৎ এক বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর বস্ত্র পরিধান করা। এই জন্ম-মৃত্যু কেবল মাত্র অবস্থান্তর। নর-নারায়ণ, যিনি উজ্জ্বল অবস্থায় দেহের মধ্যে অবস্থিত তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না। দেহত্যাগ হলে তোমার সব কিছু বিনষ্ট হয় না, তোমার কর্মফল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এরপর তুমি আবার জন্মগ্রহণ করলে তোমার পূর্বের কর্মসূত্র ধরেই তুমি জন্মগ্রহণ করবে এবং সেই জন্মেও যা কর্ম করবে পরবর্তী জন্মেও তার ফল আবার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। প্রাণের চঞ্চলতার প্রকাশেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি। সাধনায় সিদ্ধি

লাভ করেও জীবের ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু লুপ্ত হয় না, তারা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানে সেইরূপই থাকে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পর জীব সেই দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের ইচ্ছে মত চালাতে পারে অর্থাৎ তখন জীবকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই জীবের দাসত্ব করতে হয়।

**দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।**
**তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আত্মা হল অবিনশ্বর, তার মৃত্যু কখনও কোন দিনও হতে পারে না। মৃত্যু হয় শুধু মাত্র দেহের, পুনর্বার জন্মগ্রহণের পরে আত্মা অপর একটি দেহ ধারণ করে, অর্থাৎ দেহান্তর একটি অবস্থা মাত্র। জীবদেহে কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এই ভাবে দেহের যেমন এক একটা অবস্থার পরিবর্তন হয়, মৃত্যুর পর অপর একটি দেহধারণ সেইরূপই একটি অবস্থা মাত্র। তাই জীবদেহের মধ্যেই সদাসর্বদা একটা ভয় বিরাজ করে যে যোগক্রিয়া করলে ইন্দ্রিয়দমিত হবে আর ইন্দ্রিয়দমিত হলে জীবদেহ শব দেহে পরিণত হবে। সত্যি ইন্দ্রিয়দমিত হলে জীবদেহ শবদেহে পরিণত হয় অর্থাৎ জীব আত্মক্রিয়া সাধনা করলে প্রাণায়ামরূপী বায়ু যখন দুই ভ্রূর মধ্যে স্থিতিলাভ করে তখন তার শ্বাস কণ্ঠ থেকে ভ্রূর মধ্যে যাতায়াত করে;— একেই শব দেহের উপর উপবেশন করে সাধনা করা বলে। এর অর্থ কোন অপর একটি মৃতদেহের উপর বসে জীবের সাধনা করা নয়। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে বা উত্তীর্ণ হলে আত্মা আর দেহের মধ্যে বিচরণ করেন না, তখন তার ব্যাপ্তি হয় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তখন সে দেহ থাকে না, তখন সে হয় দেহী। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ লাভ হয় আর মৃত্যুকে একবার চিনে নিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। এটাই হল সাধকের আত্মাকে প্রাপ্তি, কিন্তু সেইরূপ সাধক কোথায়? সেইরূপ মৃত্যু হয় কজনের? তাই দেহান্তর-প্রাপ্তি এক খাঁচা থেকে অন্য খাঁচায় যাওয়া মাত্র। যা লালনের কথায় ঃ— 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেম্‌নে আসে যায়।'

**মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।**
**আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** অর্জুন হল প্রাণশক্তিরূপী পুত্র অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার পর সাধক মৃত্যুকে চিনে ফেলে, তখন তার মধ্যে সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আর তার মনকে টলাতে পারে না। তখন ইন্দ্রিয়গণ নিজেরা নিজেদের কার্য্য আপনা-আপনি করতে থাকে এবং সাধক তার কার্য্য করতে থাকে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সাধক সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর সে আর ইন্দ্রিয়াধীন থাকে না। তখন ইন্দ্রিয়েরা তার অধীনে কাজ করে। সুতরাং শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মের পর যেমন শীত আসে, সেইরূপ অনিত্যবস্তুর দিকে সেই সাধকের মন কখনও ধাবিত হয় না, যা প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটছে তা ঘটতেই থাকে এবং সাধকও তা ঘটতে দেয়। অনেক জীবদেহের মধ্যে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, সাধনা করলে, ইন্দ্রিয়দমন করলে যদি মনের আনন্দ চিরশান্তি ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তা হলে সাধকরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার পরও কেন সাধকের দেহ জরা-ব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সাধক প্রকৃতির নিয়ম বা প্রকৃতির দ্বারা যা দেহের মধ্যে আসছে তা রোধ করার ক্ষমতা থাকলেও তারা তা করেন না। কারণ ভালটাও যেমন তাঁর, মন্দটাও তেমন তাঁর। সুতরাং রোগ, ব্যাধি, জরা এগুলো সব তাঁরই সৃষ্টি, তাই সেগুলোকে দেহ থেকে দূর করতে পারেন না বা চান না। এছাড়া তারা আপন প্রারব্ধ কর্মফল খন্ডন করবার জন্য আপন শরীরে নানারূপ ভোগ সকল নিয়ে থাকেন। এই যোগক্রিয়া হল গুপ্ত। দেহের মধ্যে বা মনের মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তারা সদাসর্বদা সাধককে কি করে বিপদে ফেলা যায় তার চেষ্টা ক'রে চলে। তাই সাধক সাধনায় উত্তীর্ণ হলেই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি চিরতরের জন্য মরে যায় না। তারা দেহের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালায়। তাই উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখে বলা যেতে পারে, " 'ম'রেও মরে না রাম এ কেমন বৈরী"। তাই সাধকেরা সর্বদাই সাধারণ জীবের ন্যায় আচরণ করে, পাছে যদি কোন প্রকারে নিজের অহংজ্ঞান তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও দেখা দেয় তা হলে সাধকের মধ্যে ইন্দ্রিয় সকল তাদের কার্য্য দ্রুতগতিতে করে এবং সাধকের মনে সেই সকল বিষয়ের ভাবধারা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে সাধকের পতন ঘটাতে

পারে। তাই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সব শেষ হয়ে যায় না, তখনও সাধকের ভেতরে এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রাবল্য যাতে কোনরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়ার বাবা বলেছেন যে — "চিতেয় না উঠলে এ যাবার নয়।"

**যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।**
**সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫**
**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।**
**উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে যখন আত্মাকে চিনে তাঁতে মিশে যান, তখন তাঁর মধ্যে সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা এর কোনকিছুই আঘাত করতে পারে না, তখন সে অমরত্ব লাভ করে। তখন সে দেহে থাকে না, দেহীতে রূপান্তরিত হয় এবং সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করে। তখন সে সেই পরা শান্তি বা পরা-প্রকৃতিতে মিশে যায়।

আত্মা হল নিত্য বস্তু। অনিত্য বস্তুতে এর কোন সত্তা নেই। প্রাণ এই আত্মার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ যা শূন্য হতে এসেছে। তাই তার বিনাশ কেউ কখনও করতে পারে না, কারণ "শূন্য ধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ"। আর আত্মা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান— যেহেতু 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। সেইহেতু দ্বিতীয় কোন সত্তা না থাকায় আর সকলই অনিত্য। তাই এর বিনাশ কখনও সম্ভব নয়। তাই এক জীবদেহ অপর জীবদেহে খুনখারাপি, মারামারি, হিংসা-হিংসি ইত্যাদি করে সেই দেহের ওপরে অনিষ্ট করে মাত্র বা সেই দেহের ক্ষতি বা বিনাশ করে মাত্র কিন্তু প্রাণের নাশ করতে, কেহ- কখনও, এই ত্রিভূবনের কোন শক্তি তার নাশ, নষ্ট বা ক্ষতি করতে পারে না।

**অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।**
**বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।।১৭**
**অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ।**
**অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** দেহসুখে ও ইন্দ্রিয়সুখে মানুষ সর্বদা লালায়িত, তাই সে সাধনা করতে ভয় পায়, মৃত্যুকে সে ভয় পায়। মৃত্যুতো একটি অবস্থান্তর মাত্র। এরপর সে এক দেহ ছেড়ে অপর দেহ ধারণ করে। আত্মার তো বিনাশ নেই, সে তো কখনও মরে না অর্থাৎ জীবের প্রাণ নাশ হয় না। মানুষের বা জীবের প্রাণ বিনষ্ট করবার ক্ষমতা এই ত্রিভূবনে কারও নেই। তাহলে কেন সাধক মিথ্যা ভয় পাচ্ছ? তুমি তোমার মনের ভয় শ্রীকৃষ্ণরূপ কূটস্থচৈতন্যের পদতলে অর্পণ কর এবং ভালে রত থেকে আত্মকার্য্য করবার জন্য মেরুদন্ড সিধা করে বস' এবং সাধন সমরে জয়ী হবার চেষ্টা কর।

**য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।**
**উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯**
**ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ**
**নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।**
**অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো**
**ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আত্মা শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই তাকে হত্যা কেহ কখনও করতে পারে না, যেহেতু আত্মা ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সেইহেতু তার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মালেই মরতে হবে তা ধ্রুব সত্য ঘটনা, কিন্তু যখন জন্মই নাই, তখন মৃত্যু হবে কোথা থেকে? তাই আত্মা হল অবিনশ্বর এবং তিনি উৎপত্তি ও নাশশূন্য। যেমন শরীর বিনষ্ট হলে প্রাণ বিনষ্ট হয় না। সেরূপ ঘট বিনষ্ট হলে ঘটাকাশ বিনষ্ট হয় না।

**বেদাবিনাশিনং নিত্যং এনমজমব্যয়ম্।**
**কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১**
**বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়**
**নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।**
**তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি**
**সংযাতি নবানি দেহী।।২২**

**তাৎপর্য্য ঃ**— আমরা মাঝে মধ্যেই দেখতে পাই যে, অমুকের প্রাণ নাশ হয়েছে এবং অমুক তার প্রাণ নাশ করেছে। কিন্তু প্রতিটি জীবদেহের মধ্যেই আত্মা বিরাজমান, আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু, বাকী সকলই অনিত্য অর্থাৎ আর দ্বিতীয় কোন নিত্যবস্তু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাহলে প্রাণনাশ করেই বা কে? আর প্রাণনাশ হয়ই বা কার? আত্মার জন্মও নেই, আত্মার মৃত্যুও নেই। তাই আমরা সাধারণ চোখে যাকে জন্ম বলে দেখি তা নতুন বস্ত্র পরিধান করা আর যা মৃত্যু বলে দেখি তা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করা।

**নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।**
**ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।২৩**
**অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।**
**নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।২৪**

**তাৎপর্য্য ঃ**— আত্মা শূন্য, তাই "শূন্য ধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ"। একে কেউ কখনও ছেদ করতে পারে না, একে কেউ দগ্ধ বা সিক্ত করতে পারে না। সে হল সর্বব্যাপী; এর কোন আদি অর্থাৎ গোড়া নেই, অন্ত অর্থাৎ আগা নেই। এর কোন আকার নেই, এ নিরাকার। তিনি সকল জীবদেহে সূর্য্যের চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্বদা স্থির এবং তাঁর সর্বদাই এক রূপ।

**অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।**
**তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৫**
**অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।**
**তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬**

**তাৎপর্য্য ঃ**— সাধক সাধনা করতে করতে স্থিরাবস্থা লাভ করে। প্রত্যহ ঠিকভাবে আত্মক্রিয়া পালন করলেই তবে সাধক তার চঞ্চল অবস্থা হতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে স্থিতাবস্থায় উপনীত হয়। চঞ্চল অবস্থায় আত্মাকে চেনা বা তার সাক্ষাৎ কখনই সম্ভবপর নয়। স্থির হলে তখনই আত্মাকে জানা বা তাঁকে চেনা সম্ভব হয়ে থাকে। আমরা সাধারণতঃ জন্মালে আনন্দ ও মরলে শোক

প্রকাশ করি, যা কখনই উচিৎ নয়। তাই যদি বল, তা হলে জন্ম ও মৃত্যু আমাদের প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ হচ্ছে। কারণ যখন মানুষ মরে যায় তখন তার শ্বাস দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, আর যখন সে জন্মায় তখন তার শ্বাস দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমাদের এই দুই নাসিকার মধ্যে দিয়ে শ্বাস প্রবেশিত ও বহিরাগত হয়। সেইহেতু আমাদের প্রত্যহ প্রতিক্ষণে জন্ম ও মৃত্যু হয়। তাই এই জন্ম-মৃত্যু নামক অনিত্য বস্তু নিয়ে আনন্দ বা শোক এইসব কিছু করা উচিৎ নয়।

**জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।**
**তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭**
**অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।**
**অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮**

তাৎপর্য্য ঃ— জীবের দেহ হতে প্রতিদিন শ্বাস ২১৬০০ বার করে প্রবেশ করে ও বহিরাগত হয়, অর্থাৎ জীব প্রতিদিন ২১৬০০ বার করে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করেন। সাধনা করে, সাধক এই শ্বাসের গতিপথ উল্টো করে অর্থাৎ বহিরাগমনকে রোধ করে, তাকে অন্তর্মুখী করে। এর ফলে শ্বাসের গতিপথ উল্টে যায় এবং চঞ্চল প্রাণ যা এই দুই নাসিকা মধ্য দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ফলে হয়েছে তা রোধ হয় এবং সাধক স্থিতিলাভ করে। তখন টানাফেলা এইসব কোন উপলব্ধি তার হয় না এবং সেই অবস্থা চলে যাবার পর সাধক তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, কারণ একে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এ কেবল মাত্র নিজ বোধগম্য। আর যারা এই স্থিতিশক্তি উপলব্ধি হচ্ছে না বলে আত্মক্রিয়া পালন করতে পারছিনা বা ক্রিয়া করতে পারছিনা এইরূপ শোকে সর্বদা মুহ্যমান থাকে, তখন তারা এই ভ্রমজালের মধ্যাবস্থায় পড়ে সংসার মরীচিকায় আবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ মায়া মোহে আবদ্ধ হয়ে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণা ভোগ করে। সেইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থচৈতন্য সর্বদা বলছেন, তুমি আমায় স্মরণ কর আমি যুগ যুগ ধরে তোমায় রক্ষা করব। তুমি অবশ্যই স্থির শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আমার হচ্ছে না, আমি পারছি না, এইরূপ ভেবে

মনে শোকের সঞ্চার ঘটিও না, যা তোমার হৃদয় বিদীর্ণকারক। তুমি ভালে রত থাক, তুমি ভূমে অর্থাৎ গর্ভ হতে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে ব্যক্ত অবস্থা ধারণ করলে, তার পূর্বে যখন তুমি গর্ভে ছিলে তখন তুমি অব্যক্ত অবস্থায় ছিলে— অর্থাৎ 'গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি'। তুমি যেখান থেকে এসেছ আবার সেখানেই ফিরে যাবে, অর্থাৎ তুমি অব্যক্ত অবস্থায় জন্মের পূর্বে বা ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে যেমন ছিলে তেমনি মৃত্যুর পর আবার তুমি অব্যক্ত অবস্থায় যাবে অর্থাৎ দেহধারণের সময় পরমাত্মা জীবাত্মায় রূপান্তরিত হয় এবং মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরমাত্মায় রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ 'যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদেন কালে, জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে।'

যখন সাধক সাধনা করেন তখন আজ্ঞাচক্রে গিয়ে তার প্রাণায়াম রূপী শ্বাস স্থিতি লাভ করে। আবার প্রাণায়ামরূপী শ্বাস রেচক করবার সময় তা মূলাধারে গিয়ে স্থিতিলাভ করে, অর্থাৎ প্রাণায়াম করবার সময় পূরক করে আজ্ঞাচক্রে কিছুক্ষণ স্থিতি এবং রেচক করে মূলাধারে কিছুক্ষণ স্থিতি, সাধকের সাধনাভ্যাস কালে তা করা একান্ত দরকার। এই ভাবে প্রাণায়াম করতে করতে আদি ও অন্তে স্থিরাবস্থা লাভ হয়। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যা ইন্দ্রিয়গণও উপলব্ধি করতে পারে না। যখন আদি ও অন্তে স্থিতি হয় না বা সেইদিকে সাধক যখন লক্ষ্য করে না তখন তার মনের মধ্যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। তখন নানারূপ শোক-তাপ সাধককে চেপে ধরে এবং আমি-আমার বোধ জাগ্রত হয়। তাই প্রাণায়াম করবার সময় তার আদি ও অন্তে কিছুক্ষণ স্থিতি একান্ত দরকার। এইরূপ চেষ্টা করতে করতে দুইপ্রান্তে স্থির ভাব আসে। আদি ও অন্তে যখন স্থিরভাব আসে তখন মধ্যাবস্থাতেও সেই স্থিরভাব এসে সাধককে স্থিরে পরিণত করে। তাই সাধককে উভয় প্রান্তে স্থিতিরূপ প্রাণায়ামরূপী পূরক ও রেচক করবার চেষ্টা করা উচিৎ।

**আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্**
**আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।**
**আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি**

**শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯**
**দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।**
**তস্মাৎ সর্ব্বানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধক সাধনা করতে করতে যখন স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সে আত্মাকে দর্শন করে ও আত্মার সঙ্গে মিশে যায়। অনেক জায়গায়, অনেক স্টেজে, অনেক ধর্ম আলোচনা সভাতে আত্মার সম্বন্ধে নানারূপ বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায় অর্থাৎ Loud speaker-এর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে, গেরুয়া বসন পরে আত্মা কি, তাকে কেমন দেখতে ইত্যাদি বক্তৃতা করে। আর যারা শ্রোতা, তারা সম্মুখে বসে মনে মনে নানারূপ কল্পনা করে।

আত্মা হল অব্যক্ত, যাকে স্বচক্ষে দেখেও, তার সঙ্গে মিশেও তাকে কখনও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই যাকে দেখে, যাকে চিনে, যার সঙ্গে আলাপচারিতা করেও তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তাহলে যাকে জানিনা; যাকে দেখিনি, তার আকার-আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মনের মধ্যে ভাব পোষণ করলে আত্মাকে কি জানা যায়? তাই যো-সো করে সাধন সমরে ঝাঁপিয়ে পড়। মেরুদন্ডরূপ গান্ডীব তুলে ধর, তাতে 'ওঁ'কাররূপী শর স্থাপন কর এবং প্রতি চক্র লক্ষ্য করে সেই শর উৎক্ষেপণ কর। এই ভাবে শর উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মেরুদন্ডস্থিত সুষুম্না নাড়ী খুলে যায় এবং তখন শ্রীকৃষ্ণরূপী আজ্ঞাচক্রে গিয়ে মন স্থিতিলাভ করে এবং সেই স্থিরাবস্থায় সেই আত্মার প্রকাশ হয়।

তখন তুমি জানতে পারবে সেই অব্যক্তরূপী আত্মার কথা যার জন্য তুমি জীবিত আছ বা দেহধারণ করে আছ, যার জন্য তুমি আনন্দে হাসছ ও দুঃখে কাঁদছ, তাঁর বিনাশ নাই।

**স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।**
**ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১**
**যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।**
**সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** পূর্বে যোগীঋষিরা চতুর্বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এইভাগ কোন সমষ্টিগত জীবদেহদের ভাগ নয়— অর্থাৎ যারা পৈতেধারী বা যারা পূজা অর্চনায় ব্রতী তারাই ব্রাহ্মণ, যারা একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করে তারা ক্ষত্রিয়, যারা বাণিজ্য করে তারা বৈশ্য, আর যারা এই তিন বর্ণের সেবা করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করে তারা শূদ্র— এইরূপ মানে করা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা কোন জীবদেহের গোষ্ঠী নয়। তাই চতুর্বর্ণ যোগীঋষিরা আমাদের এই দেহকে জেনে ভাগ করেছেন। যেমন— আমাদের পায়ের নখ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শূদ্র। হাঁটু থেকে জানু পর্যন্ত বৈশ্য। জানু থেকে গলদেশ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় এবং গলদেশ থেকে মাথা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ। শূদ্রের কাজ হল সেবা করা তাই সে আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যায়। তাই সেবামূলক কাজ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পেয়ে থাকে বৈশ্যের দ্বারা অর্থাৎ শূদ্রের সঙ্গে ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুক্ত আছে বৈশ্য। তাই বৈশ্যর দ্বারাই ক্ষত্রিয় এই সাহায্য পেয়ে থাকে আর ক্ষত্রিয়র দ্বারা ব্রাহ্মণ। সাধনক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ই হল সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে যে সকল যুদ্ধ হয় তা সীমাবদ্ধ থাকে জানু থেকে গলদেশ পর্যন্ত এবং ইন্দ্রিয়রাও ঐ স্থানের মধ্যে অবস্থান করে। তাই যুদ্ধক্রিয়া যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সেইহেতু এই সাধন সমরে ক্ষত্রিয়ই হল প্রধান। আর এই ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ দেহ-আমির সঙ্গে আমার-আমির। তাই প্রাণায়ামরূপী অস্ত্রের দ্বারা সাধনসমরে সাধক সাধনা করে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধনা করা। ব্রহ্মে বিচরণ করে যে, সেই ব্রাহ্মণ। এখানে কোন পৈতেধারী ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়নি। তাই গুরূপদেশ মত স্থির কার্য্যের এই ক্রিয়া করে চল, কি পেলে, কি হল না, এই সমস্ত কিছুর দিকে দৃষ্টি দিও না, দৃষ্টি নিবদ্ধ কর দুই ভূর মাঝখানে এবং ভারত হবার চেষ্টা কর।

এই ক্রিয়া হল প্রাণের ক্রিয়া, আর প্রাণরূপী তেজস্তত্ত্ব হল অর্জুন। তাই নাভিতে চাপ দিয়ে বায়ু পেটে প্রবেশ করান আবার সেই নাভিতে চাপ দিয়ে পেট হতে বায়ু বাহির করা, এইরূপ কার্য্য করলে প্রাণায়ামরূপ শ্বাস আপনা

আপনিই চলতে থাকে এবং দুই ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে চক্রে চক্রে ওঁকার রূপী মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা শ্বাসকার্য্য করতে থাকলে ক্রিয়া বিধিপূর্বক হয়ে থাকে। তখন এইভাবে কার্য্য করতে করতে প্রবলভাবে চেষ্টা করতে করতে তবেই মুক্তাবস্থা বা স্বর্গলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু তার জন্য আন্তরিকতা এবং ভালবাসা বিশেষ দরকার। যা বর্তমান যুগে ভীষণ অভাব, তাই আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে তুমি ক্রিয়াকে আপন করার চেষ্টা কর, তখন দেখবে সেই আন্তরিকতা ও ভালবাসা ক্রিয়া তোমার উপর দেখাবে। তাই ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই কার্য্য হতে পারে। যাদের ক্রিয়ার প্রতি আন্তরিকতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি থাকে না, তারা তমোগুণাচ্ছাদিত পুরুষ, তাদের দ্বারা ক্রিয়া সম্ভবপর হবে না। তাই মনের মধ্যে আগে জোর করে বিশ্বাস আন এবং মনের মধ্যে গেঁথে ফেল, তিনি যা করছেন, যা বলছেন সকলই আমার ভালোর জন্য। তিনি নিজের জন্য কিছু করেন না আর এইরূপভাব যখন মনের মধ্যে গেঁথে যাবে, তখন বিশ্বাসভঙ্গ হবে না, আর বিশ্বাস থাকলে ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা আপনা- আপনি আসে।

**অর্থ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।**
**ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩**
**অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।**
**সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ক্রিয়া করবার সময় সর্ব্বদা দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তীস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্রিয়া করা উচিত অর্থাৎ কূটস্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্রিয়া করা উচিত। এইরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্রিয়া করলে ক্রিয়া আরম্ভ কালে সেখানে অন্ধকার দেখায়। ধীরে ধীরে প্রাণায়াম করতে করতে সেখানে মৃদুমন্দ আলোর ছটা প্রস্ফুটিত হতে থাকে, তখন সেই অন্ধকার ধীরে ধীরে ধূসর বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আর তখন মন কিছুটা ঐ কূটস্থে স্থির হয়, এইভাবে প্রাণায়াম করতে থাকলে মন ঐ কূটস্থে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্থির হয়, তখন ঐ ধূসর বর্ণের আলোর জ্যোতি ধীরে ধীরে শুভ্র বর্ণে রূপান্তরিত হয়। "একেই বলে, আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধরি গগনের চাঁদ"। তখন সাধক আকাশবাসী হয়ে আকাশে আসন স্থাপন করে ক্রিয়া করে। আকাশে আসন স্থাপন করা অনেক পরের কথা, আগে আকাশের

সঙ্গে পরিচিত হও, তারপর আসন পেত। তাই সকল সাধক ও সাধিকার কাছে আমার একটি একান্ত অনুরোধ তোমরা দুই ভ্রূর মধ্যবর্তীস্থানে কূটস্থে মনোনিবেশ করে ক্রিয়া করো। কূটস্থে মনোনিবেশ করলে বহির্জগতের কোন চিন্তা তোমার মনে দাগ কাটতে পারে না। আর মনোনিবেশ না করলে বহির্জগতের সকল চিন্তা তোমার মনের মধ্যে এসে ভিড় করে। তখন আর ক্রিয়া করা হয় না, অর্থাৎ কূটস্থে মন রাখলেই পুণ্য না রাখলেই পাপ। এই কূটস্থব্রহ্ম হল আত্মা, যিনি অক্ষয়, যার ক্ষয় নাই, আর কূটস্থে মন রেখে কাজ করাই হল অক্ষর কর্ম।

**ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।**
**যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫**
**অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।**
**নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধক সর্বদা এটা মনে রাখবে যে তুমি ইন্দ্রিয়দমনরূপ কার্য্যে সদা লিপ্ত অর্থাৎ প্রত্যহ দুবেলা তুমি সাধনা করবে। আর করলে তুমি এই দমনরূপ কার্য্যে যুক্ত রইলে, আর যখনই তুমি ঠিকমত দুবেলা ক্রিয়া বা সাধনাভ্যাস হতে বিরত থাকবে, তখন জেন তুমি সাধনভ্রষ্ট হলে। তুমি ক্রিয়া করছ বলে বাইরের শত্রু তোমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তখন তোমার নানারূপ নিন্দা, অসম্মান, তিরস্কার ইত্যাদি সাময়িক বিষয়ে নানাপ্রকার দুঃখকর অনিত্য বস্তুর সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলে তুমি ক্রিয়াত্যাগ করো না, করলেই তুমি সাধন ভ্রষ্ট হবে। সাধনা ভ্রষ্ট হলে এরা দিন-দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, আর কমা? সে তো দূরের কথা। তাই সাধনকালে যে সকল ইন্দ্রিয়কে তুমি দমন করছ, তাদের দমনকৃত কারণে তোমার সাময়িক এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে সুখকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

**হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।**
**তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।৩৭**
**সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।**
**ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধনা করতে গেলে নানারূপ ভাব অর্থাৎ দুঃখ জনিত কারণে মনে নানারূপ ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ অপমান, তিরস্কার, নিন্দা এই সকল মনের মধ্যে আঘাত করবে এবং এই সকলকিছু আঘাত খাওয়ার পরও তুমি যদি গুরূপদিষ্ট পথে সাধনা করে যাও এবং গুরুর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভক্তি, আন্তরিকতা রাখতে পার, তাহলে তুমি সাধনায় উন্নীত হবে। আর সাধনায় উন্নীত হলেই তুমি আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করবে। আর সেই তখনই তোমার পৃথিবী জয় সম্ভব হবে, অর্থাৎ তখন তোমার জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি, মূলাধারগ্রন্থি ভেদ হবে। এরপর কুণ্ডলীনিশক্তি জাগ্রত হবে। তখন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, জরা-ব্যাধি এই সকলের মধ্যে থেকেও তুমি তাদের মধ্যে লিপ্ত হবে না অর্থাৎ কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়জনিত তোমার আসক্তি আসবে না যার ফলে কোনরূপ পাপ তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

**এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।**
**বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯**
**নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।**
**স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।৪০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কর্ম ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে, তাই আত্মকর্ম বা ক্রিয়া ঠিক মত বা বিধিপূর্বক করলে কোনরূপ আসক্তিতে মন নিবদ্ধ হয় না। বহির্জগতের কাজ যত করবে মন তত আসক্তিতে নিবদ্ধ হবে। সেই বন্ধন হতে জীব মুক্ত হতে পারে না, যতই এক বন্ধন হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে অপর একটি বন্ধন এসে তাকে আবার চেপে ধরে। তাই আত্মজ্ঞান বিষয়ে কার্য্য করে চল, যা তোমাকে আসক্তির বন্ধন হতে মুক্ত করবে এবং আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটাবে। তাই ত্যাগী হও। তোমার সকল কার্য্য তুমি তোমার শ্রীগুরুর চরণ তলে অর্পণ কর। দুঃখ, শোক, তাপ, মন, বুদ্ধি শ্রীগুরুর চরণ তলে অর্পণ করবে, এর ফলে তখন আর তোমার কোনরূপ বন্ধন থাকবে না। তখন তোমার বিফলতা- তাঁর বিফলতা । তোমার সফলতা-তাঁর সফলতা। তোমার সুখ-তাঁর সুখ। তোমার দুঃখ- তাঁর দুঃখ। তখন তুমি মুক্ত। তখন তোমার কোন বিষয়ে

আসক্তি নেই। তখন তুমি বন্ধনমুক্ত। তখন তুমি মৃত্যুকে চিনতে বা জানতে পারবে। মৃত্যুকে যখন তুমি চিনতে ও জানতে পারবে এবং মৃত্যুর পর কোথায় যাবে তাও যখন বুঝতে পারবে এবং মৃত্যুর সময় যে রূপ স্থিরাবস্থা হয় সেইরূপ স্থিরাবস্থা জীবিতাবস্থায় যখন তোমার হবে, তখন তোমার আর মৃত্যুভয় থাকবে না। মৃত্যুভয়ই জীবদেহের প্রধান ভয়। মৃত্যুভয় না থাকলে সাধকের আর কোন ভয়ই আসবে না। তাই মৃত্যুকে যতক্ষণ না চিনছ-জানছ ততক্ষণ এই ভয় থেকে যায়। তাই অনেকে বলে- আমি মরতে ভয় পাই না। এই সব কথার কথা মাত্র। সাধক সাধন করে আগে নিজেকে চেনো, আগে নিজেকে জানো, নিজেকে ভালবাস। তবেই তুমি মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর এই একমাত্র আত্মক্রিয়াই তোমাকে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করাবে এবং মৃত্যুকে চিনলে মৃত্যুভয় দূরে পালাবে।

**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।**
**বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।৪১**
**যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।**
**বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।৪২**
**কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।**
**ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।৪৩**
**ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।**
**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সাধকের সাধনা সদাসর্বদা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া উচিৎ অর্থাৎ কোনরূপ কাজ করে তার জন্য ফলের আশা করা সাধকের কখনই উচিত নয়। তাই ফলের আশা না করে ক্রিয়া করে যাও, ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী, তাই দেহের ইন্দ্রিয়গুলি এতে বাধা দেবার চেষ্টা করবেই এবং মনের মধ্যে নানাপ্রকার কুচিন্তা বা কুভাব নিয়ে আসার চেষ্টা করবে, তাই ক্রিয়া করে যাও এতে ভয় পেও না, এই দমন কার্য্য করতে করতে এক সময় না এক সময় ইন্দ্রিয়েরা পরাস্ত হবেই এবং তুমি মুক্ত হবে। তাই ফলাকাঙ্খার সহিত যুক্ত হয়ো না, এরা

মনের কামনা বাসনাকে বৃদ্ধি করে মাত্র, কিছু মাত্র হ্রাস করে না। এরা বহুবিধ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মনকে নাচিয়ে বেড়ায়।

আমরা অর্থাৎ সাধক সাধিকারা শুনে থাকি সাধনা করতে হলে প্রচুর প্রাণায়াম করতে হয়। কিন্তু বিধিপূর্বক না হলে ২০৭৩৬টা প্রাণায়াম করেও সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, আবার ৪৮টা, কারও কারও ৬০টা করবার পর হতে ঘুমের আবেশ চলে আসে এবং এরপর ঘুম থেকে উঠে ভাবে, বাঃ অনেকক্ষণ সমাধি অবস্থায় ছিলাম অর্থাৎ আমি কি হনু, এতে লেজ না থাকলেও বাঁদরের ন্যায় আমাদের মন আমি-আমার বোধে শুধু লম্ফঝম্প করে মাত্র। সত্যিকারের সমাধি হলে মনের এইরূপ ভাবই আসে না। দেওঘরের বাবার গীতায় লিখিত আছে উত্তমরূপে প্রাণায়াম করলে ১২টি প্রাণায়ামে প্রত্যাহার অর্থাৎ একাগ্রতার জন্ম নেয়, ১৪৪টি প্রাণায়ামে ধারণার অবস্থা হয়। অর্থাৎ স্থিরত্বা কি তা বোধগম্য হয়। ১৭২৮টি প্রাণায়াম করলে ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাহ্যচিন্তা থাকে না। আর ২০৭৩৬ টা প্রাণায়াম করলে সমাধি অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়।

বর্তমানে আমাদের মনের ভাব পূর্বের চেয়ে বহু পরিবর্তন হয়েছে। পুর্ব্বের ন্যায় আমাদের মনের মধ্যে ভক্তি ভাব, ক্রিয়া করবার জন্য একাগ্রতা, আন্তরিকতা এই সকলই লোপ পেয়েছে। তাই ২০৭৩৬ টা প্রাণায়াম করবার মতন ধৈর্য্য কারোর নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষ হল মুনি, ঋষি সেবিত দেশ, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষদের উত্থান বলতে গেলে এই ভারতবর্ষে। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পড়ে দেশটাকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড বানাতে চেষ্টা করতে গিয়ে যন্ত্রের মত তারা নিজেরাও কামনা-বাসনা ও লালসাভরা যন্ত্র হয়ে পড়েছে। তাই আধ্যাত্মিক কথা বলতে গেলে তারা বিজ্ঞানের দোহাই দেয়, তারা ঈশ্বরকে মানে না,ঈশ্বর সেখানে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বস্তু মাত্র। যদি ঈশ্বর এত নিম্নই হবে তাহলে প্রাণ কি? তা কেন বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারল না। যদি বিজ্ঞানের এতই উন্নতি, তাহলে কেন মানুষকে মরতে হয়? কেন মৃত মানুষের দেহে পুনরায় বিজ্ঞান প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না? প্রতিটি

বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে। সেই সীমা কেউ কোনদিন পেরতে পারে না। কৃত্রিমভাবে যন্ত্রদিয়ে মনুষ্য দেহরূপী একটি রোবোটকে চালান যায় কিন্তু রক্ত মাংস দ্বারা সৃষ্টি করা এই দেহটিকে বোতাম টিপে চালনা করা যায় না। আত্মার কোন সীমা নেই, সে হল অনন্ত। মৃত্যু কি, তা তুমি আত্মক্রিয়ারূপী যোগসাধনার দ্বারা এই দেহে বসেই জীবিতাবস্থায় যোগক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হলে তাকে চিনে নিতে পারবে। তাই পার্থিব বস্তুর দিকে মন না দিয়ে নিজের বিষয়ে জানার চেষ্টা কর যে, তুমি কে? তুমি কোথা হতে এসেছ? আর তুমি কোথায় যাবে?

তাই বিধিপূর্বক দুভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে প্রতিটি চক্র স্মরণ করে যাও। বিধিপূর্বক ১২টি প্রাণায়াম যদি করতে পার তাহলেই তুমি ক্রিয়ার প্রতি একাগ্রচিত্ত হতে পার। আর এই বিধিপূর্বক ৪০০ বা ৬০০ বা এরপর যারা যতটুকু পারে তা করলেই যথেষ্ট। আর যদি তুমি এ জন্মেই সব কর্মফল থেকে মুক্ত হতে চাও তা হলে দেওঘরের বাবার গীতায় লিখিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী গুরুপ্রদত্ত এই ক্রিয়া করে চল।

**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।**
**নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কোন বিষয়ে আসক্তি হল সাধকের পরম শত্রু। সাধক সাধনার দ্বারা যখন স্থিরত্ব প্রাপ্তি হয় তখন সে তিনগুণ রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজো, তমঃ এই তিনগুণ বা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত বায়ুর ঊর্দ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করে। তখন কোন কিছু বস্তুর উপর আসক্তি তার আর আসে না। তখন সে আসক্তি শূন্য হয়ে ইন্দ্রিয়রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, গীতায় যাকে তিনগুণ রহিত বলা হয়েছে। তাই তার আর সুখ জনিত কারণে বা দুঃখ জনিত কারণে কোন প্রকার আনন্দ বা শোকের উদ্রেক হয় না। আজ্ঞাচক্রে বায়ু স্থির থাকায় পার্থিব বস্তুর জন্য কামনা বাসনা রূপ আকাঙ্খা বা কামনা আর মনের মধ্যে কোনরূপ রেখাপাত করতে পারে না।

**যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।**
**তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।৪৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমরা জানি পৃথিবীর এমন ভৌগোলিক অবস্থান, তাতে পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। জল অর্থাৎ জীবনের প্রতীক। আবার জীবন হল প্রাণ। আর প্রাণ হল ব্রহ্ম। তাই জল হল ব্রহ্ম।

মনুষ্য দেহও তেমনি তিনগুণ সম্পন্ন। এই তিনগুণের ন্যাস হলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করলে তখন একভাগ স্থলরূপ পৃথিবীরূপী কামনা-বাসনার নাশ হল। তখন ঐ জীবদেহ সম্পূর্ণ জলে পরিণত হল; অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হলেন। বেদ হল আমাদের এই আত্মক্রিয়া, তাই তাতে উত্তীর্ণ হলে তখন পুঁথি পড়ার কোন প্রয়োজন হয় না। তখন তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীই হল সকলের নিকট পুঁথির সমান। তখন তাঁর ব্যাপ্তি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তখন তাঁর ব্যাপ্তি হয় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। তখন তিনি ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হন। কারণ ব্রহ্মে বিচরণ করে যে, সেই হল ব্রাহ্মণ। কোন পৈতেধারী লোক ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহে। তাই 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'।

**কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।**
**মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূ র্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।।৪৭**
**যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।**
**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮**
**দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।**
**বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯**
**বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।**
**তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।।৫০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হবার জন্য নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কোন কামনারূপ আসক্তি মনের মধ্যে না এনে আত্মকর্ম করে চল, তার ফলেব আশা করবে না,তা কালে ফল প্রসব করবে এবং তুমি পরমাত্মায় বিলীন হবে। ইহা

চিরসত্য ঘটনা। যোগ কথার অর্থ হল যুক্ত থাকা অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত তখন তুমি যুক্ত হবে বা মিলিত হবে। তখন তোমার মধ্যে কোন আমি-আমার বোধ থাকবে না। ইন্দ্রিয়রা তখন শিথিল হবে, তাই ফলের আশা না করে কি হল, কি না হল,বা কি হবে,এই সকল চিন্তা মনের মধ্যে স্থান না দিয়ে ক্রিয়া করে চল। শ্রী গুরুদেব তোমার মধ্যে যখন ক্রিয়ারূপী বীজ রোপণ করেছেন তখন তা কালে ফল প্রসব করবেই, তাই এই সকল চিন্তা করে মন ভারাক্রান্ত করো না।

এটা সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা, তাই কি হল ,কি হবে এই সকল তোমার চিন্তা নয়, তাঁর চিন্তা। আপনাকে যখন আপনি,অর্থাৎ তুমি যখন নিজেকে জানতে পারবে তখন তুমি জ্ঞানী হবে, তখন তুমি স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হবে, তাই এই কর্মযোগের দ্বারা তুমি এগিয়ে চল। এর ফলে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি রূপ কর্মজনিত কারণে যে সকল পাপ ও পুণ্য তোমার আত্মার সহিত যুক্ত হয়েছে তা হতে তুমি অনায়াসে মুক্ত হতে পারবে। তাই এই পথই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির সর্বোৎকৃষ্ট পথ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন''যোগ কর্ম সুকৌশলম্''।

**কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।**
**জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১**
**যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।**
**তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।।৫২**
**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।**
**সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩**

**তাৎপর্য্যঃ**— গুরূপদেশ মত সাধনা করতে করতে উৎকৃষ্ট প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক-সাধিকা যখন স্থিরভাব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁরা প্রাণের সহিত মিলিত হন। এঁরাই সত্যিকারের জ্ঞানী। তখন ফলাকাঙ্ক্ষারূপ কোন চাহিদাই এঁদের মনের মধ্যে থাকে না, তার ফলে এঁদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং এঁদের আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

আমি-আমার বোধ হল সাধকের মোহরূপী শত্রু। যতদিন এই মোহ

থাকবে ততদিন সাধক মা, বাবা, স্ত্রী, পরিজন, বন্ধু, বান্ধব ইত্যাদির নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। তাই আত্মক্রিয়া ও নিরন্তর গুরু-স্মরণের মাধ্যমে তা কিছুটা দূর হয়ে থাকে। এইভাবে নিরন্তর চেষ্টা করতে করতে এক সময় তা দূরীভূত হয় এবং বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে। তখন চঞ্চল প্রাণরূপী শ্বাস স্থিরপ্রাণে রূপান্তরিত হয়। তখন সাধনাভ্যাস কালে সাধক ওঁকার ধ্বনি শুনতে পায়। এইভাবে যোগাভ্যাস করতে থাক এবং তাতে কি ভাবে উন্নতি করা যায় তা গুরুদেবের আদেশানুসারে করতে থাক।

**স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।**
**স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪**
**প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।**
**আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদ্যোচ্যতে।।৫৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের এই দেহটিকে চালনা করছেন কূটস্থ-চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আমাদের দেহে দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানে থেকে প্রাণবায়ু-রূপী শ্বাসকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করান এবং আবার বহিরাগমন করান অর্থাৎ তাঁর অসীম করুণার দ্বারা আমাদের দুই নাসিকা দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এর ফলে নানাপ্রকার কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্ম জনিত কারণে দেহের মধ্যে নানারকম পাপ পুণ্যের উদয় হয়। যখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তিনি দেহের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ বায়ু চলাচল বন্ধ করে জীবের বিনাশ করেন অর্থাৎ জীবদেহকে শব দেহেতে রূপান্তরিত করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যেতে পারে যে স্থিরবায়ুরূপী প্রাণ শক্তির দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাস জীবদেহে সাধিত হয়ে থাকে অর্থাৎ স্থিরবায়ুরূপী এই প্রাণশক্তি শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী বায়ুকে বহন করে বেড়ায়। সাধক সাধনা করতে করতে যখন তার শ্বাস কণ্ঠ থেকে ভ্রূর মধ্যে স্থিতিলাভ করে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী বায়ু বন্ধ হয়ে যায় এবং তা স্থিরে রূপান্তরিত হয়। তাই ক্রিয়া করে চল, শ্বাসের গতিকে উল্টা করতেই হবে, স্থির আমায় হতেই হবে, ইন্দ্রিয় সুখ জনিত রিপুদের দমন করতেই হবে— এইরূপ মনোভাব নিয়ে জেদের সহিত

ক্রিয়া করে চল। এইরূপ ভাবে স্থিরাবস্থায় থেকে ক্রিয়া করতে থাকলে তুমি, 'আমি-আমার' বোধ শূন্য হবে। তখন অহংকার জনিত কারণে মনের যে গতি প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, তা আর হবে না। তখন স্থির হয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়, তার ফলে সমাধি ভাব আসতে পারে। সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখন সাধক আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে যায়, তখন কামনা-বাসনারূপী মোহ তাকে গ্রাস করতে পারে না, এরফলে পরমাত্মায় তার স্থিতি হওয়ায় অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানারূপ জ্ঞান আহরণ করায় তিনি সকল কিছুর উর্দ্ধে উঠে গেছেন, তাই নানারকম কাজকর্ম করেও তিনি কর্মের সহিত লিপ্ত নন। এইরূপ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়ে থাকে।

**দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।**
**বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬**
**যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।**
**নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭**
**যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।**
**ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮**

তাৎপর্য্যঃ— প্রাচীন এই ক্রিয়া মুনি-ঋষি সেবিত। তাই যত সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই ক্রিয়া করেছেন। মুনি কথার অর্থ হল যার মন সর্বদা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত অর্থাৎ যিনি সর্বদা ব্রহ্মে বিচরণ করেন তিনিই মুনি। এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছা—অনিচ্ছা থাকে না। এমন কি কথা কইবার ইচ্ছা পর্যন্তও থাকে না। এইরূপ অবস্থা হলে সাধকের সুখজনিত কারণে হর্ষ বা দুঃখজনিত কারণে শোকের কোনরূপ উদ্রেক হয় না অর্থাৎ তিনি তখন সুখ ও দুঃখকে সমজ্ঞান করেন, তখন তিনি আসক্তি শূন্য, ভয় শূন্য, ক্রোধ শূন্য হয়ে, স্থিতধী রূপে পরিণত হন। যিনি স্থিতধী হন তাঁর কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকার দরুণ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করবার ফলে ইন্দ্রিয়রা তাঁর আদেশ মেনে চলে। এরফলে তাঁরা সকল বিষয়ে লিপ্ত থেকেও লিপ্ত থাকেন না। যেমন হাতির খাওয়ার দাঁত ও দেখানোর দাঁত আলাদা।

**বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।**
**রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।৫৯**
**যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।**
**ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০**

**তাৎপর্য্যঃ**— সাধক আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করলে আত্মার সহিত মিলিত হতে পারবে, এ কথা চির সত্য। এইরকম স্থিতি হলে সাধকের কোনরূপ কথা কইবার ইচ্ছা থাকে না, কোনরূপ আসক্তি থাকে না। কিন্তু এমন অনেক সাধক আছেন, যাঁদের কথা কইবার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু কথা কইতে পারেন না। আবার ভোগশক্তি বা ইন্দ্রিয় সকল ভোগ করবার আসক্তি তাদের মধ্যে প্রবল, যা মনোমধ্যে গুপ্ত অবস্থায় থাকে আর ওপরে দেখায় আমার কোন কিছুতেই আসক্তি নেই, এইরূপ সাধকের মনের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করবার প্রবল আসক্তি থাকে, ফলে তাঁরা আত্মাকে দেখতে পায় না। আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আপনা থেকে মনের মধ্যকার আসক্তি দূর হয়ে যায়; কথা বলবার কোন ইচ্ছাই থাকবে না, সর্বদা আত্মজ্যোতি দর্শন হওয়ায় ওঁকাররূপী ধ্বনি সর্বদাই ধ্বনিত হতে থাকে, ফলে দর্শন বা শ্রবণে বাহ্য চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে থাকে না।

তাই জোর করে বলপূর্বক মনকে সাধন পথে সাধনাভ্যাসকালে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে ধরে রাখা উচিত। সাধন পথে চলবার আগে নিজের মনকে তৈরী করে নাও এবং সাধনায় যত্নশীল হও। গুরুর প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সব আসবে। মনের পরিবর্তন হবে। তাই বিপদের সময় বা মনে কুচিন্তা এলে, কুভাব এলে তাঁকে স্মরণ কর, তিনিই তোমায় রক্ষা করবেন।

**তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।**
**বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১**
**ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।**
**সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২**
**ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।**

**স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।৬৩**
**রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।**
**আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪**

তাৎপর্য্যঃ— সাধক ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ বশে করবার পর তার মনের মধ্যে আর আমি-আমার ভাব থাকে না। তখন সে সদাসর্বদা আত্মক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে সদাসর্বদা আকাশে আসন পেতে আত্মনারায়ণের ধ্যানরূপ সাধন করে, আত্মনারায়ণকে প্রসন্ন করলে, তিনি তাঁকে কাছে টেনে নেন। তখন সাধক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হল অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মার সহিত যুক্ত হল। এই ভাবে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে যিনি যুক্ত হতে পারেন তিনিই হলেন যোগী।

আমাদের মন সদাসর্বদা চঞ্চল, সেইরূপ যুক্ত অবস্থা লাভ করবার মত আশা আমাদের মনে আছে কিন্তু তা পাবার উদ্দেশ্যে যে কর্ম করতে হয় তা করতেই আমাদের যত গাফিলতি। বহির্জগতের নানারূপ মনোমোহিনীরূপ বিনোদন আমাদের মনকে সর্বদা আকৃষ্ট করে, কিন্তু তবুও আমরা সেই মনোমোহিনীরূপে আকৃষ্ট হয়ে থাকতে চাই, নিজের আশা পূরণ করতে চাই অর্থাৎ মোহিনীরূপে আবদ্ধ থেকে মুক্তি পেতে চাই। এটা শুধু আমরা মুখেই বলি, "আমার সকল বন্ধন হতে মুক্তি দাও, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও..." ইত্যাদি। আরও অনেক কিছু বড় বড় বুলি আমরা মুখে আওড়াই, কিন্তু সেই মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কাজ করতে হয় তা আমরা করি না। গুরুদেবের নিকট বসে তাঁর নিকট এই সমস্ত ভক্তি মূলক কথা বলে তাঁর কাছে একটু বড় হওয়ার চেষ্টা করি মাত্র, কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে ছেড়ে আমি আমার নিজ গৃহে প্রবেশ করি তখন সেই কথা ভুলে যাই। তখন শুধু ভাবি কোনটা আমার, কোনটা ওর, ও আমার জন্য করল না, ও আমাকে দিল না, এইরূপ আরও কত কি! তখন আর জীব থেকে শিবে রূপান্তরিত হতে চাই না। তখন জীবদেহের জিভই আমাদের বেশী নড়াচড়া করে অর্থাৎ নিজের রাজ্যে কুকুরও সিংহে পরিণত হয়। তারফলে ক্রোধের উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কামনা বাসনারূপী মনোমুগ্ধকর

বস্তু না পেলে বা পেতে বিলম্ব ঘটলে ক্রোধে সিংহের মত হুংকার ছাড়ি। তখন ঐ পার্থিব বস্তু পাবার জন্য, যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে, সেই লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে বুদ্ধি নাশ হয়, তখন অহংজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে, কোনরকম হিতাহিত বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের যদি কোন জীবদেহ নাশ করতে হয় তাতেও পিছুপা হই না। আর না পেলে তার বিরহ বেদনায় আমরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করি। তাই ক্রোধ সাধকের মহা শত্রু যা মন, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, বড়-ছোট, সম্মান, ভালোবাসা এ সব কিছু সে ভুলে গিয়ে নিজের লক্ষ্যকে পেতে চায়। এই ভাব পার্থিব বস্তুর প্রতি না এনে, যা মুক্তি দায়ক, যা শান্তি দায়ক, যেখানে কোন বাধাবিঘ্ন নেই, যেখানে কোন মায়ার বন্ধন নেই, যেখানে আছে শুধু আনন্দ — সেই আত্মধর্মরূপ যোগক্রিয়া করে তা হতে কি করে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেইরূপ চেষ্টা জনিত ভাব আনা দরকার। যিনি এই কার্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি সদাসর্বদা স্থির, তিনি ক্রোধহীন ব্যক্তি। একজন স্থিরপ্রাণ একজন চঞ্চলপ্রাণকে নানারূপ ভাবে নাচাতে পারেন কিন্তু নিজে স্থির থাকেন। তিনি সকল কার্য্য করেও তার সহিত লিপ্ত নন। তিনি কপট রাগ, কপট তিরস্কার ইত্যাদি করেন সকলকে শিক্ষা দেবার জন্য, কিন্তু তিনি নিজে সম্পূর্ণ রাগদ্বেষহীন। কোনরূপ পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁর চাহিদা নেই। তিনি সেই সকল পার্থিব বস্তুর সহিত জীবন নির্বাহ করেন মাত্র, কিন্তু তার সহিত তিনি যুক্ত নন। তাঁর ভোগবিলাস শুধু একটির জন্য— পরমাত্মাকে দেখে, তাঁর সহিত যুক্ত থেকে, স্থির হয়ে সকল কর্ম করেও, তাতে লিপ্ত না হয়ে— শান্তি লাভ করেন।

**প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।**
**প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।।৬৫**
**নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।**
**ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মায় স্থির থাকলে মনের মধ্যেকার সকল দুঃখের নাশ হয়। যতক্ষণ দুঃখ, অভাব বা না পাওয়ার জ্বালা মনের মধ্যে আঘাত করে,

ততক্ষণ মনে একটাই লক্ষ্য থাকে। আর কর্ম করে যখন ফল লাভ হয় তখন মনে প্রসন্নতার সৃষ্টি হয়, তখন মন আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়।

নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু ধরতে যাওয়া ভুল। যেমন ধর, তুমি ক্রিয়া করছ, হয়ত তুমি ক্রিয়া করতে গিয়ে কোন কিছুর দর্শন পেলে; তা মিলিয়ে যাবার পর মন তার কারণ অনুসন্ধান করে, এটা কি? এর মানে কি? —ইত্যাদি নিজের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে নানারূপ মানের সৃষ্টি করে, আর তখনই তার মনের মধ্যে অহং জ্ঞানের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সাধকের ধ্যানের বিঘ্ন ঘটে এবং সে চঞ্চলতার ফেরে পড়ে, নিজের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে, তখন স্থিরভাবরূপী শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই সাধক! সাধনাভ্যাস কালে যা আসছে তাকে আসতে দাও, যা দেখছ তা দেখে মনে অশান্তির সৃষ্টি কর না; তার উপর দৃষ্টি না দিয়ে ক্রিয়া করে চল।

**ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।**
**তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।৬৭**

**তাৎপর্য্যঃ**— সাধকের দেহ হল একটি নৌকা। ইন্দ্রিয় সকল হল দাঁড়, আর মন হল কান্ডারী। অর্থাৎ দেহ আমি থেকে বা ক্ষুদ্র আমি থেকে 'আমার-আমিতে' মিলাতে গেলে বা বৃহৎ আমিতে মেলাতে গেলে এই ভবসাগররূপী সমুদ্র পার হতে গেলে এই দেহরূপ নৌকাটার দরকার, যার উপর তুমি বাস করছ অর্থাৎ এই নৌকায় তুমি একটি যাত্রী মাত্র আর ইন্দ্রিয়রূপী রিপুসকল সর্বদা তোমায় চালনা করে। তাই এরা হল আমাদের দেহ তরণীর দাঁড় আর মন যে সদাসর্বদা এই ইন্দ্রিয়গুলি চালনা করে, সে ঐ নৌকার মাঝি বা কাণ্ডারী। তাই সেই মনরূপী মাঝিকে তার পথের দিশা জানতে হয়। দিক না জানলে সে নৌকা নিয়ে যাবে কোন দিকে? বর্তমানে জাহাজে নানারূপ যন্ত্র লাগান থাকে যার সাহায্যে তাদের কোনদিকে যেতে হবে, তা ঠিক করা যায়। যখন এই সকল যন্ত্রের উৎপত্তি হয়নি, তখন পথিকরা দিক নির্ণয় করত উত্তরাকাশে অবস্থিত ধ্রুবতারার মাধ্যমে। যোগীরা দুই ভ্রূর মাঝখানে সাদা অথবা পীত বর্ণের জ্যোতির মধ্যে কালো অথবা নীল বর্ণের যে গোলক, তার মধ্যবর্তী

স্থানে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র সদা সর্বদা চিক্‌চিক্ করে তা পরিলক্ষিত করে, তাঁকে ধ্রুবতারা বলেছেন। তাই দেহরূপ তরণীতে বসে ইন্দ্রিয়রূপ দাঁড়ের সাহায্যে মনরূপ কাণ্ডারী ঐ নক্ষত্র দেখে তার দিক স্থির করে এগিয়ে চল অর্থাৎ মন যদি সেইদিকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তার সহিত যুক্ত হতে চায় তখন ইন্দ্রিয় সকল তার কিছুই করতে পারে না। সেই দেহরূপ তরণী তখন সেইদিকেই ধাবিত হয়।

**তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।**
**ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮**
**যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।**
**যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের মনের মধ্যেকার ভোগ জনিত অভিলাষ হতে নিষ্কৃতি পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইন্দ্রিয় কার্য্যে লিপ্ত থাকে। ভোগের আশা ত্যাগ করেছি এইরূপ বললেই ভোগবিলাস ত্যাগ হয় না। মনের মধ্য হতে তা যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই মোহের বন্ধনে আট্‌কে স্থির ও অস্থিরের মধ্যে বাদুড়ের ন্যায় ঝুলতে হয়। মন যখন এই সকল অবস্থা- রহিত হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে আশা আকাঙ্খা, যা অবশ্যই ভোগজনিত, তা কোনরূপ রেখাপাত করে না। তখন সাধক জ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অজ্ঞানতা হল চঞ্চল প্রাণ, তাই মনের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত চঞ্চলতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যাতায়াত থাকবে, এই অবস্থায় ক্রিয়া করলে মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হয়, যা হল ইন্দ্রিয়জনিত। তার ফলে চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া কোন আশার আলো দেখা যায় না। যতই সে এইসকল পার্থিব বিষয় চিন্তা করে ততই সে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। চঞ্চল মন, সে কখনই অল্পে তৃপ্ত হয় না। সর্বদাই তার চাইবার ক্ষুধা লেগে আছে। যতই তুমি দাও ততই তার ক্ষুধা বাড়ে, তাই এমন এক সময় আসে যখন ঈশ্বরপ্রাপ্তি মরীচিকার মত মনে হয়। তখন সে দূরে মরুদ্যান দেখতে পায় এবং সেইখানে ছুটে যেতে গেলে কামনা-বাসনারূপ মরীচিকা সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং মরুদ্যান আরও

দূরে চলে যায় অর্থাৎ তুমি শ্রীগুরুর নিকট পার্থিব উন্নতি যত কামনা করবে আধ্যাত্মিক উন্নতি তত দূরে চলে যাবে। সুতরাং যার মধ্যে তুমি রয়েছ সে তোমায় সাময়িক সুখ দেবে, সাময়িক শান্তি দেবে, দেবে সাময়িক তৃপ্তি; যা হল সদাসর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভবিষ্যতে তার পরিণতি সুখকর নয়, এর জন্য তোমায় নানারূপ দুঃখ, কষ্ট ও ব্যথা পেতে হবে, তাই এমন জিনিসের বাসনা কর যা সদাসর্বদা আলোকোজ্বল, যার মধ্যে কোন অজ্ঞানতা নেই, অর্থাৎ যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, যেখানে নিদ্রা কাবু করতে পারে না, যা চির জাগরূক, যা জিহ্বার স্পন্দন রহিত, অর্থাৎ যা ভাষায় প্রকাশ বা ব্যক্ত করা যায় না, যেখানে নেই কোন দুঃখ, কোন শোক, কোন ব্যথা।

**আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং**
**সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।**
**তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে**
**স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০**
**বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।**
**নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১**
**এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।**
**স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।।৭২**

**ইতি সাংখ্যযোগ।**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের মন সদাসর্বদা চঞ্চল, তাই সে সদাসর্বদা নেচে বেড়ায়। নদীতে বান এলে যেমন উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, মনও সেইরূপ। সে কোন বাধা মানে না। সে ভাল মন্দ সকল প্রকারেই আছে। নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেই তটের নিকট সমুদ্রও উত্তাল তরঙ্গায়িত কিন্তু মধ্য সমুদ্র প্রশান্ত, স্থির। তাই মনকে চঞ্চল থেকে স্থিরে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। তখন কামনা-বাসনার নাশ হবে এবং জীব পরাশান্তি লাভ করবে। তখন কর্মের মধ্যে থেকেও সে কর্মের সহিত লিপ্ত হবে না। কোন অহংকার তার মধ্যে থাকবে না, কারণ তিনি সকল কিছু ভোগ করেন, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে। তিনি

সদাসর্বদা শান্ত থাকেন এবং তিনি জ্ঞানী হন ও মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত প্রতিচক্রের সহিত তিনি যুক্ত থাকেন। তাকেই গীতায় হংসপদরূপ বিচরণ বলেছেন। তাই কর্ম করে তাঁতে স্থিতিপ্রাপ্ত হও। তুমি এক সময় না একসময় মরে যাবেই। আজ তুমি জীবিত আছ, কাল তুমি নাও থাকতে পার। যেখানে তোমার জীবন অনিশ্চিত সেখানে শুধু শুধু নিজের কর্ম্মের গতি যা চঞ্চল, যা দুঃখকর তা বৃদ্ধি করছ কেন? যে কামনাবাসনারূপী কর্ম্মফল তুমি সৃষ্টি করবে, মৃত্যুর পর সেই কর্মসূত্র ধরেই তোমাকে এখানে আসতে হবে। তা হলে ভোগাসক্তি জনিত ইন্দ্রিয়সুখকর্মে নিযুক্ত হয়ে লাভ কি? ঈশ্বর চিন্তার মাধ্যমে বা আত্মক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কামনা-বাসনারূপী ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করে স্থির হও। কালকের জন্য কিছু ফেলে রেখ না। যা করবার তা আজই করতে হবে, এই ভাব পোষণ কর। সব কিছু বস্তু যা হাতে গোনা যায় তার ভাগ সকলে নেবে, তোমার মৃত্যুর পর, তোমার উত্তরাধিকারসূত্রে অংশীদারগণ তা গ্রহণ করবে। কিন্তু দেহরূপী ক্ষেত কর্ষণ করে তুমি যে ফল উৎপাদন করবে, তার ভাগ কেউ নিতে পারবে না। তা সম্পূর্ণ তোমার নিজের। তাই সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে, আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে, পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সহস্রার ভেদ করে, মৃত্যুকে চিনে, পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মে বিচরণ করে ব্রাহ্মণ হও।

**।। ইতি সাংখ্যযোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

## কর্ম্মযোগ

**জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।**
**তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১**

**তাৎপর্য্যঃ—** মনুষ্যদেহ মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণ হিসাবে থাকে, তখন তার সঙ্গে জীবাত্মার কোন সম্পর্ক থাকে না। সে তখন পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন সে মাতৃগর্ভে থাকে তখন তাকে যোগী বলা যেতে পারে এবং তার জিভ ওল্টানো থাকে, ফলে দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে শ্বাস আর প্রবাহিত হয় না, তখন সে স্থিরাবস্থায় থাকে।

ভূমিষ্ঠ হবার পর হতে যখন প্রাণবায়ু দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল তখনই সে কর্মে নিযুক্ত হল আর এই কর্ম্মে নিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার কবলে জড়িয়ে পড়ল— এরফলে ভাল ও মন্দ দুরকম কাজ করতে থাকল। যখন মস্তিষ্ক সচল অবস্থা প্রাপ্ত হল তখনই মনের সৃষ্টি হল এবং তখনই তার মধ্যে মমতা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, হিংসা, অহংকার, কৌটিল্য, ক্রোধ ইত্যাদির জন্ম নিল এবং দেহের বৃদ্ধি হবার সাথে সাথে এগুলোরও বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এই সকল ইন্দ্রিয়গুলি মনের মধ্যে নানাভাবে খোঁচা দিয়ে তার নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য ঐ দেহ দিয়ে করিয়ে নিতে থাকল। এরফলে তার ভোগ করার আকাঙ্খা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকল, এরফলে এই যাতায়াতরূপী আবর্তিত শৃঙ্খলের বন্ধনে আটকে পড়ল। এই বন্ধন থেকে, মুক্তি পেতে হলে পূর্বাবস্থা লাভ করতে হবে অর্থাৎ যেরূপ তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, সেই অবস্থা লাভ করতে হবে। অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মেশাতে হবে এবং জন্মরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে। অতএব মাতৃগর্ভে যেমন স্থিরপ্রাণ ছিলাম সেইরূপ স্থির হতে হবে। তাই জীবের উচিৎ যোগক্রিয়ারূপ কর্ম করে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। জ্ঞানীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে সেই অবস্থা প্রাপ্ত

হওয়া যায়। তাই দেহক্ষেতরূপী সাধনক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়।

**ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।**
**তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্লুয়াম্।।২**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক-সাধিকাগণের উপরিউক্ত কথা শুনে মনে হতে পারে যে এখানে দুরকম কথা বলা হয়েছে; এক হল আত্মকর্ম করে স্থির হওয়া আর দ্বিতীয়টি হল জ্ঞানার্জন করে স্থির হওয়া। এই উভয়ের মধ্যে গন্ডী রচনা করে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে হয়ত তোমরা বলতে পার, কোন পথ অবলম্বন করব?

**লোকে২স্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।**
**জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।।৩**
**ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।**
**ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** কোন কাজ করবার পূর্বে সাধক-সাধিকার মনের মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে কোন পথ আগে অবলম্বন করব। তা জেনে নেওয়া প্রত্যেক সাধক-সাধিকার একান্ত দরকার।

কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দুই একত্রে ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ সাধক যখন সাধনা শুরু করেন তখন তিনি কর্ম্মযোগের মধ্যে আবদ্ধ হলেন। এইভাবে সাধনা করতে করতে যখন তিনি আজ্ঞাচক্রে স্থিতি প্রাপ্ত হন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে ভ্রূর মধ্যে শ্বাস চলাচল করে এবং আজ্ঞাচক্রে স্থির হয়ে আত্মাকে দর্শন করেন। আত্মাকে দর্শন করলেই আত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া বা মুক্তি প্রাপ্তি বোঝায় না। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়রা শিথিল হয়, কিন্তু মরে না। আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ার পর আরো ঊর্দ্ধে ঐ স্থির প্রাণ গমন করলে যখন 'আমি-আমার' বোধ বা মোহ অথবা দেহ সম্বন্ধীয় কোন সুখ ভোগ করতে আর ইচ্ছা করে না। তখন সাধকের যে অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তা জ্ঞানীর অবস্থা। ঐ অবস্থায় বসে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাধনাভ্যাস করাই হল জ্ঞান যোগ। তাই সাধক! কাজ একটাই, তার মধ্যে

ভাগাভাগি কর না। যা করতে বলা হয়েছে তা জ্ঞানীর বা শ্রী গুরুদেবের আদেশ মত করে চল।

যোগক্রিয়ারূপী কর্মে নিযুক্ত না থেকে বা ইন্দ্রিয়দমনরূপী কর্মে নিযুক্ত না থেকে, গেরুয়া বসন ধারণ করে মাথা নেড়া করে, মুখে হরি হরি নাম করে বেড়ালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কর্মে আসক্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়দমনরূপী কার্য্যে নিযুক্ত থাকলে তা হতে ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় বা সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সংসারী ব্যক্তিরাও যদি এইভাবে আত্মক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, তা হলে গেরুয়া বসন ধারণ, মাথা নেড়া বা মুখে হরি হরি নাম না করলেও সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

**ন হি কশ্চিৎ ক্ষণ মপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।**
**কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫**
**কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।**
**ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধকের সাধনারূপী কর্ম না করলে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। সারাজীবন এই যাতায়াতরূপী আবর্তনের বন্ধনে আটকে থাকতে হয়। জীবদেহ প্রকৃতির নিয়মে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকৃতির নিয়মেই ইন্দ্রিয়গুলি বেড়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা এই দেহ চালিত হয় আর এই ইন্দ্রিয়গুলি চালিত হয় দেহস্থিত বায়ুরূপী প্রকৃতির দ্বারা এবং এই প্রকৃতি হতে অহংজ্ঞান সম্পন্ন মনের সৃষ্টি হয়েছে। মন কখনও সাধককে আত্মকর্ম করতে দেয় না, সে সর্বদা বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে মন আমাদের দেহকে যেরূপ নাচায় আমরা সেরূপ নাচি। ভুলেও একবার দেখিনা এই পুঁজি শেষ হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসবে না; এই সকল না ভেবে আমরা চঞ্চল মনের বশবর্তী হয়ে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ লাভের কাজে লিপ্ত হই, যতই লিপ্ত হই ততই জড়িয়ে পড়ি, যতই আপন করি, ভালবাসি ততই ধাক্কা খাই ও তিরস্কার পাই, কিন্তু তবুও আমাদের মন ঘোরে না। এত তিরস্কার, এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ,

শোক সহ্য করেও আমরা আবার সেই ধাক্কা খাওয়ার জন্য পুনরায় গাল বাড়িয়ে দিই। এরপর প্রকৃতির নিয়মে দেহটা ধীরে ধীরে বার্ধক্যে এসে দাঁড়ায়, আর প্রাণবায়ু নাভিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে গেলে দেহটা শবদেহে পরিণত হয়। মৃত্যু হলেই ভেব না, সকল দুঃখ, শোক, ব্যথা বা ভোগের জ্বালা থেকে মুক্তি পেলে; আত্মকর্মে লিপ্ত না হলে জীবদেহের যাতায়াতরূপী এই বন্ধন কখনও বন্ধ হবে না; এই ভোগজনিত কর্ম করার জন্য এবং আসক্তিশূন্য না হওয়ার জন্য তার ভোগজনিত কর্মবন্ধন ঘোচে না, তা আত্মার সহিত আটকে যায় এবং এরপর তোমার আবার জন্ম হয়। এর ফলে তুমি পূর্বজন্মে যে সকল আসক্তিতে লিপ্ত ছিলে বর্তমান জন্মে তোমার সেই সকল আসক্তিরূপ বাসনা পূরণ হবে আর বর্তমান জন্মে আসক্তিরূপ বাসনা যে সকল তুমি করছ তা ভবিষ্যতে পূরণ হবে। আর এই বাসনা পূরণ করতে করতে যদি তোমার মৃত্যু হয় তা হলে আবার জন্মাতে হবে, ফলে মায়া-মোহের ভুলভুলাইয়ার মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরতে থাকতে হবে। মুখে মুক্তি দাও এই বলে কেঁদে ভাসিয়ে ফেললেও মুক্তি পাওয়া যায় না।

যে সকল ব্যক্তি আত্মকর্মে নিযুক্ত হয়েছে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রতি তার কোন সংযম ক্ষমতা নেই, সে বাইরে দেখায় যে সে সব ইন্দ্রিয়গণকে দমন করবার উদ্দেশ্যে এই আত্মকর্ম করছে, কিন্তু মনে মনে নানারূপ ইন্দ্রিয়সুখকর চিন্তা করছে এবং নানারূপ কামিনীকাঞ্চনরূপী লাভের বাসনা ত্যাগ না করে তা পাবার জন্য মনের মধ্যে সদাসর্বদা চিন্তা পোষণ করছে এবং অপরকে বঞ্চনা করে বা কাউকে ফাঁদে ফেলে কি করে যশ বা অর্থ উপার্জন করা যায় সেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছে। এইরূপ সাধক মিথ্যাচারী বা ব্যভিচারী সাধক; এদের মুক্তি হয় না। বাইরে সন্ন্যাসী আর ভেতরে রাজা হবার ইচ্ছে থাকলে তার রাজাও হওয়া হয় না, আবার সন্ন্যাসীও হওয়া হয় না। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে প্রজা বা সৃজন অভিলাষী হয়েই থাকতে হয়।

**যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।**
**কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭**

**নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।**
**শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ।।৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধন পথে নামার সঙ্গে সঙ্গে সাধক আত্মক্রিয়ারূপ যোগকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ নিজের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে শুরু করলেন।

সাধনা করতে হয় এক মনে লক্ষ্য স্থির রেখে, আর লক্ষ্য হল তোমার সেই ধ্রুবতারা। আমরা দর্শনের সময় কালোমত যে গোলক দেখতে পাই তার মাঝখানে যে নক্ষত্র আছে তাকে ধ্রুবতারা বলে। তাই তাঁকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াই হল সাধকের লক্ষ্য। এইভাবে একাগ্রতার সঙ্গে ক্রিয়া করে চল। ক্রিয়া করতে করতে মন এক সময় না এক সময় স্থির হবেই আর মন স্থির হলে ইন্দ্রিয়দের উপর সংযম ক্ষমতা সাধকের দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে কোন কিছুর পরোয়া না করে আন্তরিকতার সাথে ও একাগ্রতার সঙ্গে চক্রে চক্রে স্মরণের দ্বারা তুমি যদি ক্রিয়া করে চল তাহলে এই কাজ বা এই আত্মকর্ম করতে করতে তোমার কর্মের অতীতাবস্থা লাভ হবে। তখন মন সংযত হয়, আর মন সংযত হলেই মনের মধ্যেকার ইন্দ্রিয়সকল সংযত হয়। তখন মনকে সংযত রেখে আত্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে পারলে, মনে ফলাকাঙ্খারূপ কোন চাহিদা থাকে না। ফলে অনাসক্তিরূপ ভাব উৎপন্ন হয় এবং সাধক সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতা অর্জন করে।

ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে গুরূপদেশ মত প্রত্যহ দুবেলা ক্রিয়া করে চল। দেখো, একবেলাও যেন ফাঁকি দেবার মনোভাব নিয়ে তাকে বন্ধ করে রেখো না; কারণ অজপারূপী শ্বাস- প্রশ্বাস বা প্রাণ-অপান বায়ু দুই নাসিকা হতে অবিরত বেড়িয়ে যাচ্ছে। তার গতিপথ উল্টো দিকে করতে হবে অর্থাৎ অন্তর্মুখীণ করতে হবে। ক্রিয়ারূপী এই আত্মকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে। প্রতিটি জীবদেহের উচিত এই ক্রিয়া করা, কারণ শ্বাস যদি দেহের অভ্যন্তরেই আটকে থাকে তাহলে জরা, রোগ, শোক, তাপ ইত্যাদি আমাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তা অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখে প্রবাহিত হতে

থাকবে ততদিন দেহের মধ্যে রোগ-ভোগ লেগেই থাকবে; তার নাশ হবে না। তাই সকল জীব দেহেরই উচিত নিজের এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণ-অপান বায়ুকে প্রাণায়ামরূপী যোগক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা।

**যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মেণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।**
**তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর।।৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মরূপ যজ্ঞের মাধ্যমে তুমি সকল কর্মবন্ধন হতে মুক্তি পাবে। যজ্ঞ বলতে এখানে আগুনের মধ্যে ঘি দেওয়া নয়। যজ্ঞ বলতে বোঝায়—' নাভিরূপী তেজস্তত্ত্ব হল অগ্নির প্রতীক, আর ঘৃতরূপী প্রাণবায়ু হল ব্রহ্ম অর্থাৎ নাভির পিছনের চক্রে প্রাণায়ামরূপী মন্ত্র ঠিকমত স্মরণ করলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। তখন আর কর্মে কোনরূপ আসক্তি থাকে না। আবার শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করলে আসক্তির নাশ হয় অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করলে আসক্তির নাশ হয়। আর আসক্তিশূন্য হয়ে ক্রিয়া করতে থাকলে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়। এরপরে এই স্থিরাবস্থায় বসে ক্রিয়া করতে পারলে সাধক উত্তীর্ণ হয়। তখনই বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করা হয়। বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করলে তিন কুল মুক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ছেড়ে সহস্রারে স্থিতিলাভ করে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার সহিত জীব মিশে যায়। এরপর তার আর জন্ম হয় না। তখন সে যাতায়াতরূপী এই আবর্তনের বন্ধন থেকে চিরমুক্তি ও চিরশান্তি ও চিরআনন্দ লাভ করে।।

**সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।**
**অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্ট কামধুক্।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক, সাধনা করতে করতে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি প্রাপ্ত হলে এবং সেই স্থিরাবস্থায় বসে বা আকাশে আসন পেতে বাণক্ষেপণ করতে থাক; এই রকমভাবে বাণক্ষেপণ করতে করতে এক সময় না এক সময় তোমার স্থিতি আজ্ঞাচক্র ছেড়ে আরও ওপরের দিকে উঠতে থাকে। তখন এমন অবস্থা হয় যে আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থিতিলাভ হলে একটি বিন্দু

দেখতে পাওয়া যায়,.তাকেই ব্রহ্মজ্যোতি বা ব্রহ্মা বলে। কারণ আমরা ঐ বিন্দু থেকেই সৃষ্টি হয়েছি এবং মৃত্যুর পর ঐ বিন্দুতেই লয়প্রাপ্ত হব। তাই সাধনাভ্যাস কালে ঐ বিন্দু ভেদ করে প্রাণরূপী শ্বাসকে স্থির করে ওর মধ্যে যদি প্রবেশ করনো যায় তা হলে সেটাই হল আসল মৈথুন ক্রিয়া। শিব লিঙ্গের রূপক রূপটি হল এই।

আবার মণিপুরে সেই ব্রহ্মজ্যোতি বিদ্যমান। আমরা দেখে থাকি অনেক জায়গায় নারায়ণের নাভির মূল থেকে একটি পদ্ম নির্গত হয়েছে এবং সেই পদ্মের রং লাল, তার উপরে ব্রহ্মা চতুর্মুখ নিয়ে বিরাজ করছেন। এর অর্থ নাভির পিছনে যে চক্র আছে বা পদ্ম আছে তা হল মণিপুর, তার রং হল লাল। তার উপর চতুর্মুখী ব্রহ্মা বিরাজ করছেন। চতুর্মুখ, কারণ চারটে বায়ু যথা প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান এদের উপর স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে ঐ বিন্দুতে বিচরণ করছেন। তাই যো- সো করে ক্রিয়া করে চল। আত্ম-মৈথুন করে তোমায় জ্ঞানরূপী পুত্রের জন্ম দিতে হবে, তবেই তুমি মুক্তি পাবে। দৈহিক মৈথুনের মাধ্যমে জন্ম মৃত্যুর যাতায়াত রূপ আবর্তনের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকতে হবে। সে বাঁধন জীবনেও কেউ আলগা করতে পারবে না। আত্মক্রিয়ার দ্বারা আসক্তির নাশ হলে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে।

**দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।**
**পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১**
**ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।**
**তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভূঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের দুই নাসিকা দিয়ে শ্বাস অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে বা বলা যায় ঈড়া ও পিঙ্গলা দিয়ে শ্বাস অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে। বাম নাসিকা ঈড়া ও ডান নাসিকা পিঙ্গলা; বাম নাসিকায় চন্দ্রের অবস্থান, ডান নাসিকায় সূর্য্যের অবস্থান। এই প্রাণকর্ম শুরু করতে হলে আমাদের শ্বাসকে অন্তর্মুখী করা উচিৎ, কারণ আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি নির্দিষ্ট শ্বাসের পুঁজি নিয়ে, যেদিন

খরচা হতে হতে এই পুঁজি শেষ হয়ে যাবে সেদিন আমরা আর জীবিত থাকব না। তখন আমাদের এই দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবে। তাই খরচা না করে তাকে যদি সঞ্চয় করা যায় তাহলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। এই শ্বাস যা ২১৬০০ বার আমাদের নাসিকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার মধ্যে কোন স্থিতি নেই অর্থাৎ শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তা নিজের অজ্ঞাতসারে ফেলে দিই, আমরা তা একবারও খেয়াল করি না যে কতবার আমাদের দেহ থেকে এই শ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বহির্মুখী শ্বাসকে অন্তর্মুখী করার নামই হল প্রাণায়াম। অনেকে ডান নাক টিপে শ্বাস টেনে আবার বাম নাক টিপে শ্বাস বের করে দেয়, এইরূপ ভাবে প্রাণায়াম করে থাকে। এইরূপ প্রাণায়াম করে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে, এতে ইন্দ্রিয়দমিত হয় না। শ্বাসকে অন্তর্মুখী করার মানে, যা এই দুই নাসিকা দিয়ে প্রবাহিত হবে না, যা সুষুম্না নাড়ীস্থিত নালীর মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। এটাই হল সঠিক প্রাণায়াম। এইরূপ প্রাণায়াম করতে হলে শ্বাসকে নাভিতে চাপ দিয়ে টেনে আবার নাভিতে চাপ দিয়ে ফেলতে হয়। সাধনাভ্যাস কালে এটা করবার সময় নাভিতে চাপ দিয়ে বায়ু টানতে টানতে প্রতি চক্রে মন্ত্র স্মরণ করা চাই তারপর আজ্ঞাচক্রে গিয়ে কিছুক্ষণ স্থিতি যা আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথায় দুই সেকেন্ড আবার নাভিতে চাপ দিয়ে শ্বাস ফেলবার সময় প্রতি চক্রে মন্ত্র স্মরণ করে মূলাধারে গিয়ে ঐ একই সময় স্থিতি বা কুম্ভক করতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রাণায়াম করলে ক্রিয়ার পরাবস্থায় একটি মঙ্গলময় শান্তি সাধক-সাধিকার প্রাপ্তি হয়। এইরূপ ভাবে প্রাণায়াম করে প্রতিচক্রে স্মরণ করে দুইভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি দিয়ে করতে থাকলে মনের মধ্যে কোনরূপ চিন্তার উদয় হয় না, ফলে প্রাণকর্ম সঠিকরূপে হয়; এটাই হল বিধিপূর্বক প্রাণায়াম।

এইরূপ ভাবে বিধিপূর্বক প্রাণায়াম করতে থাকলে, সাধকের স্থিরাবস্থা প্রাপ্তি হতে পারে। আর এই স্থিরাবস্থা প্রাপ্তি হলে সাধক ধীরে ধীরে স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রাণায়াম করবার কালে উপরে ও নীচে থামা অবশ্যই দরকার। দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা না দিলে সেই দীক্ষা বা উপদেশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়; এই উপরে নিচে স্থিতিই হল গুরুদক্ষিণা। এইরূপে প্রাণায়াম

করতে থাকলে একসময় না একসময় কর্মের অতীতাবস্থা লাভ হওয়ায় অহংকার বা আমি-আমার বোধ লোপ পাবে, তখন তিনি যাই করেন সবই ঈশ্বরের পায়ে নিবেদিত হয়।

**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।**
**ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩**
**অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।**
**যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।।১৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক সাধিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হল চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করা। যিনি ইহা লাভ করেন তিনি সকল পাপ হতে মুক্তি পান, বা তাঁর পাপ নাশ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়জাত কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রথমে আমাদের মনের মধ্যে এসে অবস্থান করে তারপর ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে সেই বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে কামনা-বাসনারূপী ইন্দ্রিয়ের বেড়াজালে আটকে পড়ে। তা সিদ্ধি করতে বা তা থেকে নিজের মনের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে এগিয়ে চলে। পুরুষ হন তিনিই, যিনি স্থিরে লয়প্রাপ্ত হন, বাকিরা সব প্রকৃতির অধীন অথাৎ তুমি পুরুষ বলে পুরুষ-প্রকৃতির অধীন ও তুমি নারী বলে নার-প্রকৃতির অধীন। বর্তমানে পরমার্থের চেয়ে হাতে গোনা অর্থের দিকেই মানুষের অধিক আগ্রহ, এর জন্য সে গুরুদ্রোহিতা করতেও পিছুপা হয় না। অর্থের লালসার বশবর্তী হয়ে অনেক ওজনদার পারিষদবর্গের বা তার অর্থের উপর ভাগ বসানোর জন্য, নিজের আখের গুছিয়ে নেবার জন্য, অনেকে নানারূপ উস্কানি দিয়ে তারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে ওঠে এবং গুরুদ্রোহিতা করে এবং গুরুকে নিচে নামিয়ে তাঁর আদেশকে দুপায়ে দলিত মথিত করে নিজেরাই এক একটি কেন্দ্র খুলে বসে এবং নিজেই সেখানকার প্রধান হয়ে বসে। এইরূপ ইচ্ছা যে সাধকের মধ্যে আসে, সেই সকল সাধক গুরুকে অবজ্ঞা করে, অনেকে আবার গুরুকে তাচ্ছিল্যের পাত্রও ভাবে। এই সকল সাধক-সাধিকা ভ্রষ্টাচারী, দুরাচারী, মিথ্যাচারী, নরকের কীট—রূপ, সাধক; এদের মুক্তি কোনদিনও হতে পারে না। কথায় আছে "কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না"; তাই সাধক, গুরুদেবের আজ্ঞা মত তুমি তোমার কাজ

করে চল, পাপ পুণ্য এ সব দেখার দরকার নেই। গুরুদেবের আজ্ঞা মানাটাই হল পুণ্য, আর না মানাটাই হল পাপ। প্রাণকর্মের দ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট করে হাজার দেহ-জনিত, ইন্দ্রিয়-জনিত, ব্যাধি-জনিত, বহিঃ-জগত-জনিত কষ্ট পেয়েও ভেঙ্গে পোড় না। জানবে, সাধনায় উত্তীর্ণ হতে গেলে এই সকল আসে এবং আরও বেশী বেশী করে আসবে, আর সেই সকল কাটিয়ে যদি তুমি এগিয়ে যেতে পার, তা হলে তুমি উত্তীর্ণ হতে পারবে। এটা সর্ব্বদা মনে রেখ যে, আমার গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত বাণী— যে, "ক্রিয়া করবার থেকে স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বরূপ গুরুদেবের আদেশ পালন করাই হল সব থেকে বড় ক্রিয়া", এইরূপ কোন কর্মই যদি না করে তারা নিজেকে সাধক বলে প্রতিপন্ন করে, তাহলে তারা সাধক পদবাচ্য নয়।

তাই আত্মক্রিয়ারূপী প্রাণায়ামের দ্বারা চঞ্চল প্রাণরূপী শ্বাসের বহির্গমন রোধ করে শ্বাসকে অন্তর্মুখীন করে স্থিরব্রহ্মে রূপান্তরিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। পূর্বে যেরূপ ভাবে প্রাণায়াম করার কথা বলা হয়েছে ঐরকম ভাবে প্রাণায়াম করতে থাকলে প্রাণায়াম অভ্যাস কালে স্থিরত্বের ধারণা এবং পরে তার প্রাপ্তি ঘটে এবং এরপর প্রাণায়ামের শেষে পরাবস্থায় থাকার সময় শান্তিরূপী, আনন্দরূপী বারিধারা মনোমৃত্তিকায় পড়ে তাকে শীতল, শান্ত, নির্মল করে দেয়।

**কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।**
**তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫**
**এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।**
**অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ**— প্রাণ কি? তা আমরা কেউ জানি না। প্রাণবায়ু আমাদের নাভিমণ্ডলে আছেন। তাকে কেমন দেখতে? তার আকৃতি কেমন? তার কি রং? এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, আর যিনি জানেন বা যাঁর সঙ্গে তার দর্শন হয়েছে, তার তখন কোন বোধই থাকে না। তখন তিনি আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে এমন ভাবে স্থির হয়ে যান যে তাঁর 'আমি-আমার' বোধ থাকে না বা দেহ

সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞানই তাঁর থাকে না। তাই যখন তিনি সেই অবস্থা থেকে নিচে নেমে আসেন, যেহেতু এটা অব্যক্ত অবস্থা বা যাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বা ঐ সময় সাধকের কোন জ্ঞান বা বোধই থাকে না- সেহেতু সেই সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই ব্যক্ত করতে পারেন না। তাই আজ্ঞাচক্রে স্থিতি যাঁর হয়েছে তিনিই হলেন অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নাই। আর তার ওপরে যাঁর স্থিতি হয়েছে তিনিই হলেন স্বয়ং ব্রহ্ম।

যখন আজ্ঞাচক্রে মন অবস্থান কবে তখন তার মন স্থিররূপে পরিবর্ত্তিত হয় এবং যখন তার মন আজ্ঞাচক্র থেকে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয় তখন মনের মধ্যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। তারফলে নানারূপ বহির্চিন্তার উদয় হয়। তখন শুধু শ্বাস টানা ফেলাই হয়, মন্ত্র স্মরণও হয় না, চক্র স্মরণও হয় না।

প্রাণ হল ব্রহ্ম পদবাচ্য। এই প্রাণই হল আত্মা। এই প্রাণকে শাস্ত্রে সব কিছু বলেছে যথা "প্রাণোহি ভগবান ঈশঃ প্রাণবিষ্ণু পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।" তাই যেখান থেকে তোমার উৎপত্তি, সেখানেই তোমার শেষ, তাকে চিনতে, তাকে জানতে, তার সঙ্গে মিশতে, তোমার কি ইচ্ছা করে না?

প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ, অর্থাৎ সৃষ্টি। শ্বাস গ্রহণ করবার পর আজ্ঞাচক্রে কুম্ভক অবস্থা, অর্থাৎ স্থিতি। আবার শ্বাস ত্যাগ, অর্থাৎ প্রলয় হচ্ছে—' অতএব সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই তিনটিই আমাদের দেহে হচ্ছে। যে সকল ব্যক্তিরা এইরূপ প্রাণকর্ম না করে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত থাকেন সেই সকল ব্যক্তিকে পাপাসক্ত ব্যক্তি বলে গীতায় সম্বোধন করেছে। আর যে সকল ব্যক্তি এই প্রাণকর্ম করছেন, সে সকল ব্যক্তি পাপ হতে মুক্তির পথ অনুসরণ করছেন। আর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই হলেন পুণ্যাত্মা।

**যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।**
**আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭**
**নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।**
**ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক প্রাণকর্ম করতে করতে যখন উচ্চাবস্থায় স্থিতি লাভ করেন তখন তিনি আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে তপস্বী হলেন। তারপর সেই আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে শ্বাসের মন্থরগতির পর ধীরে ধীরে স্থিরে রূপান্তরিত হলেন এবং আজ্ঞাচক্র ছাড়িয়ে আরো উপরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এই অবস্থায় আত্মার সঙ্গে দেখা হয়ে তাতে মন লয় প্রাপ্ত হয়। এটাই হল উচ্চাবস্থা। এই অবস্থা সাধকের প্রাপ্তি হলে তার মধ্যে আর কোন ইচ্ছা থাকে না; থাকে না কোন 'আমি-আমার' বোধ। তখন তিনি আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে থাকেন। অন্য কোন খেয়াল আর তাঁর থাকে না। একেই বোধহয় বলা হয়েছে — "আপনাতে আপনি থাক মন, যেয়ো নাকো কারো ঘরে।"

এই অবস্থা প্রাপ্তি হলে, সাধকের যেহেতু কোন ইচ্ছা শক্তি থাকে না, সেহেতু সাধককে চঞ্চল অবস্থারূপী মন টলাতে পারে না কারণ সেখানে মনের স্থান নেই। আবার যেহেতু এই স্থিরভাব অব্যক্ত তাই স্থিরাবস্থা সম্পর্কেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। তখন তিনি জীব থেকে শিবে রূপান্তরিত হন। তখন তিনি হন ভগবান। তখন তাঁকে পরমাশ্রয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিক পথ দেখাতে পারেন। এই সকল ব্যক্তি জ্ঞানী পদবাচ্য।

**তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।**
**অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯**
**কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।**
**লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রতিটি মানব দেহের অন্তঃপুরে পুরুষ শয়ন করে আছে বা ঘুমিয়ে আছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সেই পুরুষ জেগে ওঠে। তাই প্রাণকর্ম্মরূপী ক্রিয়া করা প্রতিটি জীবদেহের কর্ত্তব্য। আসক্তিশূন্য ভাবে ক্রিয়া করলে ক্রিয়ায় মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে তখন আর দেহের ক্ষয় সাধিত হয় না। তখন তিনি 'খ' বা ব্রহ্মে বিচরণ করেন। সাধকের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন সে প্রাণকর্ম শুরু করল তখন তার অবস্থা পিতার মত থাকে এবং ইন্দ্রিয়রূপী সন্তানাদির

উপর প্রবল ভালবাসা জ্ঞাপন করে। তার ফলে সে ইন্দ্রিয় সুখ হতে দূরে যেতে চায় না অর্থাৎ তখন সাধকের মনে চঞ্চল অবস্থার ভাব প্রবল ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বিধিপূর্বক এই প্রাণকর্ম করলে সাধকের জ্ঞান লাভ হয়, তখন তিনি এই সকল সুখে আর আসক্তি দেখান না। প্রাকৃতিক কারণে যা হচ্ছে তা ঘটতে দেন অর্থাৎ তিনি কোন কাজের সহিত লিপ্ত নন এবং তাঁর স্থিরত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি মহাত্মা পদবাচ্য অর্থাৎ পিতৃরূপী মন আত্মার সাক্ষাৎ হওয়ার পর আসক্তিশূন্য হয়ে মহাত্মারূপী মনে রূপান্তরিত হন।

**যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ।**
**স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।২১**
**ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।**
**নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।।২২**

তাৎপর্য্যঃ— এই শ্লোকের মাধ্যমে গীতায় আমরা দেখেছি যে অপর ব্যক্তিকে অনুকরণ করার কথা বলেছেন, যিনি প্রাণকর্মরূপী কার্য্য করে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তাঁকে। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অপর কেউ প্রাণকর্ম করে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তা বিচার করবার বা দেখবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই; তাই তাঁর আদেশ মত পথ চলাই বা ক্রিয়াই হল শ্রেষ্ঠকে অনুকরণ করা।

এইভাবে শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত বিধিপূর্বক প্রাণকর্ম করলে যখন সাধক উর্দ্ধে স্থিতিলাভ করেন তখন তাঁর প্রাপ্তব্য ও অপ্রাপ্তব্য কোন কিছুই তার হৃদয়ে রেখাপাত করতে পারে না। তখন তিনি হন গুণাতীত, সেহেতু তিনি তখন শিব বা ভগবান পদবাচ্য। তখন সকল কিছুতেই তাঁর প্রাধান্য বর্তমান থাকে। তখন তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই তিন লোকের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। এই স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই সকলই দেহের মধ্যে, দেহের বাইরে কিছু নেই। তাই বলা যায় -— "যা আছে এই দেহ ভান্ডে, তা আছে সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে।"

আমাদের আজ্ঞাচক্রই হচ্ছে স্বর্গ; বিশুদ্ধাখ্য থেকে মণিপুর পর্যন্ত হল মর্ত্ত, এবং মণিপুর থেকে মূলাধার পর্যন্ত হল পাতাল। যেহেতু তাঁর দেহ-

বোধ থাকে না, যেহেতু তিনি দেহাতীতে রূপান্তরিত হন, সেহেতু তাঁর এইরূপ কোন বোধ থাকে না, তখন তিনি স্থিরে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য চঞ্চল প্রাণে নেমে এসেও সেই চঞ্চলতাবশতঃ কোন কর্মে লিপ্ত হন না। একজন স্থিরপ্রাণ চঞ্চল প্রাণে ব্রতী হতে পারে, কিন্তু চঞ্চলতা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরফলে একজন স্থিরপ্রাণ একজন চঞ্চল প্রাণকে যেমন খুশি নাচাতে পারেন কিন্তু নিজে অবিচল থাকেন। তাই বলা যায় — "যে মতি নাচায় পুতুল দক্ষ বাজিকরে, সেমতি নাচাই আমি অর্বাচীন নরে।"

**যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।**
**মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।২৩**
**উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।**
**সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ**— ভগবান হলেন অনলস, তাঁর নিজের কোন আলস্য নেই। তিনি সকলকেই এই পথে ব্রতী করতে চান কিন্তু তা অবশ্যই সময়ের উপর নির্ভর করে। তিনি যেহেতু স্থির, সেহেতু বর্হিজগতের ও অন্তর জগতের সকল বায়ুকে মাধ্যাকর্ষণ রূপ শক্তির দ্বারা নিজের মধ্যে আকৃষ্ট করে রেখেছেন। সাঁতার একবার কেউ শিখে গেলে সে তার মরণ কাল পর্যন্ত তা ভোলে না। সে যদি আর অভ্যাস না করে তবুও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। তাই ভগবান হয়ে যাবার পর আর তাঁর সাধনাভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহলে পাঠকগণ বলতে পারে, যে তিনি তাহলে প্রত্যহ সাধনাভ্যাস করেন কেন?

কারণ, আমাদের মত অহংজ্ঞান সম্পন্ন জীব সদাসর্বদা নানারূপ ছুতো খুঁজতে ব্যস্ত থাকি এবং ঐ ছুতো ধরে কি করে একটু ফাঁকি দেওয়া যায় তার চেষ্টা করি। তখন ঐ ব্যক্তি শ্রীভগবান শ্রীগুরুর দিকে তাকিয়ে যদি দেখে— তিনি তো সাধনাভ্যাস করেন না— তাহলে আমরা করব কেন? যাঁকে অনুসরণ করে চলতে বলা হয়েছে, তিনিই যদি ফাঁকি দেন, তাহলে আমরা দেব না কেন? সেইজন্যই তাঁকে প্রত্যহ ক্রিয়ার আসনে বসতে হয় এবং তাঁর এই সকল স্বার্থন্বেষী

পুত্রও কন্যাদের হয়ে সাধনা করতে হয়। তিনি তো নিজেই জ্বলন্ত ক্রিয়া, তাঁর আবার ক্রিয়া করার কোন প্রয়োজন আছে কি? হাজার ঝড় হাওয়ার ধূলায় হীরের চমক কখনও নষ্ট হয় না। তাই তিনি শুধু আমাদের বাঁচাতে, আমরা যাতে ক্রিয়া ফাঁকি না দিয়ে সঠিক ভাবে কর্ম করতে পারি তার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেন। তারজন্য তিনি মনে অনুপ্রেরণা যোগান। তাঁর নিজস্ব কাজ করিয়ে ক্রিয়ায় যাতে মন বসে তার ব্যবস্থা করেন, মজা করেন, হাসি তামাসা করেন শুধুমাত্র মনের মলিনতাকে কিছুটা হাল্কা করার জন্য।

এঁটো বাসন মাজার আগে তা যদি জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে বাসন মাজবার সময় অধিক কসরৎ করতে হয় না। এই জলই হ'ল তাঁর হাসি, তামাসা, মজা ইত্যাদি। আর মাজাটা হল প্রাণকর্ম, আর এঁটো বাসন হলে তুমি নিজে।

**সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।**
**কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্যুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫**
**ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।**
**যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** শ্রীগুরুদেব হলেন জ্ঞানের ভান্ডার। তিনি হলেন মহাজ্ঞানী কিন্তু তিনি তাঁর পরিচয় তোমাদের নিকট দেন না। তিনি সর্বদা ছাই চাপা আগুনের মত নিজের উপর একটা আবরণ চাপিয়ে রাখেন। তাঁকে ধরে, সে কার সাধ্য?

আমাদের মন কামন-বাসনায় পরিপূর্ণ। আর তা আসে আসক্তিরূপ বন্ধন হতে। এই আসক্তিপূর্ণ মন নিয়ে আমরা যে কাজই করতে যাই তার জন্য আমরা সর্বদা ফলের আশা করি— অর্থাৎ এ কাজ করে আমার কি হবে? এইরূপ। শ্রীগুরুদেবের উপর আমরা চট করে বিশ্বাস আনতে পারি না। তাই তারজন্য তাঁর আদেশের উপরও আমাদের নানা রকম অশ্রদ্ধাকৃত ভাব লক্ষিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে মানি না। মানতে মনের মধ্যে নানা সংশয়ের সৃষ্টি

হয়। শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ আমাদের মত ভাব দেখান, কিন্তু তার সবটাই হল দেখানো, তার মধ্যে সবটাই হল আসক্তিশূন্য। আমাদের মত তা আসক্তিপূর্ণ নয়।

তাই আসক্তিপূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের পরাবুদ্ধি জন্মাবে না। আসক্তি ত্যাগ করে কর্মে লিপ্ত হলে যা অবশ্যই প্রাণকর্ম, তা করলে আমাদের পরাবুদ্ধির প্রকাশ হবেই হবে।

**প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।**
**অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।২৭**
**তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।**
**গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ**— আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে দেহের পঞ্চতত্ত্বের যথেষ্ট যোগ রয়েছে। যেমনঃ— আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আর পঞ্চতত্ত্ব হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এদের দ্বারাই প্রাণ কর্মের সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়; যেমন চক্ষু হল তেজস্তত্ত্ব, তাই চক্ষুর মাধ্যমে আমরা দর্শন কার্য্য করি। কর্ণ হচ্ছে বায়ু তত্ত্ব, তাই তার দ্বারা আমরা শ্রবণ করে থাকি। জিহ্বা হচ্ছে জলতত্ত্ব, তাই জিহ্বার দ্বারা আমরা আস্বাদন করে থাকি। নাসিকা হল ক্ষিতি তত্ত্ব, তাই তার দ্বারা ঘ্রাণ নিয়ে থাকি। ত্বক হল ব্যোম তত্ত্ব, তার দ্বারা আমরা স্পর্শ কার্য্য করে থাকি। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা প্রাণকর্ম করে থাকি। তার ফলে আমরা অহংজ্ঞানে মত্ত হয়ে আমি কে, তা না জেনে নিজেকেই কর্তা করে বসি। তার ফলে প্রাণের গতি চঞ্চল হয়। উপরে ও নীচে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ও মূলাধারে স্থিতি হলেও মধ্যাবস্থায় সেই চঞ্চলতা থেকে যায়, সেই জন্যই নিজেকে না বুঝেই এই দেহসর্বস্ব আমিকে কর্তা হিসাবে চিহ্নিত করে নিই। প্রাণায়ামরূপী প্রাণবায়ু বিধিপূর্বক করতে থাকলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ও মূলাধারে স্থিতি করে এবং প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ করে উঠা- নামা করলে বিধিপূর্বক প্রাণায়াম হল, তার ফলে মন এইরূপ কাজ করতে করতে এক সময় না এক সময় স্থিরীকৃত হয়। আর এই স্থিরাবস্থা ধরে রাখতে

পারলে আজ্ঞাচক্র ছেড়ে সহস্রারে গিয়ে পড়তে হয়। তখন তার মধ্যে আর কোনরূপ কর্ত্তাভাব বা কর্ত্তৃত্ব করবার ইচ্ছাও থাকে না। তার ফলে আসক্তিবশতঃ কোন কর্মই আর হয় না।

**প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।**
**তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯**
**ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।**
**নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** আসক্তি পূর্ণ জীব সর্বদা সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণের অধিকারী হয়ে থাকে, এই তিনগুণের মধ্যে আটকেই তারা কামন-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য আসক্তির বশবর্তী হয়ে নানারকম কাজ করে থাকে। সাধনাভ্যাসের দ্বারা মনকে স্থির করতে পারলে তখন মনের মধ্যে 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই ভাব থাকায় সে কর্ম করেও কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না।

আত্মকর্ম করবার আগে তোমার সবকিছু অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার এই সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সবার আগে শ্রীগুরুদেবের পদতলে সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু তা করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ,তাই মনের মধ্যে যখনই এই সকল ভাব আসবে তখনই নিরন্তর গুরুস্মরণ করে তাকে নিঃশেষ না করতে পারলেও তার উপর সাময়িক বাঁধ দেওয়া যায়। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এক সময় না এক সময় তোমার সব কিছু তুমি শ্রীগুরুদেবের পদতলে অর্পণ করতে পারবে। তখন মনের মধ্যে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য ভাব এসে উপস্থিত হবে। কামনা-বাসনারূপী 'আমি-আমার' বোধ হতে উৎপন্ন দুঃখ, শোক,সুখ, আনন্দ,বিলাপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল সাধন সমরে দাঁড়িয়ে প্রাণকর্ম করবার উদ্যম বিনষ্ট করে দেবে। তাই সকল জীবদেহের নিকট আহ্বান জানান হচ্ছে, তোমরা ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করে সেই ইন্দ্রিয়দের দমন করে প্রাণকর্মরূপ কর্মে ব্রতী হও।

**যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।**
**শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ।। ৩১**

**যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।**
**সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ।। ৩২**

**তাৎপর্য্যঃ**— মানুষের মন অহং জ্ঞানে পরিপূর্ণ, সে সর্বদা অপরের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ায়, নিজের দোষ সে দেখতে পায় না। অপরের গুণ তার চোখেই পড়ে না বরং কেউ যদি কারুর প্রশংসা করে ,তার নিজের মধ্যে 'আমি-আমার' বোধের অবস্থানের জন্য সে হিংসায় ও রাগে জ্বলে ওঠে। নিজের দোষ না দেখে, অপরের দোষ দেখতে দেখতে সে নিজের স্বভাবটাকেই পালটে ফেলে। এইভাবে দোষানুসন্ধান করতে করতে সে এমন অবস্থায় পৌছায়, তখন শ্রীগুরুদেবেরও কাজ-কর্মের দোষ বিচার করতে শুরু করে— যা হল মহা পাপ। এর ফলে মনের মধ্যে সংশয় , দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নানারূপ ভাব এসে উপস্থিত হয়। আর যখন সে সাধনা করতে বসে তখন তার চক্রও স্মরণ হয় না,মন্ত্রও স্মরণ হয় না। আমি যে গুরুদেবের ভুল ধরেছি এই অহং জ্ঞানে মত্ত হয়ে নিজেকে খুব বড় মাপ কাঠিতে তুলে ধরে সেই মুহুর্তে বড় করে নিজেকে ভাবলেও ভবিষ্যতে দেখা যায় যে সে নিজেই প্রকৃত ভুল করেছে। শ্রীগুরুদেব কখনো ভুল করতে পারেন না। তার ফলে সে হিংসার বশবর্ত্তী হয়। অপরের কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিজের মধ্যে 'আমি-আমার' বোধ এমন ভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে যে সে নিজেকে গুরুদেবের তুল্য ভাবে। তার ফলে তার পাপই বৃদ্ধি পায় মাত্র— যার পরিণতি ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হয়।

তাই আমার গুরুদেব বলেছেন —"অপরের দোষ দেখো না। তা দেখবার আগে প্রত্যেকে নিজের আত্মসমীক্ষা করবে।" যে সকল মানুষ গুরুদেবের দোষানুসন্ধান না করে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান হয়ে তাঁর আদেশ মত প্রাণ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তার মনমধ্য হতে সকল বাহ্য চিন্তা এক সময় না এক সময় দূরীভূত হয়। আর তখন বাহ্য চিন্তা না থাকায় প্রাণকর্ম সঠিক হয় অর্থাৎ প্রাণায়াম বিধিপূর্বক হয়। চক্রে,মন্ত্রে, ও স্থিতিতে লক্ষ্য থাকে। তারপর আসে অনাসক্ত ভাব। সেই ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে ক্রিয়া করলে তা সঠিক বা মুক্তি পথগামী হয়।

মৃত্যু, সে তো আসন্ন। সে তো এক সময় না এক সময় এসে দেহের মায়া কাটিয়ে তাকে পঞ্চভূতে লয় করে যাবে। তাকে তো খন্ডানোর ক্ষমতা কারুর নেই। তা হলে যতকাল এই প্রাণবায়ু দেহের মধ্যে দিয়ে চলাচল করছে সেইসময়টুকুর মধ্যে প্রাণকর্মে লিপ্ত হবে না কেন? আমরা নানারকম অজুহাত দিয়ে, আজকে কম করে কালকে সম্পূর্ণটা করব এইরূপ দোহাই দিই। কিন্তু কাল সেই কালই থেকে যায়, সে আজে পরিণত হয় না। আমরা তো ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নই! কালকে কি ঘটবে তা কি আমরা জানি? কালকে এই দেহটা থাকবে কি না তাও তো আমাদের জানা নেই? আমরা সকল কার্য্য করে তারপর এই প্রাণকর্মের কার্য্যে লিপ্ত হই। প্রাণকর্মরূপ কার্য্য করে সকল কাজে লিপ্ত হই না, অর্থাৎ নিজের আত্মতুষ্টির কাজ আগে করি। এখানে আত্মতুষ্টি বলতে নিজের হাতে গোণা সুখ সমৃদ্ধির দিকে আগে তাকাই, তারপর প্রাণকর্ম।

এই সকল ব্যক্তি কর্মযোগের অনুষ্ঠান করার সময় ক্লান্তিবশতঃ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এদের সাধনায় বসাই হয়, সাধনা আর হয় না, তখন ক্রিয়াকে একঘেয়ে লাগে, আর ক্রিয়ারফলও প্রকাশিত হয় না। এই সকল ব্যক্তি বিবেকহীন, মূর্খব্যক্তি বলে পরিচিত হয়।

**সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।**
**প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩**
**ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।**
**তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪**
**শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।**
**স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।৩৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** বহু তপস্যার পর জীব মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জন্মগ্রহণ করার পর ইন্দ্রিয়জনিত কর্ম বা আত্মকর্ম করে নিজের কর্মফল তৈরী করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তার আত্মার সঙ্গে তার কর্মফল যুক্ত হয়ে যায়। েই কর্মানুযায়ী সে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে আসে; অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বীজরূপে স্থান করে এবং তারপর সময়কালে ভূমিষ্ঠ হয়। পূর্বে একথাও বলা হয়েছে

যে, সে পূর্বে যেরূপ কর্ম করে সেই কর্মফল ধরেই তার জন্ম হয়। কিন্তু আমরা তা বুঝি না, কারণ আমরা যেমন ভবিষ্যৎ -দ্রষ্টা নই, তেমনি পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম বা কি ছিলাম না— তাও আমরা বলতে পারিনা, আর জাতিস্মর সে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত থাকে; বড় হবার পর তা আর তার স্মৃতিগোচরে থাকে না। কিন্তু সেটা খুবই সীমিত, সকলের পক্ষে নয়। তাই আমরা যখনই কোন বিপদে পড়ি তখনই নিজের অদৃষ্টের উপর দোষ দিই কিন্তু অদৃষ্টটা কি? সে তো নিজেরই কর্মফল। তা না বুঝে, তা না জেনে আমরা ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করি। আসলে দোষী আমরা নিজে আর দোষ আমাদের নিজেদের। তা আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। কই! একবারও তো আমরা বলি না এটা আমার কৃতকর্মের ফল, তাই আমাকে ভুগতে হয়। যতই মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি অর্থাৎ বউ, ছেলে, মা, বাবা, ভাই, বোন বা মায়া, মমতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা এই সকল বেড়াজালের মধ্যে আটকে থাকবে ততই সে জ্বলতে থাকবে। এই দুনিয়ায় কেউ তোমার আপন নয়, এখানে সবাই নিজেদের স্বার্থ ও মতলব হাসিল করার জন্য রয়েছে। সকলেই তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমরা মুখে বলি স্বনির্ভরতা। সত্যই কি আমরা স্বনির্ভর? না, সেই স্বনির্ভরতা আনতেও আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আমরা মুখে বলি আত্মসম্মান, আমরা সত্যই কি সম্মান পাই? প্রতিনিয়ত কি আমরা নিজের কাছে অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছি না? কোন জিনিস বউ— ছেলেকে না দিতে পারলে আমাদের মন কি অনুশোচনায় কুড়ে কুড়ে খায় না? আবার দিতে পারলে আমাদের মন চাইতে চাইতে আকাশের চাঁদকে চেয়ে বসে, যেটা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। আর এক সময় পেতে পেতে যদি না পায়, তারাই তোমাকে অপমান করবে। তখন কোথায় থাকে আমাদের আত্মসম্মান? তখন সেই ভালবাসা, আন্তরিকতা সবকিছু তারা না পাওয়ার বেদনায় দুপায়ে মাড়িয়ে দেয়। তখন কি তারা ভাবে তোমার কথা? আবার এরাই হল তোমার সব চেয়ে আপন; এরাই হল তোমার সুখ-দুঃখের বন্ধন। হ্যাঁ, আমাদের মন হল কুকুরের লেজের মত, যতই সোজা কর, সে আবার গুটিয়ে যায়; অর্থাৎ আমাদের যতই আঘাত করুক আমরা ততই সেই আপনজনদের কাছে পেতে চাই।

কিন্তু একবারও যে আমার আপন, যে আমার চির-বান্ধব, যে আমার সুখ-দুঃখের কর্তা, যে আমার গতি, যে আমার পালনকর্তা, যার নিবাস আমাদের এই দেহে; তাঁকে একবারও আপন ভাবি না, তাকে একবারও ভালবাসি না, তাকে একবারও কাছে ডাকি না। যে সদাসর্বদা ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আন্তরিকতাপূর্ণ ডাক শোনার জন্য আমার এই দুঃখ, দুর্দশা দেখে সাশ্রু চোখে দু'বাহু উত্তোলন করে তার বক্ষে জড়ানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তার কথা ভুলে যাই, আর এই আবর্তনের বেড়াজালের মধ্যে পড়ে ক্রমাগত লালসা, ক্ষোভ, রাগ, দ্বেষ, অহংকার ইত্যাদির আগুনে জ্বলতে থাকি, আর একসময় ছাই হয়ে পঞ্চভুতে লীন হয়ে যাই।

পরবর্তীকালে মানুষ জন্ম নিয়ে যে আসব, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই জন্মে গাধার মতন মোট বয়ে ক্লান্তই হয়ে পড়লাম, আবার সেই জন্মসূত্র ধরে জন্মগ্রহণ করে আবার সেই মোটই বইতে হবে। তাই মানুষ; তোমাদের কি ইচ্ছা করে না, যে ক্ষতের পুঁজ রক্ত বেড়িয়ে ঘায়ে পরিণত হয়েছে, তার উপর একটু মলম লাগাতে? আর সেই মলম হল এই প্রাণকর্ম। যে রকম আন্তরিকতা, ভালবাসা, তুমি তোমার বউ, ছেলে, মেয়ের উপর দেখাও, টাকা পয়সা বা বিষয়-আশয়ের উপর দেখাও, সেই আন্তরিকতা, সেই ভালবাসা কি প্রাণকর্মের উপর দেখাতে পার না? জন্মসূত্র ধরে তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছ, তখন পূর্ব-জন্মসূত্র অনুসারে সেই কর্মফল তোমায় ভোগ করতেই হবে। তা কখনও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে না। মনের মধ্যে তাই ইন্দ্রিয়সুখ থেকে দুরে থাকার চেষ্টা কর। জড়িয়ে পড়বে, কিন্তু মনের মধ্যে তাকে ছাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, আর তার জন্য সর্বদা গুরুস্মরণ কর, তা হলে তুমি তোমার নতুন কর্মফল তৈরী করতে পারবে— যা ভবিষ্যতে সুখপ্রদ। কিন্তু মুখে চেষ্টা করছি বলে মনে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্তি থাকলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিভাবে হবে? তার ফলে আত্মক্রিয়াও সে কিভাবে বিধিপূর্বক করবে? চোখ বন্ধ থাকলে সম্মুখে অন্ধকার দেখি, তবুও না তাকিয়ে তাকে বন্ধ করে রাখার চেষ্টা কর। চোখ খুলে ফেল না, ফেললেই চঞ্চলতা প্রকাশ পাবে। সাধনায় উত্তীর্ণ হতে গেলে বা নতুন কর্মফল তৈরী করতে গেলে দর্শন বা অদর্শন কোনটাতেই আমাদের ইচ্ছা থাকা

উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সুখ কখনই নতুন কর্মফল সৃষ্টি করে তোমায় মুক্তি দিতে পারবে না, বরং তা সর্বদাই তোমায় নরকের দিকে টানবে। মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তা আসছে প্রাণকর্ম করতে বসে, কিন্তু তোমার মধ্যে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা থাকলে, সেই প্রাণকর্ম দোষযুক্ত হলেও তা শ্রেষ্ঠ। কারণ তুমি প্রাণের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করছ। উঠছো- পড়ে যাচ্ছ, আবার উঠছো, আবার পড়ে যাচ্ছ। এই ভাবেই তুমি এক সময় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং তারপর চলতে ও আরও পরে দৌড়তে পারবে।

**অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।**
**অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬**
**কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।**
**মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭**
**ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।**
**যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মরূপী ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ভালবাসা, আন্তরিকতা এসব কিছু মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে, বউ এদের উপর যেমন দেখাচ্ছি ক্রিয়ার উপর সেরকম দেখাও। তার মানে এই নয় যে তাদেরকে ত্যাগ কর। সংসারী জীব আমরা, সংসার অর্থাৎ সংই- সার। এই অর্থ জেনে আমাদের স্টেজে সং সেজে অভিনয়ের মত রাম শ্যামের বাবা, মধু শ্যামের মা, যদু শ্যামের ছেলে ইত্যাদির মত আচরণ করতে হবে; অর্থাৎ তাদের উপর সকল কর্তব্যকর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। কারণ কাশীর বাবার প্রদর্শিত এই ক্রিয়া-যোগ সাংসারিক জীবেদের জন্য। সংসার ছেড়ে তো অনেকেই পাহাড়-পর্বতে, বনে-বাদাড়ে গিয়ে বসে সাধনা করে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা করাই হল সব চেয়ে কঠিন কাজ। যে রাস্তা যত কঠিন হবে সে হাজার ঝড় -ঝঞ্ঝা বা বৃষ্টির জলেও ক্ষয়ে যাবে না। সন্ন্যাসী হতে হবে মনে, নিজের দেহের আবরণ পরিত্যাগ করে গেরুয়া বসনরূপী আবরণ পরিধান করলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। মনের মধ্যে আসক্তি ত্যাগই হল প্রকৃত

সন্ন্যাস পদবাচ্য। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কর্মসূত্র ধরে যেহেতু আমাদের জন্ম, সেহেতু আমরা নানারূপ কর্মে লিপ্ত হই, আর সেই কর্মে লিপ্ত করে আমাদের ইচ্ছাশক্তিরূপী মন, কোনকিছু ইচ্ছা জাগলে তা চরিতার্থ করবার জন্য আমরা সদাসর্বদা চঞ্চল প্রকৃতিতে রত থেকে অজ্ঞানীর মত কাজ করি। ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ি, এটাই পাপ। এমনকি কোনকিছু চাইবার ইচ্ছা বা কোনকিছু পাবার ইচ্ছা অথবা কোনকিছু না পাওয়া বা না চাওয়ার ইচ্ছা, এই সকলই চঞ্চল প্রকৃতির অধীন, সেহেতু উভয় ইচ্ছাই পাপ। এমনও অনেক সময় দেখা গেছে কোন একটি কাজ করতে ইচ্ছা নেই, কিন্তু ভেতর থেকে বলপূর্বক সেই কাজটি করার জন্য আমাকে পীড়ন করছে এবং পরে প্রেরণ করছে। এটাই হল কর্মসূত্র অনুসারে যে জন্মগ্রহণ আমরা করেছি সেই কর্ম প্রতিপালন করা। তাই মনের মধ্যে সঠিক চেষ্টা থাকলে কঠোর সাধনাভ্যাস দ্বারা সাধক ইচ্ছা- রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন আর পাপ থাকে না, তখন সে হয়.জিতেন্দ্রিয়।

আমাদের মনে ইচ্ছার উদয় হয় কামনা-বাসনা থেকে। মন যখনই সাধনাভ্যাসকালে বা অন্য সময় দুই ভ্রূর মাঝখান হতে সরে যায় তখন তা কণ্ঠের নীচে নেমে আসে, আর তখনই কামনা-বাসনারূপী শত্রুর আক্রমণে আক্রান্ত-হয়ে ইচ্ছার দাসত্ব করি যা মোক্ষ মার্গে বা সাধনায় উত্তীর্ণ হবার প্রধান বাধা। আমাদের এই মন যখনই কণ্ঠের নীচে নেমে আসে তখনই কামনা-বাসনারূপী চঞ্চল প্রাণ তাকে ঢেকে ফেলে। তার ফলেই মনের মধ্যে নানারূপ কামনা-বাসনারূপী আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, আর তখনই জীব আত্মজ্ঞান হারিয়ে সেই কামনা-বাসনারূপী কার্য্য চরিতার্থ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

**আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।**
**কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ।।৩৯**
**ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।**
**এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০**
**তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।**
**পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।।৪১**

**ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।**
**মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২**
**এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।**
**জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩**

**ইতি কর্মযোগ।**

**তাৎপর্য্যঃ—** মনের মধ্যে কামনা-বাসনা থাকে বলে, 'আমি-আমার' রূপ বোধ আছে, অর্থাৎ এই কামনা-বাসনা থেকে 'আমি-আমার' বোধ বা অহংকারের সৃষ্টি। সেই জন্যই ক্রিয়া করছি বলে আমাদের করাই হয়, তার থেকে কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, কারণ এই কামনা-বাসনারূপী 'আমি-আমার' বোধ, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই কামনা-বাসনারূপী অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কামনা-বাসনারূপ শত্রুর নিধন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান বা নিজেকে জানা ও বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমার্থকে জানা সম্ভবপর হয় না।

ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সকল এই মন থেকেই সৃষ্টি; আবার মন বুদ্ধির দ্বারা ভালো মন্দ বিচার করে, অর্থাৎ কামনা-বাসনারূপী ইচ্ছা শক্তি হতেই চঞ্চলগতিরূপ মনের সৃষ্টি। তাই সবার আগে স্থিরপ্রাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে মনের সহিত লড়াই করে, কামরূপ শত্রুকে নিধন করে তার উপর জয়ের পতাকা উড়াও। এর ফলে চঞ্চল প্রাণরূপী মন কামনাবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় মনের ভিতর কোনরূপ ইচ্ছা বা 'আমি-আমার' বোধ জন্মাবে না। তাই মনকে স্থিরপ্রাণরূপী আত্মায় লয় করতে অধিক সময় লাগে না। অতএব 'সাধক', পথের কাঁটারূপ এই কামনা-বাসনাকে আগে জয় কর। তাহলে তোমার অজ্ঞানতা ঘুচে গিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হবেই হবে।

**।। ইতি কর্ম্মযোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

## জ্ঞানযোগ

**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।**
**বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১**

**তাৎপর্য্যঃ—** শ্বাসই হল আমাদের দেহের প্রাণ। তার আগম নিগমের মাধ্যমেই আমাদের দেহ সচল অবস্থায় আছে। তার জন্যই আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি, হাতে ধারণ-শক্তি, কর্ণে শ্রবণ- শক্তি, কণ্ঠে বাক্-শক্তি, নাসিকায় ঘ্রাণ-শক্তি, পায়ে চলার শক্তি ইত্যাদি আছে। সে যখন এই দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আমাদের এই দেহটি শবে পরিণত হবে। একজন দৃষ্টিহীন, এক জন বাক্শক্তিহীন, একজন শ্রবণশক্তিহীন মানুষ জীবিত থাকতে পারে স্বাভাবিক মানুষের মতই, কিন্তু একজন ঘ্রাণশক্তিহীন মানুষ; কখনও নয়। তাই শ্বাস আমাদের দেহের প্রাণ, আর এর দ্বারা কার্য্য করবার নামই হল প্রাণকার্য্য বা প্রাণকর্ম্ম। প্রাণকর্ম করবার প্রারম্ভে সকলের শ্বাস ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদের মনের অবস্থা থাকে সদা চঞ্চল।

দুই নাসিকা দিয়ে শ্বাস যতদিন প্রবাহিত হতে থাকবে, আমাদের মনের গতি প্রকৃতি সদাসর্বদা চঞ্চল থাকবে। কারণ তখন শ্বাস কণ্ঠের নীচে অবস্থান করে। এইভাবে প্রবল প্রচেষ্টার দ্বারা প্রাণকর্ম করবার অভ্যাস বিধিপূর্বক হলে শ্বাস যখন দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে, তখন সাধকের শ্বাস ঐ চক্রে গিয়ে স্থির হয় অর্থাৎ তখন চন্দ্রনাড়ীস্থিত ঈড়া এবং সূর্য্যনাড়ীস্থিত পিঙ্গলার মধ্যে দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হয় না, তা প্রবাহিত হয় সুষুম্না নাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়ে। সেই সময় সাধকের মন স্থির হয়। এইভাবে চঞ্চল অবস্থারূপী মন বহির্মুখে ধাবিত না হয়ে স্থিরাবস্থারূপী মনে পরিবর্তিত হয়ে অন্তমুর্খী হয়। এটাই যৌগিক কর্মে লিপ্ত হওয়া।

**এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।**
**স কালনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২**

**তাৎপর্য্যঃ—** "গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি—" অর্থাৎ গত জন্মে যদি আমরা যোগরূপ কর্ম করে থাকি, তাহলে বর্তমান জন্মে আমাদের সেই যোগরূপ কর্ম করতে হবেই। আবার মাতৃগর্ভে আমরা যখন ছিলাম তখন আমাদের শ্বাস সুষুম্না নাড়ীস্থিত নাড়ী দিয়ে প্রবাহিত হত এবং আমাদের জিভ তখন উল্টানো ছিল অর্থাৎ পূর্বশ্লোকানুসারে তখন আমরা স্থির ছিলাম। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যোগী ছিলাম। আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শ্বাস দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তখন আমরা হয়ে যাই যোগ-ভ্রষ্ট। এর পরই দেহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইন্দ্রিয়গুলির দৌরাত্ম্যের ফলে ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ি। তাই যাঁর সঙ্গে আমরা যুক্ত ছিলাম তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরই। যা হল পরমশান্তি, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা যোগভ্রষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করা আমাদের কর্ম নহে।

**স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।**
**ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্য হ্যেতদুত্তমম্।।৩**
**অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।**
**কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্ম করে জীব তার নিজের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে সাধক জানতে পারে যে, সে নিজে কি?— অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা সে জানতে পারে আমিরূপী এই দেহের মধ্যে যে 'আমি' লুকিয়ে আছে সে কে? সে হল ভক্ত আমি, সে হল সখা আমি, সে হল শিব আমি, সেই নারায়ণ। সে সদাসর্বদা এই দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। প্রাণকর্ম করতে করতে নারায়ণরূপী প্রাণ বা আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সেই প্রকাশে মন প্রাণ সব হারিয়ে যায় বা তিনি হরণ করে নেন। ইনিই হরি পদবাচ্য, আর

যোগীরাজ শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী

এইরূপ অবস্থা ভাবাতীত অবস্থা, জীব এই অবস্থা উপলব্ধি করলে, আত্মার সহিত যুক্ত হতে চান আর তাঁর সঙ্গে যুক্তাবস্থাই যোগাবস্থা। আমরা সকলেই ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন, তার পর আমাদের জন্ম হয়, জন্ম লাভের পর আমরা প্রাণকর্মের দ্বারা স্থিরাবস্থা লাভ করতে চাই অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্ম তারপর জন্ম। প্রাণকর্মরূপী ক্রিয়া করে উত্তীর্ণ হলে তারপর আবার ব্রহ্ম। এই সকল কথা পুঁথিতে বা বইয়েতেই শুনেছি মাত্র কিন্তু সত্যই যে ব্রহ্মের পর এই দেহ আমি, তা আমরা জানব কি করে?

**বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।**
**তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫**
**অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।**
**প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬**

**তাৎপর্য্যঃ**— উপরিউক্ত শ্লোকের তাৎপর্যের উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে সূর্য্য এবং ঈড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের অবস্থান আছে। আমাদের দুই নাসিকার মধ্যে দিয়ে যখন শ্বাস দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আমাদের জন্ম হয়; আর দেহ থেকে তা পরিত্যাগ করলে আমাদের মৃত্যু হয়। প্রাণকর্মরূপী কার্য্য করবার সময় আমরা শ্বাস গ্রহণ করে উপরে একটু স্থিতি ও শ্বাস ত্যাগ করে নিম্নে একটু স্থিতি করে প্রাণায়ামরূপী প্রাণকর্ম করি— অর্থাৎ শ্বাস টানলে জন্ম, শ্বাস ফেললে মৃত্যু। ফেলবার পর স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্ম, কারণ সেখানে বায়ু স্থির। আবার শ্বাস গ্রহণ করবার ফলে জন্ম এবং স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মের প্রকাশ তারপর জন্ম তারপর আবার ব্রহ্মের প্রকাশ।

**যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।**
**অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭**
**পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।**
**ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্ম করতে করতে সাধক-সাধিকারা ইন্দ্রিয়দের দ্বারা বহুলভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। কি বাহ্যিক, কি আভ্যন্তরীণ সব দিক থেকেই বাধা বিঘ্ন তাকে চেপে ধরে। তখন প্রাণকর্ম করতে বসে মন নানা দিকে ধাবিত হয়। সাধক-সাধিকা সেই সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে প্রাণকর্ম করবার চেষ্টা করলে সেই বাহ্যচিন্তারূপী ইন্দ্রিয়গণ তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তখন শ্রীগুরুর নিকট আপ্রাণ প্রার্থনা করবে, যে, আমি আর পারছি না, আমায় তুমি রক্ষা কর। এইরূপ সাশ্রু নিমজ্জিত আকুল প্রার্থনা করলে, শ্রীগুরু তার দেহে অবস্থান করে তার ক্রিয়া করে দেন।

আমরা নারায়ণের দশ অবতারের কথা জানি, যেমন ঃ—

(১। মৎস্য অবতার ২। কূর্ম অবতার ৩। বরাহ অবতার ৪। নরসিংহ অবতার ৫। বামন অবতার ৬। পরশুরাম ৭। রাম ৮। শ্রীকৃষ্ণ ৯। বুদ্ধ ১০ কল্কী)

১। **মৎস্য অবতার ঃ—** তিনি শ্রী বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য অবতার। মৎস্য অবতারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হল স্থিরে রূপান্তরিত হওয়া। কারণ মৎস্য হল স্থিরের প্রতীক। সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে বেদ সকল সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই এই অবতারে নারায়ণ চারটি হাতে চারটি বেদ ধারণ করে আছেন।

২। **কূর্ম অবতার ঃ—** তিনি নারায়ণের দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে তিনি মন্দার পর্বতকে আপন পিঠে ধারণ করে আছেন অর্থাৎ মন্দার পর্বত হল আমাদের দেহস্থিত ব্রহ্মযোনী-স্বরূপ। এই ব্রহ্মযোনী থেকেই সকল প্রাণীর সৃষ্টি। তিনি প্রকৃতিরূপা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন বলে সমগ্র জগৎ চলছে। প্রাণকর্মের দ্বারা এই ব্রহ্মযোনীতে মন্থনরূপী স্থির বায়ুর ক্রিয়া করলে সাধক ব্রহ্মযোনী ভেদ করে অমৃতলোক প্রাপ্ত হন।

৩। **বরাহ অবতার ঃ—** তিনি বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। বরাহ অবতারে আমরা দেখেছি অসুরদের দমন করে বরাহদেব তাঁর নাসিকার উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন অর্থাৎ শ্বাস যা আমাদের দুই নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

হচ্ছে, তাকে অন্তর্মুখী করে প্রাণায়ামরূপী শ্বাসের দ্বারা অসুররূপী ইন্দ্রিয়সকলকে— যা মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, তাকে দমন করে স্থির হওয়ার চিহ্ন। অর্থাৎ বরাহ অবতারের মাধ্যমে শ্বাসের গতিকে উল্টো করে প্রাণকর্ম করে দেহবোধ ত্যাগের মাধ্যমে বা শ্বাসকে কণ্ঠের উর্দ্ধে দুই ভ্রূ'র মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করে কণ্ঠের নিম্নে পৃথিবীরূপী দেহকে শবদেহে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে।

৪। **নরসিংহ অবতার ঃ**— নরসিংহ অবতার হলেন শ্রীবিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। নরসিংহ হল অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধ সিংহ— অর্থাৎ সিংহ বিক্রমরূপী প্রবল পুরুষাকারের দ্বারা আপন প্রাণকে মস্তকে ধারণ করতে পারলে সাধব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

৫। **বামন অবতার ঃ**— বামন অবতার হলেন শ্রীবিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। বামন অবতারে আমরা দেখেছি যে, সে তিন পদের দ্বারা ত্রিলোক জয় করেছে। প্রথম পদে পাতাল ও মর্ত্ত, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গ এবং তৃতীয়পদ অসুররূপী রাজার মস্তকে রেখেছিলেন। তার অর্থ এই যে মূলাধার থেকে মণিপুর অর্থাৎ পাতাল, মণিপুর থেকে বিশুদ্ধাখ্য অর্থাৎ ধরিত্রী এবং আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ স্বর্গ। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই হল তিনগুণ স্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যোগক্রিয়ার দ্বারা স্থির অবস্থায় বসে ক্রিয়া করে সহস্রার ভেদ করে যিনি মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন, তিনি ত্রিগুণরহিত হয়ে যান।

৬। **পরশুরাম ঃ**— পরশুরাম হলেন শ্রীবিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়দের দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হন— অর্থাৎ সাধন সমরে যে সকল ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজঃগুণের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁরা ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। আপন প্রাণকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করতে পারলে রজঃগুণের নাশ হয়। তখন সাধক ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হন। এইভাবে প্রাণকর্মের দ্বারা ক্ষত্রিয় দমনের কথা বলা হয়েছে।

৭। **রাম ঃ**— রাম হলেন শ্রীবিষ্ণুর সপ্তম অবতার। এখানে রাম দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাম নয়। এখানে রাম হলেন আত্মারাম। দেহরূপী গাণ্ডীবের

উপর ওঁকাররূপী শর ক্ষেপণের মাধ্যমে দেহস্থিত অসুর দমন করা অর্থাৎ ওঁকাররূপী প্রাণকর্মের দ্বারা দেহক্ষেত্রকে দেবক্ষেত্রে পরিণত করাই হল তাঁর কাজ।

৮। **শ্রীকৃষ্ণ ঃ—** তিনি হলেন শ্রীবিষ্ণুর অষ্টম অবতার। আপন দেহক্ষেত্রকে প্রাণকর্মরূপী প্রাণায়ামের দ্বারা কর্ষণ করে দেবক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে অমৃতরূপী দুগ্ধপান করে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়াই হল সাধকের সাধনবিজয়। এই হল শ্রীকৃষ্ণ অবতারের তাৎপর্য্য।

৯। **বুদ্ধ ঃ—** বুদ্ধ হলেন শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার। বুদ্ধ অবতার হল স্থিরের প্রতীক, অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা।

১০। **কল্কী ঃ—** কল্কী হলেন শ্রীবিষ্ণুর দশম অবতার। প্রাণকর্মের দ্বারা দেহস্থিত সকল কামনা-বাসনারূপী রিপুসকলকে দমন করে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়াই হল এই অবতারের বিষয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে আত্মারামকে পাবার জন্য শ্বাসের গতিপথকে উল্টো করে দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৃষ্টি দিয়ে দেহরূপী ক্ষেত্র কর্ষণের মাধ্যমে আমরা স্থিরে রূপান্তরিত হব। তার পর স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালরূপী দেহক্ষেত্রের উপর জয়লাভ করে আমরা সহস্রারে যাবো। সেখানে স্থির অবস্থার উপর বসে বা সমাধি অবস্থায় থেকে প্রাণকর্ম করলে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবো। তখন চৈত্যময় গুরুর সাক্ষাৎ লাভ হবো এবং পরব্রহ্মে লীনতা প্রাপ্ত হবো।

সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভক্তের আকুল প্রার্থনা দেখে ভগবান রূপী শ্রীগুরুদেব ভক্তের দেহের মধ্যে অবস্থান করে ক্রিয়া করে দেন। এই অবস্থা হলে ঈশ্বরের দ্বারা ভক্তের দেহে ও প্রাণে ধর্মস্থাপন করা হল। এরপর প্রাণকর্ম করে তার দেহের মধ্যে কর্মের প্রচার করে থাকেন। এর পর গুরুদেব যেমন যেমন বলবেন তেমন তেমন পথ অনুসরণ করে চললে দেহমধ্যস্থিত দুষ্কর্মরূপী ইন্দ্রিয় সকল মুছে গিয়ে প্রাণকর্মে উত্তীর্ণ হতে জীব সমর্থ হবে। এটাই হল সাধুদিগকে পরিত্রাণ করবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে অর্থাৎ সময়ে সময়ে তাঁর

অবতরণ।

**জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।**
**ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।৯**
**বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।**
**বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্বেই এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে যে আমরা সকলেই ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট। এরপর আপন আপন কর্মফল ধরেই আমাদের জন্ম। সাধক যখন স্থিরে রূপান্তরিত হয় তখন সেই স্থিরাবস্থায় থেকে প্রাণকর্ম্মরূপী যে কাজ সে করে তা অলৌকিক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়— অর্থাৎ তিনি কোন কর্মে যেহেতু লিপ্ত না হয়ে কার্য্য করেন, সেহেতু সেই কাজ অলৌকিক। কিন্তু সেই স্থির অবস্থা যার প্রাপ্তি হয়নি, সেই অস্থির বা চঞ্চল অবস্থায় সে যে সকল কার্য্য করে তা লৌকিক কার্য্য বলে পরিগণিত হয়।

যে সকল সাধক অলৌকিক কর্ম্ম করেন তাঁরা দেহ থাকাকালীন অবস্থায় মৃত্যুকে জেনে ফেলেন। এর ফলে তিনি কে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন বা মৃত্যু কি— ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে যেহেতু ব্যক্ত করতে পারেন সেহেতু দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে তাঁর এই পথ জানা থাকায় আর অধিক কসরত করতে হয় না। যেহেতু তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাই তিনি জন্ম, মৃত্যু, ও কর্ম্মসকল সব ভাল করেই জানেন। সেইহেতু পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তিনি সেই পথ ও কৌশল অবলম্বন করে জন্মরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

আমাদের এই চঞ্চল প্রাণ থেকেই মনের সৃষ্টি। আর এই মনটা আছে বলেই আমাদের যত অধোগতি অর্থাৎ এই অহংসম্পন্ন মনটাই হল যত নষ্টের মূল। এর দ্বারাই মায়া, মমতা, মোহ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে আমরা দিনের পর দিন শুধু জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি, তার থেকে বের হতে পারছি না। এই ভাবে যত আমরা জড়িয়ে পড়ব তত আমাদের কর্মের আবর্ত্তনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। তার থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাব

না। তাই প্রাণকর্মরূপী প্রাণায়ামের দ্বারা ও কাতরভাবে গুরু স্মরণের দ্বারা মনকে সংযত করা আমাদের সবার প্রথম কাজ। মন সংযত হলে আমাদের মধ্য হতে আমি-আমার বোধ ধাক্কা খেতে খেতে এক সময় না একসময় শান্ত হবেই আর তখন তুমি স্থিরে রূপান্তরিত হবে। তুমি স্থির হলে তখন আর তোমার মধ্যে আসক্তি, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, মায়া, মমতা ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না।

**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।**
**মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।১১**
**কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।**
**ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ**— পূর্বেও বারংবার এই কথা বলা হয়েছে যে, প্রাণকর্মরূপী কার্য্য বা অন্য কোনভাবে ঈশ্বরের উপাসনারূপ কার্য্য যাই করা হোক না কেন তা যেন সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য ভাবে হয়। কারণ আমরা এই প্রাণকর্ম করি কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গুলি দমন করে পরমার্থরূপী আত্মার সাথে মিলিত হয়ে চিরমুক্ত হয়ে এই আবর্ত্তনের হাত থেকে চিরকালের জন্য নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই মন যে সদাসর্বদা কালিমালিপ্ত হওয়ার জন্য উচাটন ক'রে, তা যদি কামনা বাসনা রূপে মনের মধ্যে থাকে তা হলে তার ভক্তি ও আকাঙ্ক্ষার জের ধরে সে সেই কামনা-বাসনা পূরণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তার জন্য সে যে কর্মফল তৈরী করে, তা হতে সে কোনদিন নিস্তার বা মুক্ত হতে পারে না। সেই জালের মধ্যে সর্বদা আরও বেশী বেশী করে জড়িয়ে পড়ে। তাই মুক্তি লাভ করার বাসনা, এই সকল বাসনার চাপে পড়ে একেবারে তলানিতে গিয়ে পড়ে। আর সরকারী অফিসে পড়ে থাকা ফাইলের মত তাও এক সময় পোকায় কেটে খেয়ে নেয়, তার হদিশ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তখন এই সকল জীবের মুখে একটা কথাই শোনা যায় — এই এত বছর ধরে তো ক্রিয়া করছি, কই কি হল, কিছুই তো হল না? এ জন্মে আমার আর হবে না, ঐ অমুকের হয়েছে, তারই হবে, আমার আর হবে না।

কই একবারও তো মনের মধ্যে সেই জেদ আসেনা যে, ওর হয়েছে আমার হবে না কেন? ওর শরীরে যা আছে আমারও তো তাই আছে, তবে আমার হবেনা কেন? হ্যাঁ তুমি হয়তো বলবে আধারের কথা, কিন্তু সেও তো তোমারই সৃষ্টি এবং তোমার দ্বারাই পুনরায় তা তৈরী হবে। আমরা মুখে বলি মানুষ হল অভ্যাসের দাস। কিন্তু যে অভ্যাস করার জন্য তোমাদের বলা হয়েছে এত বছর ধরে সেই অভ্যাস করে তা হলে তুমি কি করলে? শুধু চেয়েই গেলে, দিলে না কিছুই। গুরুদেব তোমাদের হাতে এক ঝোড়া করে মাটি দিয়েছেন, চাকা ঘুরিয়ে সরা, তার থেকে কলসী, তার থেকে জালা, তার থেকে কি করে গামলা করা যায়, তার চেষ্টা কর। কথায় আছে "তোমার চেষ্টাই তাঁর চেষ্টা, চেষ্টা করাই ঠিক।"

পূর্বে বহুবার আলোচিত হয়েছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলই আমাদের দেহের মধ্যে কিন্তু তবুও আমরা বুঝি না। প্রাণকর্ম ঠিক ঠিক করলে এ সব বোঝা যায়, না করলে বুঝব কি করে? কারণ ঐখানেই আমাদের যত অলসতা। প্রাণকর্মের দ্বারা মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র ছেড়ে যখন তুমি উর্দ্ধে অবস্থান করবে, তখন তুমি হবে গুণাতীত, আর এই ষট্‌চক্রের মধ্যে থাকলে তুমি গুণের অধীন হয়ে থাকবে। তাই ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার গতিরূপ বায়ুকে স্থিরে রূপান্তরিত করলে তবেই তুমি স্থির হবে। তা কঠোর পরিশ্রম করে সাধনা করলে তবেই সেই অবস্থা লাভ করা যায়। আর না করলে তা শুধু কথার কথা মাত্র বা পাঠ্য পুস্তকেই শোভা বর্ধন করে। আমরা মুখে বলি — "কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না"। কিন্তু তা কি আমরা মেনে চলি? না চলতে পারি? আরে! আগেই পিছিয়ে যাবার কি আছে? চলতে গেলেই আগে বসবে, তারপর হামাগুড়ি দেবে, তারপর দাঁড়াবে, পড়ে যাবে, আবার দাঁড়াবে, আবার পড়ে যাবে, তারপর গুটি গুটি করে হাঁটতে শিখবে, তারপর হাঁটায় সচলতা ও স্বাভাবিকতা আসবে, তারপর দৌড়াবে।

মানুষ আজ আকাশযানে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে। তা কি এক দিনের ব্যাপার? আকাশে ওড়বার জন্য পাখীর

মত ডানা লাগিয়ে উঁচু বাড়ী থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে প্রাণ হারিয়ে রক্ত ঝরিয়ে তবেই না Wright Brothers এর দ্বারা ওড়বার যান আবিষ্কৃত হল।

**চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।**
**তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।১৩**
**ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।**
**ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** পূর্বেই আমাদের দেহের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণের কথা আলোচিত হয়েছে; চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ হল সত্ত্ব গুণ প্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রধান, বৈশ্য রজস্তমগুণ প্রধান এবং শূদ্র তমোগুণ প্রধান। ভগবান এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন সত্য কিন্তু তিনি আসক্তি বা ইচ্ছাশূন্য হয়ে সকল কার্য্য করে থাকেন অর্থাৎ তিনি সকল কিছু চালনা করেন মাত্র, তার নিজস্ব সৃষ্টি বলে অপরের নিকট আমাদের মত দম্ভ বা অহংকার প্রকাশ করেন না।

এই সকল কর্মও তাঁর। এই কর্ম্মের মধ্যে থেকেও তিনি কর্মের মধ্যে লিপ্ত নন; কারণ তাঁর মধ্যে ইচ্ছাশক্তি নেই। তিনি হলেন স্থির-ব্রহ্ম পদবাচ্য, তাই আত্ম কর্মের দ্বারা এই দেহ-আমি যখন 'আমার আমি'কে জানতে পারে তিনি তখন আর কোন কর্মে আবদ্ধ হন না। কোন মায়ার প্ররোচনায় বা কোন মায়া জনিত জাল তাঁর মনকে মুগ্ধ বা মনের উপর মোহ বিস্তার লাভ করতে পারে না। তখন তিনি যেহেতু স্থির সেহেতু সদা সর্বদা সেই একই ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। তাই সাধক আত্ম কর্মের দ্বারা তুমি নিজেকে চেনো, তুমি নিজেকে জানো, আর যখনই তুমি নিজেকে জানতে পারবে, চিনতে পারবে তখন যেহেতু তোমার মধ্যে কোন আসক্তি থাকবে না, সেহেতু কোন কর্মফল আর রচিত হবে না, তার ফলে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে আর আবর্তনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে হবে না, তার ফলে মুক্তি তোমার নিশ্চিত জানবে। আর মুক্তি কি— তা হল আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, যা অব্যক্ত।

**এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।**
**কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্।।১৫**
**কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।**
**তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** নিষ্কাম ভাবে, নির্লিপ্ত ভাবে বর্তমানে কাজ করা, প্রায় আমরা ভুলে গেছি। পূর্বে তখন বহু মহাপুরুষের নাম আমরা শুনেছি; যেমনঃ— সাধক বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। তাঁরা প্রবল পরাক্রমে শত শত অত্যাচার অবিচার সহ্য করে, বহু সাধনা করে তবে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন। তাঁরা কিভাবে জীবন নির্বাহ করতেন তা তাঁদের জীবনী পড়ে আমরা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করি মাত্র কিন্তু তার গভীরে প্রবেশ করতে চাইনা। কারণ বর্তমানে আধুনিকতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নানারকম বিনোদন যে পরিমাণে বেড়ে উঠেছে তাতে সেই মহাপুরুষরা কেবল ইতিহাসের পাতায় মানায়, এই রকম এক বস্তু হয়ে গেছেন। এখন ঐ সকল বিনোদনের বস্তু ছেড়ে কেউ কি আর ঐ পাঠ্যপুস্তকের জীবনীর সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরতে সময় পাবে? ভাবতেও আমাদের ইচ্ছা করে না যে তাঁরা কত কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য নয়; সারা জগৎ ও জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য।

আমিও সেই পথে চলে একবার চেষ্টা করে দেখিনা, যাতে আমিও ঈশ্বরের সঙ্গে মিশতে পারি। সেইরূপ পরিশ্রম আমিও করে দেখি না। কিন্তু তা না করে, তার চেয়ে নগ্ন-মহিলার নাচ দেখতে, নগ্ন-মহিলা ও পুরুষের মৈথুনকার্য্যরূপ ছায়াচিত্র দেখলে আমাদের মনোমুগ্ধকর কাজ হবে।

তাই দিনে দিনে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, মনের মধ্যে চঞ্চলতা ইত্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। যা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বেড়েছে, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে ও হতে থাকবে। যা দেহের বস্তু তা তো একসময় প্রকৃতির নিয়মে শেষ হয়ে যাবে, তা তো ফিরে আসবে না। আর বর্তমানে আমরা যারা

এই সবে মত্ত, ভবিষ্যতে বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শেষকালে আমরাই হব প্রবল আফশোষের কারণ ও লাঞ্ছনার পাত্র। কারণ আমারই ছেলে-মেয়েরা তখন আমাদের থেকে আরও আসক্ত হয়ে উঠবে। তাই পূর্বের মুনি-ঋষিরা সনাতন ব্রহ্মের পথে চলে, কোনরূপ আসক্তিপূর্ণ কার্যে লিপ্ত না হয়ে, তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন— যার লেজ ধরে বর্তমানে বহু সম্প্রদায় সেই পথে এগোনোর চেষ্টা করছেন। আবার কিছু কিছু সম্প্রদায় বা ব্যক্তি আছেন যারা সেই মহাপুরুষের নাম ভাঙিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন বা চাকুরী শেষ হয়ে যাওয়ার পর অবসর জীবন কাটানোর জন্য পূর্বের কিছু যোগসূত্রতার খাতিরে মিথ্যা কথার বিজ্ঞাপন সাজিয়ে দোকান খুলে বসেছেন, আর তিনি হয়েছেন সেই দোকানের গুরুরূপী বিক্রেতা বা কর্ত্তা।

গুরু তৈরী হয়না, গুরু তৈরী হয়ে আসেন। আর পূর্ববর্ত্তী গুরু তাঁর পরবর্তী গুরু কে হবেন তা ঘোষণা করে দিয়ে যান। স্বয়ং গুরুশক্তিরূপী আধার কর্তৃক পরবর্তী গুরুশক্তিরূপী আধার ঘোষিত হওয়া হল আসল গুরু পরম্পরা। তাঁর আদেশ মেনে পথ চলা হল সঠিক পথ চলা বা সনাতন পথে এগোনো। তাই মোক্ষ লাভ করতে হলে তোমাকেও পূর্বে সাধু-মহাত্মারা যে কার্য্য করে এসেছেন, তাই করতে হবে। কর্ম কি? আর অকর্ম কি? তা তো আমরা জানিনা। আমাদের সারা দিনে এত কাজের মধ্যে তাহলে কোনটা কর্ম, আর কোনটা কর্ম নয় বা অকর্ম, তা আমরা বুঝব কি করে?

**কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।**
**অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।।১৭**
**কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।**
**স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।।১৮**
**যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।**
**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** কর্ম নামক এই সত্তাটি প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়। যথাঃ- কর্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। এই তিন প্রকারের কর্ম্ম গগন গহ্বরের মধ্যে

অবস্থান করছে, যার মধ্যে প্রবেশ করা কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। সাধক প্রাণকর্ম্মের দ্বারা মন স্থির করে কূটস্থ গহ্বরের মধ্যে ঐ মনকে প্রবেশ করাতে পারলে সে ধর্মের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই যেহেতু কর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই গগন গহ্বরের মধ্যে সাধক ধর্ম ও কর্ম সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারে, সেহেতু বলা হয়েছে "ধর্মস্য তত্ত্ব নিহিত গুহায়াম্"। যে মহাজন ভেদজ্ঞান-শূন্য হয়ে এই তত্ত্ব জানতে সক্ষম হন, তিনিই হন প্রকৃত কর্মজ্ঞানী। আর ঐ জ্ঞানই হল প্রকৃত কর্ম।

আর ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যুক্ত হয়ে কর্ম্ম করা হল অকর্ম্ম। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে এই নিষ্কাম প্রাণকর্ম করেন তিনি প্রাণকর্মের স্থিরাবস্থারূপ পরব্রহ্মের সহিত সদাসর্বদা যুক্ত হয়ে থাকেন। এইভাবে অনাসক্ত অবস্থা বা সকল কর্ম করে পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়ে থাকার অবস্থার নামই বিকর্ম অর্থাৎ যখন কর্ম্মের বিশেষত্ব সম্পর্কে নিগূঢ় তত্ত্ব সাধক জানতে সক্ষম হন তখন তা হল বিকর্ম অবস্থা। কর্ম্ম করে যদি মনের মধ্যে কোনরূপ কামনার ভাব না জন্মায় তখন সঙ্কল্প-বিকল্প থাকে না, তখন সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ কাজ করেও আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং ঐ জ্ঞানেও সাধন-পূর্বক মনের মধ্যে যে সকল সঙ্কল্প-বিকল্প দানা বেধে উঠেছিল তা আত্ম-জ্ঞানরূপ ঐ জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় এবং কর্মের অতীতাবস্থারূপে স্থির ব্রহ্মে তখন সাধক রূপান্তরিত হন। এইরূপ জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ কর্মীকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত বলা হয়।

**ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।**
**কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০**
**নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্ব পরিগ্রহঃ।**
**শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১**
**যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।**
**সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ**— এই ভাবেই এইসকল জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের আত্মানন্দে মত্ত থেকে কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হন। দেহকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ দেহ

মৃত্তিকা কর্ষণ করার প্রক্রিয়া বা প্রাণায়ামরূপ যোগকৌশল বা গুরুপ্রদত্ত এবং গুরুদেবের আদেশানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সেই কর্ম্মকেই 'কেবল' কর্ম বলে। এই কর্ম্ম নিষ্ঠার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলে তবেই মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অহংকারশূন্যতা আসে অর্থাৎ তখন অহং প্রকাশিত হয় না। তখন সবকিছু করেও তার থেকে দূরে থাকা যায়, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় না। সেই অবস্থার উপর বসে এই প্রাণকর্ম সঠিকভাবে করলে বা এই কেবলকর্ম সঠিকভাবে করলে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে পদপ্রাপ্তি ঘটে সেই অবস্থাকে কেবলাবস্থা বলা হয়।

তখন মন অপর কোনরূপ আর বাহ্যিক অবলম্বন খুঁজতে চায় না, নিজের বাঁচার জন্য কোনরকম আশ্রয় খুঁজতে চায় না। সদাসর্বদা নিজেও আত্মানন্দে বিলীন হয়ে তাঁতে বিভোর হয়ে থাকতে চান, নিজের মনকে সদা সর্বদা কূটস্থের মধ্যে স্থির করে রাখতে চান। তখন তিনি কামনা ও বাসনা রহিত হন। কোনরূপ পাপ আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তখন আর তিনি ইচ্ছার দাস হয়ে থাকেন না, তখন তাঁর ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁর মনোমধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ থাকে না। তিনি ভেদজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন অর্থাৎ নিজের মধ্যে আর শত্রু দেখলে হিংসার মনোভাবের বা মিত্র দেখলে হর্ষের মনোভাব ইত্যাদির প্রকাশ পায় না। তখন তিনি সকল ব্যক্তির প্রতি সমজ্ঞান প্রকাশ করেন। আবার কোনকিছু প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য বস্তুর জন্য তার মনে চঞ্চলতার প্রকাশ না পাওয়ার জন্য কোন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হলে বা না হলেও তাঁর মনোমধ্যে কোনরূপ রেখাপাত করে না। তাঁর ব্রহ্ম দর্শন হওয়ার দরুণ তিনি সকল কিছুর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান করে সমদর্শী হন।

**গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।**
**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্ম করা এই কথার অর্থ হল এই যে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ সাংসারিক এবং মায়ামোহরূপ সকল বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়ে নিজেকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে তার অনুষ্ঠানরূপ যজ্ঞ করা।

তাই সাধক, এইভাবে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যা শ্রীশ্রী সদ্‌গুরুর আদেশানুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠানগুলি করে গেলে তার নিজের মধ্যে যখন কৈবল্যাবস্থারূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন সকল কিছু ব্রহ্মস্বরূপ সমদর্শন হওয়ার জন্য তার পূর্বের সকল কর্মফল ঐ ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ প্রাপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর মনের মধ্যে ইচ্ছারহিত অবস্থার জন্য কোনরূপ কামনা-বাসনার উদয় হবে না, এর ফলে কর্মের আগম-নিগমরূপ কোন কার্য্য আর সাধিত হবে না। আর তখন কর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হবে।

**ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।**
**ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমরা সাধারণতঃ দেখেছি যে ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ পৈতেধারী ব্যক্তিগণ খাবারের আগে খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত করে ওঁ প্রাণায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ইত্যাদি জলদ্বারা আচমন ও গন্ডুষ করে খাদ্য গ্রহণ করেন, যদিও বর্তমানে কাঁটা চামচের যুগে তা নেই বললেই চলে। যাক, পূর্বালোচনায় ফিরে আসি। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ঐ সকল ব্যক্তি পঞ্চ বায়ুরূপ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান এই পঞ্চ বায়ুকে খাদ্য অর্পণ করে নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু এইরূপ খাদ্যপ্রদান কার্যের কোন মানেই হয় না, কারণ চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করে ব্রহ্মে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে সাধক নিজ বায়ুকে প্রাণকর্মের দ্বারা জঠরাগ্নিরূপ নাভিতে, প্রাণবায়ুরূপ ঘৃতের দ্বারা প্রাণকর্মরূপ যজ্ঞ করে প্রকৃত গন্ডুষ করে থাকে। সুতরাং এটাই হল প্রকৃত গন্ডুষ পদবাচ্য।

আমাদের নাভি হল সমান বায়ুর স্থান এবং সেখানে ব্রহ্মাগ্নি থাকার জন্য প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান পঞ্চ বায়ুর দ্বারা সমাহিত। প্রাণকর্মরূপ হোমের দ্বারা এই পঞ্চবায়ুকে স্থির বায়ুতে রূপান্তরিত করে ঐ প্রাণকে বা বায়ুকে পরব্রহ্মের পথে অগ্রসর করতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে এই অর্পণ যজ্ঞ বা হোমরূপ প্রাণকর্ম করা হয়ে থাকে।

বাইরে প্রতিমার সম্মুখে বা শুভানুষ্ঠানে কাঠ, ঘি, ফুল, বেলপাতা

ইত্যাদি দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে যে হোমানুষ্ঠান করা হয়ে থাকে তা প্রকৃত হোম পদবাচ্য নহে।

সাধক তার সাধন পথে বা মোক্ষে অগ্রসর হবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে বা অর্পণ করে শ্রীগুরুর চরণে। সেই উৎসর্গ বা অর্পণ ক্রিয়াই হল এই উপরিউক্ত আলোচ্যটি। শ্রীগুরুর নির্দেশ মত ব্রহ্মকর্ম করে যিনি ব্রহ্মকর্মে সমাধি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

**দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।**
**ব্রহ্মাগ্নাবাপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫**
**শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।**
**শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।২৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** শ্রীগুরুদেবের নির্দেশানুসারে 'ওঁ'কার বায়ুরূপী পূরক রেচক রূপ, সাধক যে দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাকে খেচরীসাধন বলে; অর্থাৎ দৈব বা দিব্ শব্দে আকাশ— সাধকগণ পূরকের দ্বারা প্রতিটি চক্রে 'ওঁ'কার মন্ত্র স্মরণ করে শ্বাস আজ্ঞাচক্রে নিয়ে যায়, এবং এই আজ্ঞাচক্রই হল আকাশ— অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের স্থানে বসে এই বায়ুকে স্থির বায়ুতে রূপান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে বসে 'ওঁ'কাররূপী মন্ত্র স্মরণের দ্বারা অথবা শ্রীগুরুর নির্দেশানুযায়ী মন্ত্র স্মরণের দ্বারা স্থির বায়ুর যে ক্রিয়া করে সেই ক্রিয়াকে খেচরী সাধন বলে।

এরপর ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ করা রূপ উপায়ের দ্বারা অর্থাৎ নাভিচক্রে বা মণিপুর চক্রে ঐ 'ওঁ'কার বায়ুরূপ কাজের দ্বারা স্থির বায়ুকে রেচকের দ্বারা যে ত্যাগের বিধি আছে, যা শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ সম্পাদন করবার অবস্থা।

এর জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সংযম করবার বা ইন্দ্রিয়কে সংযত করবার তীব্র প্রচেষ্টা। আজ্ঞাচক্রে সর্বদা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাখলে বায়ু মনের মধ্যে চঞ্চল যে ভাবের সৃষ্টি করে তা বাধাপ্রাপ্ত হবার জন্য ধীরে ধীরে স্থিরের দিকে

রূপান্তরিত হতে থাকে। তখন মনের মধ্যে ইচ্ছা-শক্তির প্রকাশ না পাবার জন্য শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল মনের মধ্যে বা দেহের মধ্যে কোন চাহিদা সৃষ্টি করতে পারেনা—তখন ব্রহ্মাগ্নিরূপ নাভিতে শ্বাসকে নিক্ষেপ করবার দরুণ ইন্দ্রিয়রূপ ঐ সকল বায়ু দগ্ধ হয়ে যায়। তার ফলে তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও চক্ষুর দ্বারা কোন মনোমুগ্ধকর সুন্দর বস্তু বা দৃশ্য দেখেও মনের মধ্যে কোনরূপ রেখাপাত করে না। আবার নানা রকম মনোমুগ্ধকর আওয়াজ শোনা সত্ত্বেও শ্রবণেন্দ্রিয়ে তা গ্রাহ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয় না, সদা সর্বদা আজ্ঞাচক্রে মন ও দৃষ্টি স্থির থাকবার জন্য কর্ণে ও দর্শনে সদা সর্বদা 'ওঁ'কার ধ্বনিত ও দর্শিত হতে থাকে। তখন সাধক যোগী বলে পরিগণিত হন।

**সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।**
**আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭**
**দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।**
**স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** যোগীগণ এইভাবে 'ওঁ'কাররূপী প্রাণ কর্মের দ্বারা কূটস্থচৈতন্যে প্রাণকে স্থির করে রাখতে পারলে তাদের আত্মজ্যোতির দর্শন হয় এবং ঐ জ্যোতির মধ্যে মন বা লক্ষ্য স্থির করে রাখতে পারলে ঐ আত্মজ্যোতিরূপ যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। যার ফলে প্রাণের আগম-নিগমরূপ ক্রিয়া আর থাকে না। তার ফলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল রহিত হয়ে যজ্ঞেতে স্থির হতে সহায়তা করে।

সাধকদের এই বর্তমান প্রাণকে স্থির প্রাণে রূপান্তরিত, বা আত্মব্রহ্মে রূপান্তরিত করবার কার্য্যই এই যজ্ঞ রূপ সাধন করা। এই যজ্ঞরূপ সাধনাকে দ্রব্যযজ্ঞ বলা হয়। কূটস্থে দৃষ্টি সংযোগ করে কার্য্য করবার ফলে প্রাণের মধ্যে কোনরূপ চঞ্চলতার প্রকাশ নিরোধ হবার ফলে ঐ অবস্থায় বসে শ্রীগুরুপ্রদত্ত শ্রী 'ওঁ'কাররূপী কার্য্যের দ্বারা প্রাণ কর্মের সাধনারূপ যজ্ঞ করাকে তপোযোগও বলা হয়ে থাকে।

প্রাণের যে বৃহৎ ব্যাপকত্ব তা ব্রহ্ম পদবাচ্য আর এই যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মকে জানার নামই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বা তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বা দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হলেন স্বয়ং শ্রীগুরুদেব। এই সকল কার্য্য সাধকের একার পক্ষে করা কখনই সম্ভবপর নয়। তার জন্য একান্তভাবে আবশ্যক শ্রীগুরুর সান্নিধ্য ও তাঁর অসীম কৃপা।

**অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।**
**প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।**
**অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।।২৯**
**সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।**
**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট এই প্রাণক্রিয়ার ফলে প্রাণবায়ু অপান বায়ুতে অর্থাৎ পূরক; এবং অপান বায়ু প্রাণ বায়ুতে মিলিত হয় অর্থাৎ রেচক। এই ক্রিয়া করতে করতে কেবল কুম্ভকের দ্বারা শ্বাস স্থির হয়ে যায়। এই প্রাণ কর্মকেই তখন 'কেবল' কর্ম কহে। তখন প্রাণ ও অপান বায়ু স্থিরে রূপান্তরিত হবার ফলে তাদের স্বতঃরোধ হয়ে যায়, তখন প্রাণ প্রাণায়াম পরায়ণরূপী হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযত করে অর্থাৎ পূরকের দ্বারা শ্বাস আজ্ঞাচক্রে টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানে স্থির হয়ে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করে 'ওঁ'কার মন্ত্রের দ্বারা বায়ুকে স্থির বায়ুতে রূপান্তরিত করে পুনরায় রেচকের দ্বারা নাভিমূলস্থ ব্রহ্মাগ্নিতে ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করে থাকেন, এটা—স্থির প্রাণের ক্রিয়া, যা গুরু কৃপার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এইভাবে উপরিউক্ত কার্য্যের দ্বারা ক্রিয়ারূপযজ্ঞ যজ্ঞকারীগণ করলে কর্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন। এঁকেই সনাতন ব্রহ্ম বলা হয়। এই যজ্ঞের অবশেষে যে অমৃতের উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হবার ফলে যে অবস্থা সাধক প্রাপ্ত হয়, তা ভোজনের ফলে অর্থাৎ সেই কার্য্যে শ্রীগুরুর কৃপার দ্বারা উত্তীর্ণ হতে পারলে তিনি নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকেন। এই নিষ্পাপ অবস্থা প্রাপ্তিরূপ অবস্থার অর্থ হল ইচ্ছাশূন্য অবস্থা।

**নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১**
**এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।**
**কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২**

**তাৎপর্য্যঃ—** বর্তমান জগৎ তমোগুণের স্থানে ধাবিত হয়েছে বলে এখনকার মানুষদের মনের মধ্যে পশুবৃত্তি আশ্রয় করছে। এর ফলে কোন উন্নততর কার্য্য, যা তাদের দেবলোকরূপ পরলোকে চির আসন স্থাপন করবার মত, কোনভাবেই পরিলক্ষিত হয় না। বাহ্যিক সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, লালসা ও কামের বশবর্তী হয়ে তারা কেবল অধঃ দেশেই নিপতিত হয়ে চলছে— যারা অবশেষে পাঁকে পরিণত হবে। আর সেখানে কোনরকম পদ্মফুল জন্মাবে না বা জন্মালেও সেই পঙ্কের দুর্গন্ধাবিষ্ট হয়ে সেই পঙ্কেই মিলিত হবে। সেই পঙ্ক থেকে পদ্ম সঞ্চয়ন করবার মত লোক থাকবে না। আমাদের এই শরীরে তেজস্তত্ত্ব দ্বারা শ্বাস কার্য্য বা প্রাণ বায়ুর কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে বলেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি। তাই শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জুনকে জাগরিত করাই হল মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। একজনের মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল একটাই, তা হল সাধনার দ্বারা নিজের দেহক্ষেত্রকে দেবক্ষেত্রে পরিণত করা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে চির মুক্তি লাভ করা; কিন্তু সেইরূপ ভাবনা করবার অবকাশ বা সময় কোনটিই আমাদের মত হাতপাওয়ালা পশুদের নেই। প্রাণ কর্মের দ্বারা প্রাণবায়ুকে সঠিক ভাবে বা উত্তমভাবে কাজে লাগিয়ে প্রাণকর্মে যে উত্তীর্ণ হতে পারে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বলে পবিগণিত হয়।

এই প্রাণকর্মের ক্রিয়া হল ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মজ্ঞান যার লাভ হয়েছে এমন ব্রহ্মজ্ঞই সদ্‌গুরু হিসাবে পরিগণিত হন। এই বিদ্যা সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা। এই বিদ্যা কোন বই পড়ে বা শুনে লাভ করবার যোগ্য নয়। কারোর নিকট হতে সঠিক ভাবে কি পন্থায় তা পাওয়া যাবে এবং কি ভাবে তা করতে হবে, পরবর্তী কার্য্যের জন্য আমি উপযুক্ত হয়েছি কিনা তা জানা বা বুঝা দুই-ই সম্ভবপর নয়। একমাত্র সদ্‌গুরুই পারেন সঠিক পথ দেখাতে এবং তিনিই জানেন কার উপযুক্ততা কতটুকু। তাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই

দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। এই কার্য্য করবার সোপানগুলি যদি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে এবং তা পড়ে অর্জন করা যেত, তাহলে সকলেই আলোকময় হয়ে উঠতে পারত, বাহ্যিক বস্তুর পিছনে ধাববান হত না বা আসল নকল বিচার করবার উদ্দেশ্যে কে বড় কে ছোট তার সেইরূপ কোনভাবের উদয় মনোমধ্যে হত না, সমদর্শন ভাব তাদের মধ্যে প্রতীয়মান হত। আর গুরুকৃপা শব্দটি কর্পূরের ন্যায় উবে যেত। একমাত্র গুরুর দ্বারাই, তাঁর দেখানো নির্দিষ্ট পথে চলেই সর্বতোভাবে তাঁর অসীম কৃপাদৃষ্টির দ্বারাই সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর সাধনায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সাধকের তাঁর বা শ্রীগুরুর প্রতি তীব্র বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা কার্য্য করে ফললাভ করতে সমর্থ হলেও হতে পারে।

যেহেতু ইহা গুরুবক্তগম্য এবং এই ক্রিয়া করবার কালে মন প্রাণ স্থির হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাও যেহেতু অব্যক্ত অবস্থা, তার ফলে ইহা লেখনীতে কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না। তাই এই কার্য্য হল আত্মকর্ম। এই আত্মকর্ম করে স্থিতিলাভ হলে তুমি আত্মাকে জানতে পারবে এবং তা সম্পূর্ণ তোমার নিজ বোধগম্য এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মস্থিতি লাভ করলে তুমি সাধনায় উত্তীর্ণ হবে, সেটাও সম্পূর্ণ তোমার নিজ বোধগম্য এবং যার পিছনে সম্পূর্ণটাই থাকে সদ্‌গুরুর অশেষ কৃপার উপর নির্ভরতা।

**শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।**
**সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩**
**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।**
**উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** আলোকের সমুদ্র হতে যখন কেউ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই তার জন্ম হয়, অর্থাৎ তীব্র জ্ঞানের আলোকমঞ্জরীরূপ পরমাত্মা হতে চ্যুত হয়ে আত্মা যখন কোন দেহখাঁচার মধ্যে ঘটস্থ হন, তখন মায়া- মোহরূপ অন্ধকার তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। তখন সেই অন্ধকার হতে তার পূর্বেকার আলোকমঞ্জরী, যেখান থেকে সে আগত তা আর দর্শিত হয় না। যতই তার

বয়স বাড়তে থাকে ততই সে অন্ধকাররূপ অজ্ঞানতার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে।

আত্ম কর্ম হল— যে চোখের দ্বারা আমরা সেই আলোকমঞ্জরী দেখতে পাচ্ছি না, যে অজ্ঞানতা আমাদের চোখ থাকতেও অন্ধকার করে রেখেছে, সদ্‌গুরু কৃপা-পরবশ হয়ে তৃতীয নয়ন খুলে দিলে সেই আলোকমঞ্জরী দর্শিত হয়। এই অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের পথে গিয়ে প্রাণ-কর্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা জ্ঞানযজ্ঞ। তার মাধ্যমে আমাদের অজ্ঞানতার আড়াল ধীরে ধীরে সরে গিয়ে জ্ঞানের আলো ধীরে ধীরে প্রস্ফুটি ত হয়। জ্ঞান অর্জনেতেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। যখন মনের মধ্যে স্থিতি ভাব এসে জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন প্রাণের চঞ্চল ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন প্রাণ স্থির হয়ে যায়।

পূর্বের ন্যায় পুনরায় বলা হচ্ছে এই ক্রিয়া সম্পূর্ণ গুরুমুখী; নত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করে তবেই এই ক্রিয়া আরম্ভ করা যায়। তাঁকে নমস্কার করতে হবে কি করে? **'ওঁ'কাব ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাসকে মস্তকে ধারণ করে, মস্তক ভূমিতে নত করে তাঁর চরণ যুগল স্মরণ করে, শ্বাস মস্তক হতে নাভিতে আহুতি দিয়ে এই 'ওঁ'কার ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কার করে প্রণাম করা হয়ে থাকে। এই প্রণামই হল প্রকৃত প্রণাম পদবাচ্য।** এর পর হল গুরুর সেবা। গুরুর সেবা কি? **যে কর্ম্ম তিনি তোমাকে প্রদান করেছেন, সেই কর্ম্ম বিধি পূর্বক প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণের দ্বারা, আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে করলে তাঁর সেবা করা বোঝায়। কারণ গুরু কোন দেহের মধ্যে আবদ্ধ নন। ইনি সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন, তিনি হলেন আত্মাস্বরূপ।** তাই আত্মার কর্ম বা প্রাণকর্ম বিধিপূর্বক করলে প্রকৃত গুরুসেবা করা হয়। এই প্রাণকর্মরূপ কর্ম করতে করতে নানারূপ প্রশ্ন উদয় হয়ে থাকে, নানারূপ দর্শন ও শ্রবণ হয়ে থাকে। এই দর্শন ও শ্রবণের হেতু নানারূপ প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। প্রাণকর্ম সঠিক রূপে করলে, কোন প্রশ্নের উদয় হলে তার উত্তরও এরই মধ্য হতে উৎপন্ন হয়ে প্রশ্নের মীমাংসা করে দেয়। এইরূপ বিধিপূর্বক ক্রিয়া করতে পারলে কর্মের অতীতাবস্থায় তুমি স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করবে। তার জন্য দেহধারী গুরুদেবের উপদেশ একান্ত প্রয়োজন।

**যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।**
**যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫**
**অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।**
**সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** "শ্বেত, পীত ও কালো করে সৃজিলে মানবে"। কূটস্থচৈতন্যেই হল সকল তেজের সমাহার এবং সকল চক্র এই কূটস্থচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত। তাই— এই কূটস্থচৈতন্যে মন স্থির করে রাখতে পারলে যে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তার ফলে দেহের মধ্যে কোনরূপ মোহ্ আর উৎপন্ন হয় না। তখন এই মোহ-তিমির হতে চিরমুক্তির পথ সাধক দর্শন করতে থাকবে, এবং তার ফলে পঞ্চতত্ত্বের গণ্ডি ছিন্ন করে, সাধক জ্ঞানালোকে অবস্থান করবে।

আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে পারলে তমোগুণের নাশ হয়ে যায়, তার ফলে তুমি যদি পাপীও হও অথবা তুমি যদি অন্য সকল পাপী ব্যক্তিদের থেকেও অধিক পাপী হও, তা হলেও আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হবার দরুণ যে সত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হবে সেই জ্ঞান সাগরে সেই পাপ চিরধৌত হয়ে যাবে।

**যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।**
**জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭**
**ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।**
**তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** আগুন যেমন সকল দাহ্য বস্তুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে, তেমনি আত্মকর্মের ফলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তার মাধ্যমে সকল পাপ ভস্ম হয়ে যায়; এবং প্রাণের স্থিতি হওয়ায় প্রাণের আগম-নিগমরূপ ক্রিয়া আর হয় না।

আত্মজ্ঞান হল সম্পূর্ণ নিজ বোধগম্য এবং পুনরায় বল্‌ছি, তা গুরূপদিষ্ট। খাবার যেমন অপরে রন্ধন করে তোমার খিদে পেলে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করে, গুরুও সেইরূপ কার্য্য কিভাবে করতে হবে, কোন পথে

চলতে হবে, তা সবকিছু তিনি বলে, দেখিয়ে তোমাকে ধরিয়ে দেবেন। খাবার সম্মুখে দেখে যেমন তা হাত দিয়ে মুখে তুলে তোমাকেই নিতে হবে এবং তা চর্বণ করে তোমাকেই উদরস্থ করতে হবে, সেইরূপ এই আত্মকর্ম সম্পূর্ণ তোমাকেই করতে হবে, গুরুদেবের উপদেশমত এবং চর্বণরূপী প্রাণ অপানের ঘর্ষণের দ্বারা প্রাণবায়ুকে উদররূপী আজ্ঞাচক্রে তোমাকেই স্থির করে জ্ঞানলাভ করতে হবে, অর্থাৎ এই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করবার জিনিস, শ্রীগুরু ব্যতীত কেউ তোমার মধ্যে এই জ্ঞানের সঞ্চার লাভ করাতে পারবে না।

**শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।**
**জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯**
**অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।**
**নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মকর্ম করতে হলে গুরুবাক্যে অচল, অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করতে হবে। এইভাবে বিশ্বাসশীল ও শ্রদ্ধাবান ও গুরুবাক্য পালনে তৎপর ব্যক্তিরাই সদ্‌গুরুর উপদেশমত যত্নশীল হয়ে এই কর্ম করলে, কর্মের অতীতাবস্থায় তারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে থাকে এবং তার পর জ্ঞান লাভ করে শান্তি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হন। যাঁরা গুরুবাক্যে অধিক যত্নশীল হন তাঁদের শান্তিপ্রাপ্তি দ্রুত ঘটে।

কিন্তু আমাদের মন সর্বদাই সংশয়িত, তাই কামনা বাসনারূপ কোন স্বার্থ ভ্রষ্ট হতে আমরা চাই না। তার ফলে আমরা ইহলোকেও সুখ পাই না এবং পরলোকেও সুখ পাই না, কিন্তু তবুও আমরা সুখের পিছনে ছুটি। মনের মধ্যে হাজারও সংশয় থাকার জন্য শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-বাক্য আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারিনা; তার ফলে আমাদের মনের মধ্যে শ্রদ্ধাও উৎপন্ন হয় না, বিশ্বাসও উৎপন্ন হয় না, ভক্তিও উৎপন্ন হয় না। সেইহেতু আমরা শ্রীগুরুর উপদেশকে না বুঝবার জন্য তাঁকে অগ্রাহ্য করে বসি। ফলে আমরা ধর্ম পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। সংশয়মুক্ত না হবার জন্য কোনভাবেই আমরা মনকে স্থির করতে পারি না। একটি মিটল, অপরটি আবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ফলে ইহলোক

ও পরলোকে কোন ভাবেই আর আমরা তার সন্ধান পাই না।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নতি ধনঞ্জয়।।৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।৪২

**ইতি জ্ঞানযোগঃ।**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে যোগ দুই প্রকার, এক হল কর্মযোগ দুই হল জ্ঞানযোগ। আত্মকর্ম দ্বারা প্রাণের বহিরাগমনকে অন্তর্মুখী করে ঈড়া ও পিঙ্গলার সহিত মিলনের দ্বারা এই কর্মযোগ হয়ে থাকে। তারপর আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে পারলে যে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় তা জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞান লাভের জন্য যোগের দ্বারা কর্ম করলে কর্ম সকল আত্মায় অর্পিত হয়, তখন মনের মধ্যে নিরোধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যিনি এই প্রকার সকল কর্ম পরমাত্মায় সমর্পণ করেছেন তিনিই একমাত্র প্রত্যক্ষভাবে আত্মজ্ঞান বিদিত হওয়ায় তিনি সকল সংশয় ছেদন করে ফলাকাঙ্ক্ষামুক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

মনের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হলেই তখন সকল কিছু সংশয় হতে সে মুক্ত হতে পারে। সকল সংশয়কে জ্ঞানরূপ যোগ কর্মের দ্বারা ছেদন করে তবেই সে অগ্রসর হতে পারে। এইভাবে শরীরস্থ অসুর ভাবের সহিত দৈব ভাবের যুদ্ধের দ্বারা সাধন সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তৎদ্বারা অসুররূপী চঞ্চল প্রাণকে হত বল করে, সাধক দেবভাব রূপী আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করতে পারলে আত্মতত্ত্ব জেনে জ্ঞানীরপদে অধিষ্ঠিত হবেন।

**।। ইতি জ্ঞানযোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

## কর্ম সংন্যাস যোগ

**সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।**
**যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১**
**সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।**
**তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** উপরিউক্ত শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে কর্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কর্মসংন্যাস অর্থে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

এখানে কর্মত্যাগ করতে বলা হচ্ছে আবার পূর্বে কর্মে-যুক্ত হতে বলা হয়েছে এই অংশে একটি কথা অপরটির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এখানে এই দুইটিই মোক্ষপ্রদ, কারণ পূর্বে কর্মের অনুষ্ঠান সকল বিধিপূর্বক করতে পারলে মন যখন ইড়া ও পিঙ্গলার মিলনের ফলে সুষুম্নামার্গে গিয়ে স্থিতি প্রাপ্ত হয় তখন মনের মধ্যে একটি স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয় যা অচঞ্চল। তখন মনের মধ্যে কোনরূপ দোলা আর দেয় না, কোন বিষয়ের উপর কামনা-বাসনা রূপ কোন আশা-আকাঙ্ক্ষারূপী ইচ্ছা আর উৎপীড়ন করে না, মনকে তখন আর কোনরূপ আসক্তি জর্জরিত করতে পারে না। সেই অবস্থাই হল কর্মসংন্যাস বা কর্মত্যাগের অবস্থা। তাই পূর্বে কর্মযোগের দ্বারা যোগের সকল অনুষ্ঠান করে মন যখন কূটস্থচৈতন্যরূপী আত্মনারায়ণে নিমজ্জিত হয় তখন মনের মধ্যে আসক্তি সকল ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, তখন আসে কর্মত্যাগের অবস্থা। তাই বলা হয়েছে যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্মযোগের সঠিক সম্পাদনের মাধ্যমে কর্মত্যাগ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য অবস্থা আসে।

**জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।**
**নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩**

**সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।**
**একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** গেরুয়া বসন ধারণ করে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পড়ে মুখে শ্রীহরি শ্রীহরি নাম করে মাথা মুন্ডন করে সংসার ত্যাগ করে বনে-বাদাড়ে বা পাহাড় পর্বতে বা মন্দির আশ্রমে গিয়ে থাকলে সহজেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মুখে যতই হরিনামের বুলি আওড়াই না কেন সঠিকভাবে সংসার আসক্তি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না। আবার সংসারের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের উপাসনা করে বা আত্মক্রিয়ারূপ অনুষ্ঠান করেও আমরা সংসার-আসক্তি হতে মুক্ত হতে পারি না। এর কারণ আমরা সঠিক ভাবে বিধিসম্মত উপায়ে মন প্রাণ দিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারি না। যে ব্যক্তি কর্ম অনুষ্ঠানের সময় মনের মধ্যে কোন রকম কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ ভাব রাখেন না, ও আকাঙ্ক্ষা ভাবও রাখেন না, সেই ব্যক্তি সকল কর্মেই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগী। সেই ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী পদবাচ্য। যিনি রাগ, বিষয়অনুরাগ, দ্বেষ ইত্যাদির থেকে কর্মের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই সংসার-আসক্তিরূপ মোহ-মায়া যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ কখনই পৃথক নয়। যে সকল ব্যক্তি কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে পৃথক করে দেখেন তাঁরা জ্ঞানী বা পন্ডিত পদবাচ্য নন। কর্মের দ্বারা বা কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের মধ্যে যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ মনের চঞ্চলতার রোধ হয়ে, যখন স্থিতিলাভ হয় এবং সেই অবস্থায় যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে তাই জ্ঞানযোগ — অর্থাৎ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুই পৃথক নয়, এই দুয়েরই ফলে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে এবং উভয়ের দ্বারা সুষুম্না মার্গরূপী ব্রহ্মমার্গে স্থিতিপ্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটলে তবেই অহং নাশ হয় এবং তার মাধ্যমেই কর্মত্যাগ আপনা-আপনি হয়ে থাকে, কারণ তিনি যখন আর কোন কিছুর মধ্যে আবদ্ধ নন সকল কিছুর মধ্যে নিজেকে দেখেন বা সকল কিছুকে নিজের মধ্যে দেখেন তখন তিনি হন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। যেহেতু তাঁকে আসক্তি জর্জরিত করে না এবং সকল কিছুকে ঈশ্বরের পদতলে অর্পণ করেন এবং নিজে ঈশ্বর হন তাই

তখন তাঁর সকল কর্ম্ম অনিচ্ছার ইচ্ছায় হয়ে থাকে বলে নূতন করে কর্মফল সৃষ্ট হয় না।

**যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।**
**একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫**
**সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।**
**যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আপনাকে আপনি জেনে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তা কর্ম্মযোগের মাধ্যমেই এসে থাকে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুষুম্নামার্গ ধরে শ্বাসের গতিকে চালনা করে তার মাধ্যমে কর্ম করে স্থির হতে না পারলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তি না হলে জ্ঞানের স্ফূরণ হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তি হল, স্থিরে রূপান্তরিত হওয়া। স্থির না হতে পারলে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। যতক্ষণ শ্বাস দুই নাসিকা দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে, দেওয়া নেওয়া রূপী কামনা-বাসনা ততক্ষণ মনের মধ্যে বিচরণ করবে। স্থিরে রূপান্তরিত হলে শ্বাস আর দুই নাসিকা দিয়ে প্রবাহিত হয় না। এর ফলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে। এই জ্ঞানেব প্রকাশেরই আর এক নাম হল সাংখ্য, আর যে কর্মের মাধ্যমে এর প্রকাশ হল তাকে যোগ বলে, কারণ তখন অহং জ্ঞান লোপ পায়। আর অহং জ্ঞান শূন্য হয়ে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনরূপ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি। আর এই স্থিতিপ্রাপ্তি-রূপ অবস্থাকে বলা হয় যোগাবস্থা। তাই সাংখ্য এবং যোগাবস্থা দুই এক।

কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাসী হওয়া অসম্ভব জানবে। বায়ুস্থির করতে না পারলে, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যখন বায়ু স্থির হবে এবং আর কোন কথা কইবার ইচ্ছা থাকবে না, সদাসর্বদা আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকবে সেই অবস্থাই হল প্রকৃত সন্ন্যাসীর অবস্থা। এইরূপ অবস্থা যে ব্যক্তির হয়ে থাকে সেই ব্যক্তি হলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী পদবাচ্য।

**যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।**
**সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭**

**নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।**
**পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮**
**প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।**
**ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯**

**তাৎপর্য্য ঃ**—যিনি সাম্যাবস্থারূপ যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থির এবং বিশেষ শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন, তিনিই জিতেন্দ্রিয় পদবাচ্য, কারণ শুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ আত্মা বা প্রাণ। এই প্রাণের চঞ্চলাবস্থাকে যিনি কর্মের দ্বারা বশে এনেছেন বা তাঁর উপর জয় লাভ করেছেন তিনিই হলেন বিশুদ্ধচিত্ত বা জিতেন্দ্রিয়। সকল জীবের মধ্যে এক আত্মাই বর্তমান, তিনি আমাতেও রয়েছেন, এইরূপ জ্ঞান যার মধ্যে হয়েছে কোনরূপ কর্মফল জনিত আসক্তি তাকে জর্জরিত করতে পারে না।

কর্ম করেও যেহেতু তিনি কর্মের সহিত যুক্ত নন তাই তিনি কর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়ে আছেন, সেরূপ ব্যক্তির কর্মের উপর ফলের আশা থাকে না। ফলের আশা তার মনের মধ্যে রেখাপাত না করার জন্যে কোন কর্মে তিনি আবর্তিত হন না। তার ফলে (ব্রহ্মের স্থিতিপ্রাপ্তির ফলে) যে শান্তি উৎপন্ন হয়, সেই শান্তিই তার প্রাপ্য হয়। আর অপর সকলের মন যেহেতু ব্রহ্মের সহিত অযুক্ত, তাই কামনা-বাসনা রূপ যাঁতাকলের মধ্যে নিজে সর্বদা পেষিত হতে থাকে। তার ফলে সংসার চিন্তা, পুত্রের চিন্তা, কন্যার চিন্তা, আরও অনেক চিন্তা তাকে চেপে ধরে বসে এবং এই সকল কামনা-বাসনা- রূপ কর্মফলে আসক্ত হওয়ার জন্য তার প্রতিনিয়ত বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হওয়া তো বহু দূরের কথা, আরও বেশী বেশী করে তাতে জড়িয়ে পড়ে। তার ফলে তা থেকে উৎপন্ন তাপে সে সদা জ্বলতেই থাকে, তা থেকে কোনদিন নিষ্কৃতি পায় না। তখন তার জীবনে 'শান্তি' এই কথাটি সুদূর পরাহত। যে সকল ব্যক্তির মন সর্বদা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়ে আছে, সে সকল ব্যক্তির মন সর্বদা কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থিত থাকে, এর ফলে তিনি কখনও ইন্দ্রিয়াসক্ত রূপ কার্য করেন না। তখন তাঁর মনের মধ্যে এই ভাব বিদিত হয় যে, আমি কিছু

করি না, আবার সকলই আমার দ্বারা সংকলিত হয়।

**ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।**
**লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।১০**
**কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।**
**যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।১১**
**যুক্ত কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।**
**অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ফলাকাঙ্ক্ষা রূপ আসক্তি জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের থাকে না বলে তাঁরা কর্ম করেও সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃগুণরূপ পাপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন না। যেমন পদ্মপাতায় জল রাখলে সেই পাতার জল পাতার সঙ্গে যুক্ত হয় না, সেরূপ। কারণ যেহেতু তিনি গুণাতীত অবস্থা লাভ করেছেন তাঁর সব কর্মই ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

যোগীগণের মূল উদ্দেশ্য হল কর্মের আসক্তি রূপ বন্ধনে যুক্ত না হয়ে নিজের মন ও বুদ্ধির চঞ্চলাবস্থা রূপ সংযুক্তি-পরিকল্পনা ত্যাগ করে চঞ্চল আত্মারূপ মন ও বুদ্ধি কিভাবে স্থির ও পবিত্র করা যায় তার জন্যে আত্মকর্ম করা।৮

কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার জন্য তাঁহারা সর্বদা ঐশ্বরিক শান্তি প্রাপ্ত হন।

**সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।**
**নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্।।১৩**
**ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।**
**ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।১৪**
**নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।**
**অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** চঞ্চল মনের অর্ন্তগত ব্যক্তিরা সর্বদা ইন্দ্রিয়াসক্ত অর্থাৎ

দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, নাসিকার গমনাগমনের দুটি পথ, মুখগহ্বর, লিঙ্গ ও পায়ু বা গুহ্যদ্বার নিয়ে এই সকল ব্যক্তিরা ভোজনে, গমনে, দর্শনে, শ্রবণে সর্বদা ইচ্ছা রেখে চলে, এর জন্য তাদের মনের মধ্যে কাম অর্থাৎ কামনা হেতু নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হয় কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণ এই সকল ইন্দ্রিয়ের হাত হতে নিস্তার পাবার জন্য বা জয়লাভ করার জন্য এই সকল ইন্দ্রিয়গণ তার বশে থাকে। এর ফলে কাম বা কামনা হেতু কোনরূপ দুঃখ বা শোক ও হর্ষ বা আনন্দ তাঁর মনকে টলাতে পারে না।

(সব কিছুই ব্রহ্ম নামক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ এই জগৎ ঐ শক্তির দ্বারা চালিত হয়। ঈশ্বর জীব দেহের মধ্যে কর্তৃত্বরূপ কোন ভাবের সৃষ্টি করেন নাই। মানবজীবদেহ অহং ভাবাপন্ন হয়ে এইরূপ নিজ ভাবের সৃষ্টি করেছে এবং বদ্ধ বা বন্দী হয়ে আছে; প্রাণ কর্ম করে নিজের আত্মোন্নতির মাধ্যমে অভীষ্ট পথ ধরে চলার কথা যিনি বলেছেন, তা হতে কি ফল প্রাপ্ত হবে সেইরূপ কোন কর্মের কথা তিনি বলেন না বা সৃষ্টি করেন নাই। আমরা বা জীবরূপী মানবরা নিজ-ভাবাপন্ন হয়ে ফলের আশায় কার্য করে সর্বদা আপন চিন্তায় ব্যস্ত থেকে অশান্তি ভোগ করছি।)

প্রত্যেক জীবদেহে জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে, যা অজ্ঞানতারূপ কালো মেঘের দ্বারা ঢাকা আছে। তার ফলে দর্শনে বা শ্রবণের দ্বারা বা আঘ্রাণের দ্বারা কোন কিছু বস্তুর উপর মোহিত হয়ে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে অজ্ঞানতারূপ অবস্থা জীবকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আত্মকর্মরূপ প্রাণকর্মের দ্বারা জীব সেই অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার মনোমধ্য হতে দূরীভূত করে, তখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং কালো মেঘাচ্ছন্ন রূপ আকাশে সূর্যের আলো প্রকটিত হয়।

**জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।**
**তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬**
**তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।**
**গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭**
**বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।**
**শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জ্ঞানাগ্নি বা আত্মজ্ঞান প্রজ্বলিত হলে অজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ আত্মজ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশ করে এবং তমসা নাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় থাকবার ফলে ব্রহ্মভাব প্রকাশ হয়ে থাকে।

এই পরমাত্মায় তাদের মন লেগে থাকার জন্য যুক্ত বুদ্ধিশালী বা আত্ম বিষয়িণী বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন চঞ্চল মন স্থির হয়ে পরমাত্মায় লেগে থাকে। তার ফলে জ্ঞানের দ্বারা তমোগুণনাশরূপ পাপের ক্ষয় হয়। এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্মরূপ মুক্তাবস্থা লাভ হয়। পরমাত্মাই হল পরম গতি, এই অবস্থায় জন্ম-মৃত্যু হতে সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তারপর, তার ইচ্ছার হেতু জীবের উদ্ধারার্থে সে যদি জন্মগ্রহণ করে তা হলেও সে সর্বদা সেই পরমাত্মাতে লেগে থাকে, সেই অবস্থায় কোন কর্ম করলেও তার কোন কর্মফল প্রাপ্তি হয় না, আবার মৃত্যুর পরও সে ঐ একই অবস্থায় লেগে থাকে— অর্থাৎ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবার পর যদি কেউ দেহত্যাগ করেন তবুও তিনি সেই পরমাত্মাতে লেগে থাকেন। পুনরায় যদি তিনি দেহধারণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে দেহধারণ করবার পরও তিনি পরমাত্মাতেই লেগে থাকেন এবং জীব উদ্ধারের পর তাঁর ইচ্ছানুসারে যদি তিনি দেহত্যাগ করেন, তবুও তিনি পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হন না অর্থাৎ একবার মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি সদাসর্বদা সেই চৈতন্যে বিভোর হয়ে থাকেন। দেহধারণ বা দেহত্যাগের পর সেই সদাসর্বদা চৈতন্য অবস্থা থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না, তার ফলে তাঁর সকল কর্মই বিলীন হয়ে থাকে, তাঁর কর্মফল বলে কিছুই থাকে না।

এই সকল ব্যক্তিগণ বা জ্ঞানীগণ সর্বদাই সমদর্শী হন এবং তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুকুর, গরু, ছাগল এদের মধ্যে সেই একই আত্মা রয়েছে বলে ভেদ করেন না। এই অবস্থায় দেহ-আমি 'আমার-আমি'তে মিলিত হয়।

**ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।**
**নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯**
**ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।**
**স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০**

**বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।**
**স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ঈশ্বরকে পাবার জন্য বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হবার জন্য সংসার, আত্মীয়, পরিজন পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না। প্রাণকর্মের মাধ্যমে নিজের মনকে উর্ধ্বগতি রূপ বা সাম্যভাবরূপ অবস্থায় স্থিতিপ্রাপ্ত করতে পারলে আত্মসমজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় এবং পরব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্ত হবার ফলে মন সকল কিছুর মধ্যে সমভাব রূপ বা অবস্থা দেখতে পায়। স্থির সাম্যাবস্থার অবস্থায় যাদের মন অবস্থিত, তাঁরা ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হন।

যিনি ব্রহ্মে লেগে থাকেন তিনি জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুকে জয় করেন, তার ফলে মৃত দেহের মত তাঁর দেহ বা মন পরিণত হয়; কেউ মরে গেলে যেমন কেঁদে তাঁর আত্মীয়রা তাঁর নিকট শোক প্রকাশ করেন কিন্তু তিনি অবিচল থাকেন, তাঁর মনে বা দেহে কোনরূপ রেখাপাত করে না, সেইরূপ আনন্দ বা দুঃখে ব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনেও কোনরূপ রেখাপাত করে না।

যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম-দর্শন হয়েছে, তাঁদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সকল কোন বস্তুতে আসক্ত থাকে না অর্থাৎ তিনি সর্বদা অক্ষয় সুখরূপ আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন।

**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।**
**আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২**
**শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।**
**কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩**
**যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।**
**স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভুতোঽধিগচ্ছতি।।২৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মানবদেহ কেবল ভোজনরসনায় ও বিষয়জনিত সুখাদিতে লালায়িত। ভোজনরসনায় যে সকল ব্যক্তি সুখ অনুভব করেন, পরে

পীড়ার যন্ত্রণা তার কাছে দুঃখকর হয়ে দাঁড়ায়। আবার বিষয়জনিত বস্তু যে সব ব্যক্তির কাছে সুখের, পরবর্তীকালে ঐ সকল বস্তুই তাকে প্রকৃত সুখ প্রদান না করে দুঃখই দেয়। তাই বলা যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত বস্তু সকলই দুঃখকর, তাই হে মানব, তুমি আসক্তি শূন্য হয়ে, বিষয়জনিত সুখে মত্ত না হয়ে আত্মক্রিয়া বা আত্মদর্শনের পথে চালিত হও।

যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মকে চিনেছেন এবং তাঁর সহিত লেগে থাকেন, সে সকল ব্যক্তির কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করবার ক্ষমতা অনায়াসেই হয়ে থাকে।

যিনি এইরূপ ব্যক্তি তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ এইরূপ সামান্য সুখে তিনি মুগ্ধ নহেন, আত্মাতেই যাঁর অমোঘ বিশ্বাস এবং সদাসর্বদা তিনি তাতেই মগ্ন থাকতে ভালোবাসেন এবং আত্মাতেই মনোনিবেশরূপ দৃষ্টি যাঁর রয়েছে সেই ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে আগম-নিগম-রূপ অবস্থারহিত হয়।

**লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।**
**ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫**
**কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।**
**অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।২৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** যে সকল ব্যক্তির ইচ্ছারূপ পাপ ক্ষয় হয়েছে এবং আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে মনের মধ্য হতে দ্বিধা, সংশয় দূর হয়েছে এবং মনকে স্ববশে রাখতে যাঁরা সমর্থ হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি সংযত চিত্ত বলে পরিগণিত হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

কাম ক্রোধাদি রিপুগণের ভোগ এই সকল ব্যক্তির না থাকায় তাঁরা বিশেষ রূপে মুক্ত। তার ফলে দেহান্তে তাঁরা মুক্ত, দেহ বর্তমানেও তাঁরা মুক্ত

— অর্থাৎ দেহ ধারণ ও দেহ ত্যাগ উভয় অবস্থাতেই তাঁরা ক্লেশহীন অর্থাৎ জন্মমৃত্যু সবই তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছায় পরিচালিত হয়।

**স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।**
**প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।২৭**
**যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।**
**বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮**
**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।**
**সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৯**

**তাৎপর্য্য ঃ**— সাধারণ মনুষ্য জীব তার জীবদ্দশাতে থেকে প্রাণকর্মের দ্বারা তিনিও এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন। দু-ভ্রূর মাঝখানে নিজের মনকে বহিঃচিন্তা মুক্ত করে বসাতে পারলে মনের মধ্যে বহু প্রশ্নের সমাধান আপনা-আপনি হয়ে যায়। এইরূপে ভ্রূর মধ্যস্থলে সর্বদা দৃষ্টি রেখে যিনি নাসাভ্যন্তরচারী হন অর্থাৎ প্রাণবায়ু কেবল নাকের মধ্যেই সঞ্চরণ করে অর্থাৎ বাইরের বায়ু বাইরে এবং ভিতরের বায়ু ভিতরে অবস্থান করে, এইরূপ যাঁর অবস্থা সেইরূপ ব্যক্তি নাসাভ্যন্তরচারী পদবাচ্য, এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি ভয় ও ক্রোধশূন্য হন, ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং তিনি সদাই মুক্ত। এইরূপে প্রাণকর্ম করে প্রাণযজ্ঞের তপস্যা করে যিনি নিজেকে প্রাণ-যজ্ঞের ব্রহ্মাগ্নিতে নিজে আহুতি দিতে পারেন তিনিই স্থির প্রাণরূপী জ্ঞানী বা জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর সমদর্শন ভাব জেগে ওঠে এবং মনে শান্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।

**।। ইতি কর্মসংন্যাস যোগঃ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

## অভ্যাস-যোগ

**অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।**
**স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।১**
**যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।**
**ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ক্রিয়াযোগ বিদ্যা হল সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা। ক্রিয়াযোগ বিদ্যায় উন্নীত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুকরণের বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব কূটস্থচৈতন্যে তাঁর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করিয়ে দেন। এর পর তিনি যে কর্ম্ম দেখিয়ে দেন তার কোনরূপ ফলের প্রত্যাশা না করে তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের যতটুকু বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আছে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। সেই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রতিটা কথা পালন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়, এটাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলে জানবে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম, কারণ তাতে কোন ফলের কামনা থাকে না। ফলাকাঙ্ক্ষার কামনা না করে নিষ্কামভাবে যিনি এই কার্য্য যা গুরুদেবের দ্বারা অর্পিত, তা পালন করেন, তিনিই হলেন সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী যোগী পদবাচ্য। অলসতা ও ফলের আশা মনের মধ্যে রেখে যে সকল ব্যক্তি কার্য্য করেন, তাদের কার্য্য সঠিক বলে পরিগণিত হয় না, এর ফলে গুরুদেবের উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ইত্যাদি মুখের কথাই রয়ে যায়। এটা মনে অন্যরূপ ফল প্রকাশ করে, যার ফলে শ্রীগুরুদেবের প্রতিটি কার্য্যের মধ্যে তাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়। সেই সকল ব্যক্তি অক্রিয় ব্যক্তি পদবাচ্য। এই সকল ব্যক্তি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন। এরা সিনেমা, থিয়েটারে অভিনীত সন্ন্যাসী বা যোগী পদবাচ্য।

সন্ন্যাসী বা যোগী দুই-ই এক বলে জানবে, কারণ আমাদের দেহে যে

পাঁচটি চক্র আছে তা পাণ্ডব বলে সম্বোধিত হয়। পাণ্ড কথার অর্থ হল গমন করা 'উ' হল শ্বেত, পীত ও কালো বর্ণ। পান্ডু কথার অর্থ হল জ্যোতির্ময় আত্মা যা প্রাণশক্তি হতে উৎপন্ন। এই তেজস্তত্ত্বকে প্রাণকর্মের দ্বারা জাগ্রত করে কর্মত্যাগ অবস্থারূপ স্থির অবস্থায় নিজেকে উন্নীত করতে পারলে মনের মধ্য হতে সংকল্প বিকল্প বা কামনা-বাসনা সব আপনা হতে চলে যায়। এই অবস্থায় যিনি পৌঁছাতে পারেন তিনিই হলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। এই অবস্থায় কোনরূপ সংকল্প-বিকল্প বা কামনা-বাসনা থাকে না। কর্মত্যাগের অবস্থা এই সময় প্রাপ্ত হবার জন্য কর্ম করেও তিনি যেহেতু কর্মে লিপ্ত হন না সেহেতু এটা যোগের অবস্থাও বটে, কারণ কর্মের অতীতাবস্থায় যে স্থির সাম্যভাব পরিলক্ষিত হয় তা-ই যোগের অবস্থা। এই কারণ যে ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা হয়ে থাকে তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী পদবাচ্য, আর যার হয় না তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী পদবাচ্য নন।

**আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।**
**যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩**
**যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।**
**সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণকর্ম করে এই প্রাণকর্মের মাধ্যমে নিজের কর্মফল পুনরায় গঠন করতে না চেয়ে যিনি এই প্রাণকর্মের দ্বারা নিজে যোগের উচ্চ শিখরে অবস্থান করতে চান, তাকে অবশ্যই কর্ম করতে হবে। এই কর্ম করবার সময় মনের মধ্যে কোনরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনা রাখলে চলবে না। প্রাণবায়ুর সাম্যাবস্থারূপ যে যোগ তাতে উত্তীর্ণ হতে হলে অবশ্যই তাকে ঈড়া- পিঙ্গলার মিলন রূপ বায়ুর যে সাম্যাবস্থা সেই অবস্থারূপ যৌগিক ক্রিয়া করতে হবেই হবে। এর জন্য তাকে ক্রিয়ার শেষে পরাবস্থায় বসে দুই ভ্রূর মধ্যদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেখানে মন নিবদ্ধ করে কূটস্থচৈতন্যে আত্মনারায়ণের রূপ পরিকল্পনা করে সেই আনন্দে মনকে নিমজ্জিত করবার অভ্যাস করতে হবে, এবং শ্রীগুরুদেব যে সংখ্যক ক্রিয়া প্রদান করবেন তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন

সঠিক সংখ্যক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে, এরপর ধীরে ধীরে তাঁর নির্দেশে ক্রিয়া বাড়িয়ে যাবে। এইভাবে মনঃসংযোগ করে ক্রিয়া করতে থাকলে প্রাণায়াম অধিক করতে এবং সর্বদা তার মধ্যে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করবে, তখন এইভাবে ক্রিয়ার পর পরাবস্থায় থেকে মনকে শান্ত করতে পারলে ২০৭৩৬টি উত্তম প্রাণায়ামে ক্রিয়ার পরাবস্থায় সমাধি হয়ে থাকে।

এই অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি যোগারূঢ় পদবাচ্য। পর্বতের শিখরে অবস্থান করতে হলে যেমন পর্বতের পাদদেশ থেকে উপরে আরোহণ করে তারপর শিখরে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়, সেইরূপ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থায় বা যোগারূঢ় অবস্থায় অবস্থান করতে হলে, প্রাণকর্মের অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কর্ম না করলে কর্মের অতীতাবস্থার অতীতাবস্থায় পৌঁছানো যায় না। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি অবস্থান করতে পারেন তাঁর আর কোনকিছু বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন তিনি কামনা-বাসনা বা সর্বসংকল্প ত্যাগী হওয়ার জন্য সর্বদা ব্রহ্মে বিরাজ করেন।

এই প্রাণকর্ম অভ্যাস সঠিক ভাবে মন প্রাণ দিয়ে করতে পারলে এই সকল কামনা, বাসনা বা সংকল্প আপনা হতেই দূরীভূত হয়ে যায়। তাই এই প্রাণকর্ম করবার জন্য চাই জেদ, চাই আন্তরিকতা, চাই ভালবাসা, ত্যাগ ও বিশ্বাস। তবেই তুমি ঐ পর্বত শিখরে কাল পূর্ণ হলে অবস্থান করতে সক্ষম হবে।

**উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।**
**আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫**
**বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।**
**অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** একমাত্র প্রাণকর্মের মাধ্যমেই প্রাণ স্থির হয়, অর্থাৎ মন স্থির হয়। মনের মধ্যে তখন সংকল্প-বিকল্প থাকে না। আমাদের দেহের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অবিরত চলছে, শ্বাস-প্রশ্বাস অবিরত চলছে বলে মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হয় এবং ইচ্ছাশক্তি জেগে ওঠে এবং তার থেকে কামনা, বাসনা, মায়া, মমতা, কৌটিল্য, অহংকার এর মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সকল

বেড়া জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমরা সংসার জ্বালায় সর্বদা জ্বলতে থাকি। এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাই না। পথ দেখিয়ে দিলেও সেই পথ দিয়ে হাঁটতে চাই না। কারণ আমরা ক্ষণিকের আনন্দ, ক্ষণিকের ভালোবাসা যা কৃত্রিমতা দিয়ে গড়া, তার প্রতি আমরা বেশী প্রলুব্ধ। তাই আসল সোনাকে ফেলে নকল সোনার পিছনে আমরা দিনরাত ছুটে মরি। নকল সোনা চক্চক্ করে বটে কিন্তু কিছুদিন পর তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। সেইরূপ সংসার শুরু করবার পূর্বে মনে আনন্দ লাগে বটে কিন্তু সময়ের গতির ফেরে তা বিষতুল্য, কন্টকাকীর্ণ, জ্বালা-জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। তাই এক কথায় বলতে পারি, আমরা মুক্তি চাই, শান্তি চাই বলে চীৎকার করি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা অশান্তি ও আবদ্ধ হয়ে থাকতে বিশেষ ভালবাসি। একটি নকল সোনা মরচে পড়ে গেলে আমরা অপর একটি সোনার পিছনে ধাওয়া করি, আসল সোনা কিনবার জন্য চেষ্টা করি না, কারণ তা সহজলভ্য নয় এবং ব্যয়সাধ্য, যার মূল্য অনেক, তা আদায় করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই আমরা পিছিয়ে আসি কারণ আমরা অলস, আমরা অকৃতজ্ঞ, আমরা নিষ্ঠুর, আমরা শুধু চাই প্রচুর, কিন্তু দিই না কিছুই।

যদি এই বন্ধন হতে সত্যি মুক্ত হতে চাও তাহলে কোমর বাঁধ, বেঁধে নিজে তৈরী হও, শ্বাস-প্রশ্বাস যা বয়ে যাচ্ছে তাকে ধরার চেষ্টা কর, আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি রেখে শ্বাসকে সেইখানে ধরে রাখার চেষ্টা কর। এইভাবে প্রতিটা শ্বাসকে গোণ যা নির্গত হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, ঐ আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি রেখে স্থির ভাবে চোখ বন্ধ করে এইভাবে কাজ কর। "শুক্রধাতু ভবেৎ প্রাণঃ'— নিজের মনকে ঐ আজ্ঞাচক্রে ধরে রাখতে সমর্থ হলে ঊর্দ্ধরেতা বলে তুমি নিজেকে জানবে। প্রাণের চঞ্চল গতিকে আটকানোর জন্য বা রোধ করবার জন্য শুক্র বা প্রাণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুক্র-ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অধিক মহামুদ্রা করলে। শরীরস্থ শুক্রস্খলন বা বীর্যত্যাগ করা উচিত নয়। তবে যদি কেউ আমি বীর্যত্যাগ করিনা বলে প্রকাশ করেন, তাহলে তা মিথ্যে বলে জানবে। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় তা আপনা-আপনি স্খলিত হয়ে যায়। এছাড়া বিবাহিত ব্যক্তিগণ যারা এই প্রাণকর্ম করছেন তাদেরও স্ত্রী সম্ভোগাদি ত্যাগ করে পৃথকভাবে থাকার

কথা এখানে বলা হয়নি। কারণ এতে মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কমে না। তাই অন্ততঃ মাসে দু'বার স্ত্রী গমন করা ভাল, এতে মন কিছুটা শান্ত থাকে। কামের বশবর্তী হয়ে অধিক পরিমাণে বীর্যস্খলন না করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। মনের মধ্যে কামের চিন্তা আসলে এর পূর্বেই মনকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে শ্বাসের স্মরণ করবে। আজ্ঞাচক্র ছেড়ে মন নীচে নামলেই সেই কবল হতে তুমি নিস্তার পারে না। তাই মন আজ্ঞাচক্রে রাখলে তুমি তোমার বন্ধু আর মন আজ্ঞাচক্রের নীচে রাখলে তুমি তোমার শত্রু।

প্রাণ চঞ্চল হয়ে মন উপাধি ধারণ করেছে। মনের মধ্যে যখনই কোন অশান্তিকর চিন্তা দানা বাঁধবে তখনই মনকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে শ্বাসের স্মরণ করবে। যিনি এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা মনকে বশীভূত করেছেন, তিনি জিতাত্মা এবং সেই হল স্থির-প্রাণরূপ-আত্মার বন্ধু। মন স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার সংস্পর্শে আসলে তখন চঞ্চল আত্মার গতি ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হয়। যাঁরা মন আজ্ঞাচক্রে ধরে রাখতে সক্ষম হন না, তারা অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল আত্মা, তারা কেবল দুষ্কর্মই সাধন করে, যেমনঃ— অপরের দোষ দেখা, অপরের বস্তুর উপর লোভ করা, অপরের কিভাবে ক্ষতি সাধন করা যায় তার চেষ্টা করা ইত্যাদি। সুতরাং চঞ্চল আত্মা নিজেই নিজের শত্রু, কারণ কর্মফল খন্ডন হওয়ার চেয়ে তা দিনে দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে আজ্ঞাচক্রে মন রাখলে মন স্থির হয়ে যাবে; অন্য কোন চিন্তা আসবে না, এটা ভেবো না, কারণ লক্ষ্য স্থির না হওয়ার জন্য আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি থাকে না। তার ফলে মন ওখানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হয়। আজ্ঞাচক্র থেকে মন সরে যাবে তা আবার ওখানে নিয়ে যেতে হবে, ক্রমান্বয়ে চেষ্টা চাই, এখানেই চাই জেদ। ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করতে করতে তার কাছে প্রাণের আকুতি জানাতে জানাতে এক সময় তা ঠিক স্থির হবেই হবে। আমাদের মন নদীর ধারার মত। উৎপত্তিস্থল থেকে যখন নদী প্রবাহিত হয় তখন বাঁধনহারা চঞ্চল হরিণের মত লাফিয়ে বেড়ায়, নেচে বেড়ায়। পাথরের উপর কঠিন আঘাত খেতে খেতে বা বাধা পেতে পেতে তবে তার গতি স্থির হয় বা ঢিমে হয়। তেমনি কঠিন পাষাণের মত জেদ দিয়ে তার উপর কশাঘাত করতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বাধা দিতে দিতে

তার উন্মত্ততা শান্ত হওয়ার দিকে এগোবে।

**জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।**
**শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭**
**জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।**
**যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।।৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** পূর্ব শ্লোকে যেরূপ আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে মনকে আজ্ঞাচক্রে বা কূটস্থে (কূটস্থেই সকল চক্রের প্রকাশ ঘটে থাকে, বা কূটস্থের সঙ্গেই সকল চক্র যুক্ত, তাই তাতে মন রাখলেই আজ্ঞাচক্রে মন রাখা হয়।) মন রাখতে হবে। মনের মধ্যে সকল দুঃখ, সকল শোক, চিন্তা, ভাবনা ঐ কূটস্থেই প্রকাশকর, অপরের নিকট বললে তুমি উপহাসের পাত্র হবে। ঐ কূটস্থ মধ্য হতে স্বয়ং গুরুদেব তুমি কি করবে, কোন পথে চলতে হবে, সব বলে দেবেন। কাঁদলে কূটস্থের কাছেই কাঁদ, হাসলে কূটস্থের কাছে আনন্দ প্রকাশ কর। এইভাবে মনকে চক্রের মধ্যে অবস্থান করাতে পারলে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদি তোমার মনকে নাড়া দিতে পারবে না। ক্রিয়া করবার সময় বা প্রাণকর্ম করবার সময় ঐ কূটস্থেই মন রেখে চক্র স্মরণ কর। তা হলেই তুমি চক্র ধরতে পারবে এবং তার অবস্থান বুঝতে পারবে এবং তুমি কূটস্থে দেখতেও পারবে। এইভাবে ধীরে ধীরে তোমার মন যখন কূটস্থকে জানারূপ জ্ঞানদ্বারা এবং কূটস্থের ঊর্দ্ধে জানারূপ অব্যক্ত বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হবে, তখন তুমি তৃপ্তাত্মা বলে বিদিত হবে। এইরূপ ভাবেই জিতেন্দ্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হবে, এইরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন বলে তিনি যুক্তযোগী পদবাচ্য। কারণ কূটস্থই ব্রহ্ম-স্বরূপ।

**সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।**
**সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯**
**যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।**
**একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।১০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** কূটস্থের ঊর্দ্ধে মন স্থির হলে অর্থাৎ ঐ অব্যক্ত বিজ্ঞান জানতে পারলে মনের মধ্যে শত্রু, মিত্র, সাধু-অসাধু, পাপ- পুণ্য ইত্যাদির মধ্যে সেই একই আত্মা পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ 'ঘট্ ঘট্ মে বিরাজে রাম' এই ভাব প্রকাশিত হয়।

প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই হল মন। এইজন্য মনকে চিত্ত বলে। প্রাণের মধ্যে মনের চঞ্চলতা হ্রাস হলে মনও স্থির হয়, এইভাবে প্রাণ-স্থির যাঁর হয়েছে তিনিই সংযতচিত্ত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হন। এইজন্য এইসকল ব্যক্তিরা একান্তে থাকতে বা একান্তে থেকে সর্বদা কূটস্থের সঙ্গে নিজের মনকে লাগিয়ে রেখে, আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকতে ভালবাসেন।

**শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।**
**নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।১১**
**তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।**
**উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমরা মহাপুরুষদের বা ঈশ্বরের মূর্তিতে বা ছবিতে দেখেছি যে কুশাসনের উপর ব্যাঘ্রচর্ম, তার উপর রেশমের আসন পেতে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। 'কুশাসন' অর্থাৎ পৃথিবীর উপর শয়ন করা যা আমাদের দেহস্থিত মূলাধারচক্র। ব্যাঘ্রচর্ম অর্থে স্বাধিষ্ঠান যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। রেশমের আসন অর্থাৎ 'চৈল' যা তেজ উৎপাদক, অর্থাৎ 'মণিপুর'। 'অনাহত' অর্থাৎ দেহের মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চেও নয়, আবার নিম্নেও নয়। উপরিউক্ত রূপ ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসে 'হঠ' যোগ সাধনের মাধ্যমে (হ অর্থাৎ সূর্য্য, ঠ অর্থাৎ চন্দ্র) ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত বায়ুকে স্থির করে প্রাণক্রিয়া দ্বারা চিত্তনিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে। এটাই চিত্তশুদ্ধিরূপ অবস্থা। এটা কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়। উপরিউক্ত মহাপুরুষদের যে আসন করে বসে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থার কথা বলা হয়েছে, এটাই তার প্রকৃত অর্থ।

ব্রহ্মমার্গের জ্ঞানলাভ হওয়ার পর এই আসনে বসে প্রাণকর্ম করা

যায়। যা গুরুবক্তৃগম্য।

**সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।**
**সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩**
**প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।**
**মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।।১৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণকর্ম করতে হলে সর্বদা শিবনেত্রের মত বসে দু'ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে সর্বদা মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত লক্ষ্য করে চল। এর ফলে মনের মধ্য হতে চিন্তারূপ ভয় ও আরও অনেক বহির্চিন্তা দূরীভূত হয় এবং মনে প্রশান্তি প্রাপ্তি হয়। প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ ব্রহ্মের প্রকাশ ষট্চক্রের ক্রিয়া বা প্রাণকর্মের দ্বারাই বায়ু স্থির হতে পারে। ষট্চক্রের ক্রিয়া করে যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর জীবন-যাপনের জন্য তিনি যে কার্য্য করে থাকেন তাই হল ব্রহ্মচর্য্য। আতপ চালের ভাত খেলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হলে স্থির প্রাণের ক্রিয়া করা আবশ্যক।

**যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।**
**শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।।১৫**
**নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।**
**ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।।১৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** ষট্চক্ররূপ গাণ্ডীবের উপর 'ওঁ'কাররূপী শর নিক্ষেপের দ্বারা এই প্রাণকর্ম করতে হয়। একাগ্রতা, আন্তরিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির দ্বারা যিনি এইরূপ কার্য্য করতে পারেন তিনি চঞ্চল মনকে ধীরে ধীরে কাবু করতে পারেন। এই প্রাণকর্মের দ্বারাই স্থিরতার প্রাপ্তি ঘটে। এর মাধ্যমে মন সংযত হয়, এই অবস্থা যার লাভ হয় তিনি কর্মের অতীতাবস্থায় থেকে আত্মানন্দে পরম শান্তি পান।

(প্রাণকর্ম করতে হলে বা শুরু করার পূর্বে মনের মধ্যে কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তবেই এই কর্মে পদার্পণ করা উচিত। এই

কার্য্যের জন্য নিষ্ঠা বিশেষ দরকার, কোন কার্যের সহিত অর্থাৎ বহিঃকার্যের সহিত যা জটিলতা সৃষ্টি করে, তা করা উচিত নয়। লোভ সংবরণ করা উচিত। বাক্ সংযম করা উচিত। অলসতা পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক ভোজন করা উচিত নয়। অধিক নিদ্রাপিপাসু হওয়া উচিত নয়। অনাহারে দিন যাপন করা উচিত নয়। নিদ্রা ত্যাগ করাও উচিত নয়। ভোজন করবার সময় পেটে চারভাগের তিনভাগ খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করা উচিত, বাকি একভাগ খালি রাখা উচিত। অলসতার মাধ্যমে নিদ্রা এসে থাকে। একদিনে তিন থেকে চার ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত)

প্রাণকর্ম যেহেতু সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা সেহেতু প্রাণকর্ম গ্রহণ করার পর দেহ কুটিরের মধ্যে যে প্রাণরূপী গুরু সর্বদা রয়েছেন তাঁর স্মরণ করা একান্ত দরকার। সংসার আসক্ত জীব প্রাণকর্ম করতে আসলে তাদের সংসারের অত্যন্ত আসক্তির জন্য প্রাণকর্ম হয় না। একদিকে সামাল দিতে গেলে অন্যদিকে ভেঙ্গে যায়। এইভাবে সারিবদ্ধ ভাবে একের পর এক বাধা এসে তাদের জর্জরিত করে তোলে এবং নিত্য নতুন আসক্তির ফলে তারা একের পর এক সংসাররূপ মায়াজালে বদ্ধ হয়ে আকুল কান্নায় কাঁদে কিন্তু তার ঐ কান্না সাংসারিক জীবরা শোনেন না বরং তার উপর অধিক করে চাপিয়ে দেন।

তাই জীব নিজের মনকে সংযত করবার জন্য চেষ্টা কর। কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি বর্জন করবার জন্য নিজের মনের মধ্য হতে জেদের প্রকাশ ঘটাও। শ্রীগুরুর পদতলে নিজের আকুতি বা প্রার্থনা জানাও। কাঁদলে, তাঁর কাছে কাঁদো, কারণ তিনিই তোমার দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে জানালে তিনি নিশ্চিত শুনতে পাবেন এবং সাড়াও দেবেন। সংসার আসক্তি ত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গিয়ে জীবন-যাপন করা। সংসারের মধ্যে থেকে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম পালন করে নিজের ইন্দ্রিয় আসক্তি পরিবর্জন করে প্রাণকর্ম করা। এর পরে তুমি তোমার সকল কিছু গুরুদেবের কাছে জানালে তিনি তোমার দেহের মধ্যে বসে, তিনি যে সকল কিছু পাহারা দিচ্ছেন, তা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। বিষয় সম্বন্ধীয় মন দিয়ে তা উপলব্ধি করা যায় না। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ উপলব্ধি হয়ে

থাকে, সে সকল ব্যক্তির ক্ষতি করবার সাধ্য কার?

**যুক্তহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।**
**যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭**
**যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।**
**নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।১৮**

**তাৎপর্য্য ঃ**— সাধক পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়ার পর তাঁর যেহেতু ইচ্ছারূপ কোন বিষয়ের উপর লালসা বা কামনা থাকে না, সেহেতু তাঁরা ঐ যুক্ত অবস্থায় থাকার দরুণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি হতে বিরত হন। তখন তাঁরা শুধুমাত্র দেহের জন্য খাদ্যগ্রহণ করেন এবং নিদ্রা যান। তাঁরা মনে করেন 'আমার দেহের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন এ খাদ্য তিনি তাঁকে অর্পণ করছেন।' আবার 'যখন নিদ্রা যান তখন মনে করেন নারায়ণ তাঁর দেহের মধ্যে বসবাস করে আত্মধ্যানের মাধ্যমে নিদ্রা যান অর্থাৎ জেগে থেকে নিয়মিত রূপে নিদ্রা যান'।

ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হবার জন্য চঞ্চলমন ব্রহ্মে লীন প্রাপ্ত হয়। এর ফলে তাঁর মনের মধ্যে নিস্পৃহ ও সংকল্প-বিকল্পরহিত অবস্থা বা ইচ্ছাজনিত কামনা-বাসনারূপ ফল গ্রহণ করবার অভাব দেখা দেয়।

**যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।**
**যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯**
**যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।**
**যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০**

**তাৎপর্য্য ঃ**— যোগীর প্রাণে কখনও চঞ্চলতা স্পর্শ করতে পারে না, তা বাতাসহীন ঘরে স্থির প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। সাধক প্রাণকর্ম্ম করতে করতে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করলে প্রাণের নিরুদ্ধ চিত্তের প্রকাশ ঘটে এবং এরপর প্রাণরূপী শ্বাসকে আজ্ঞাচক্রের উপরে পরমাত্মারূপ গুরুর পাদপদ্মে আহুতি দিলে তার চঞ্চল মন পাদপদ্মে লীন হয়ে যায় এবং তখন আত্মদর্শনের ফলে তিনি আপনাকে দেখতে পান এবং আত্মানন্দে বিভোর হয়ে পড়েন।

**সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।**
**বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১**
**যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।**
**যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।২২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণকর্ম করবার সময় শ্বাসকে প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ওঠানো ও নামানো করতে হয়। এই প্রাণকর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করলে, মনের মধ্যে কোনরকম বিষয় চিন্তা না রেখে এই ওঠান ও নামান বা প্রাণায়াম করলে প্রাণ দু'ভ্রূর মধ্যস্থলে কূটস্থে আট্‌কে যায়, সাধক তা বুঝতে পারেন না। ঐ অবস্থায় আট্‌কে থেকে সুষ্ঠুভাবে প্রাণকর্ম করলেই প্রাণ আরও ওপরের দিকে উঠতে থাকে এবং সেখানে আটকে যায়। যা সকল ইন্দ্রিয়ের—রহিত অবস্থা সেই অবস্থায় থাকলে আকাশের প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রাণ সেখানে গিয়ে স্থির হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, তখন এক অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি হয় যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝার ক্ষমতা থাকে না বা সেই বিষয়ে কোনরূপ কথা ব্যক্ত করা যায় না। ঐ অবস্থায় থেকে যে শান্তি ভাব সাধক অনুভব করে, তার জন্য তাঁর মন কোনরূপ আভাস পায় না কারণ মনের মধ্যে তখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়জনিত বিষয় চিন্তা প্রকটিত হয় না।

এই অবস্থায় আট্‌কে থাকার পর সাধক যখন ঐ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসে তখন তাঁর মনের মধ্যে ঐ সকল বিষয়, কিছুই ভেসে ওঠে না। শুধুমাত্র মনের মধ্যে একটি ভাব প্রকাশিত হয় যে এতক্ষণ আমি অনাবিল শান্তির আলয়ে সুখ ভোগ করছিলাম। এই ব্যক্তি তখন যুক্ত অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় বিষয় চিন্তারূপ মন না থাকার জন্য ঐ অবস্থায় অবস্থানের সময় চঞ্চল হন না। তখন আমাদের দেহস্থিত বায়ুর স্থিরক্রিয়া সুষুম্না পথ ধরে ছয় চক্রের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এইভাবে চক্রে চক্রে চলতে চলতে তত্ত্বাকাশে স্থিতি লাভ হলে অপর কোন লাভই তার কাছে অধিক সুখকর বলে মনে হয় না, এই অবস্থায় মন প্রাণ বিচলিত হয় না। সে এক সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থাকে চৈতন্য সমাধি অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থা সম্পূর্ণ

নিজ বোধগম্য, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একমাত্র প্রাণকর্মরূপী সাধনের দ্বারাই এই অবস্থা লাভ হতে পারে।

**তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।**
**স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা।।২৩**
**সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।**
**মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** অজ্ঞানতা থেকে 'আমি-আমার' বোধের উৎপত্তি হয় এবং সেই থেকে কামনার জন্ম নেয়। এই সকল কামনা ত্যাগ না করলে যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এই কামনার দ্বারা কাম উৎপন্ন হয়, এই কাম রিপু হল যোগবিঘ্নকারী যা বড় বড় সাধককেও নিম্নে পদার্পণ করাতে পারে। এই কাম-ভাবের উদ্ভব হয় দেহস্থিত ঐ কামনা রিপুর প্রভাবে। এর ফলে মনের মধ্যে নানারূপ নারী-পুরুষের চিন্তার উদয় হতে পারে। তখন এমন নারীর বা পুরুষের ছবি ক্রিয়াকালে ভেসে ওঠে, যাকে আগে কখনও দেখা যায়নি। এই সকল কার্য্য আমাদের নিজ দেহের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সিনেমা বা বায়োস্কোপে যেমন আমরা দেখি, যোগী ঋষিরা ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন, মেনকা, ঊর্বশী নামক নারীগণ নৃত্যের মাধ্যমে তাঁদের যোগভঙ্গ করছে। সাধকের যোগক্রিয়াকালে মনের মধ্যে এই সকল নারীর ছবি উদয় হয় এবং সাধককে তখন কামরিপু প্রবলভাবে উৎপীড়ন করে এবং এইভাবে মনকে নাচিয়ে যোগ ভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল, ঐ অবস্থা মনের মধ্যে দানা বাঁধলে গুরুদেবের কাছে সেই অবস্থা হতে নিবৃত্তির জন্য একান্ত প্রার্থনা করা। গুরুদেবের আদেশ বা উপদেশের মাধ্যমে এই কামনার হাত হতে মুক্তি পাওয়া যায়। তার জন্য শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যে আদেশ বা উপদেশ পাওয়া যাবে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন বা অভ্যাস করতে হবে। গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করলে নিশ্চিত যোগাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

**শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।**
**আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।।২৫**

**যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।**
**ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬**

**তাৎপর্য্য ঃ—** আমাদের মন সর্বদা বিষয়চিন্তা ও ইন্দ্রিয়-আসক্তিতে মত্ত থাকে। এর ফলে একে আপন, ওকে পর এই ভেবে মনের মধ্যে নানারূপ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, তার থেকে সুখ লাভ করতে চাই। তার ফলে আমরা নিত্য নতুন নানারূপ বিষয় জটিলতায় আট্‌কে পড়ি এবং তার থেকে নিস্তারের পথ খোঁজবার চেষ্টা করি। এই বিপদ হতে নিস্তারের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকি, কাঁদি, দুঃখ জানাই, অপরের উপর দোষারোপ করি এবং নিজে আমরা কত ভাল তার প্রকাশ ঘটাই অর্থাৎ অপরের দোষ দেখি, নিজের দোষ দেখি না বা খোঁজবার চেষ্টা পর্যন্ত করি না। এরপর ঐ বিপদ থেকে মুক্তি পেলে তখন কিন্তু আমরা আবার এই ঈশ্বরেরও দোহাই দিই না, তখন নিজের কার্য্যকে বড় করে জাহির করি। কোন বস্তু ত্যাগ করা তো দূরের কথা, কি করে আরও বেশী বেশী করে ভোগ করা যায়, তার জন্য সারাক্ষণ ছুটে মরি। প্রয়োজনে অপরের বস্তু গ্রাস করতেও মনের মধ্যে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ পায় না। তাই এই সকল মন নিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করা বা তাঁর উপাসনা করা যায় না। কারণ অপরের দোষ দেখে আমরা এমনই দোষে দোষী হয়ে পড়েছি যে, আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের বিচার করতে শুরু করে দিই, এমন কি পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবের কোনটা ভুল কোনটা ঠিক তার বিচার করি এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে গর্ব অনুভব করি। এই সকল ব্যক্তির ঈশ্বরকে পাওয়া বা ঈশ্বরকে জানা বহু দূরের কথা।

প্রাণকর্ম করতে হলে বা ঈশ্বরকে পেতে গেলে সবার আগে নিজের জেদ ও ত্যাগের দ্বারা মনের মধ্য থেকে বিষয়চিন্তা ও ইন্দ্রিয় আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, এরপর প্রাণকর্ম করলে এবং গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ পালন ও অভ্যাস করলে তবেই ঈশ্বর লাভের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। এর মাধ্যমেই তুমি তোমার মনকে ঈশ্বরের পদতলে সমর্পণ করতে পারবে। এরপর মনের মধ্যে হতে বিষয় চিন্তা ত্যাগ করে উত্তম প্রাণায়াম করলে ১৪৪টি প্রাণায়ামে

তোমার আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ ঘটবে। এই হল ধারণার অবস্থা। এই উত্তম প্রাণায়ামের মধ্যে শুধু চক্র ও মন্ত্র ছাড়া আর কোন বিষয় স্মরণ মনন করা চলবে না।

প্রাণকর্ম করতে করতে মনের মধ্যে চঞ্চল মনের কারণে যদি একবার বহিঃচিন্তা বা বিষয়চিন্তা প্রবেশ করে তাহলে মন চক্র ও মন্ত্র ছেড়ে সেইদিকেই ধাবিত হতে থাকে, তখন মনকে ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে স্থির করা তো দূরের কথা সেই চিন্তায় ভেসে তাতে শুধু হাবুডুবুই খেতে হয়। এই হাবুডুবু খেতে খেতে সে তখন নানান পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো তৈরী করে। তখন সে কোন চক্রে ছিল, সে কত সংখ্যা পর্যন্ত ক্রিয়া করেছে তার কিছুই তার স্মৃতিতে থাকে না। যার ফলে আমাদের মতন এই সকল বিষয়চিন্তায় ধাবমান ব্যক্তিদের শুধু চিন্তার সাগরে হাবুডুবুই খেতে হয়, আর শ্বাস টানা-ফেলা হয় মাত্র। সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের জেদ ও চেষ্টার দ্বারা তাকে আটকানো আর হয় না। হবেই বা কোথা হতে? আমরা চাই এইসব বিষয় ভাবতে বা চিন্তা করতে, তাই আমরা সেই কার্য্যেই লিপ্ত থাকি। তার থেকে আমরা নিবৃত্ত হতে চাই না, তাই হই না। তাই নিজের জেদ ও চেষ্টার দ্বারা মনকে বিষয় সাগরের স্রোতে ধাবিত হতে না দিয়ে যদি চক্রে ও মন্ত্রে মনকে ফিরিয়ে আনি, তাহলে আমরা স্থির হবই হব।

গুরুদেব যখন আমাদের এই কার্য্য করবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কিন্তু তিনি চক্র ও মন্ত্র স্মরণ করবার অভ্যাসের কথা বলেছিলেন। বসে বসে আপনার বিষয় চিন্তা করবার কথা বলেননি। কিন্তু আমরা তাঁর আদেশ ও উপদেশ পালন করি না। তাই আমাদের হয় না। তুমি হয়ত বলবে চিন্তা আপনা হতে মনকে গ্রাস করে, কোথা থেকে এসে হঠাৎ মনকে টেনে নিয়ে যায়। সেখানে বলার কথা একটাই সেটা সম্পূর্ণ তোমার চিন্তা, তাই সেখান থেকে একমাত্র তোমারই জেদের দ্বারা এবং তোমারই নিষ্ঠার দ্বারা ও চেষ্টার দ্বারা জয় করা সম্ভব। অপর কেউ তা করে দিতে পারবে না। প্রত্যহ নিরন্তর গুরুস্মরণ করে কার্য্য করা উচিত। মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার কথা উদয় হলে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তবেই তিনি তার হাত হতে তোমাকে মুক্তির পথ বলে দেবেন। আমরা শুধু মুখে জয়গুরু জয়গুরু করি কিন্তু যখন এই সময় উপস্থিত হয় তখন

তাঁর কথা ভুলে যাই আর ময়না পাখির মত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ছেড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে থাকি। কৃষ্ণ নাম আর হয় না।

**প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।**
**উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭**
**যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।**
**সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** মানবদেহ রজোগুণের বশবর্তী হয়ে বিষয়চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থেকে থাকে। এর ফলে ঈশ্বর প্রাপ্তি তার সুদূরপ্রসারী ব্যাপার। প্রাণকর্মের দ্বারা যিনি নিজেকে ব্রহ্মপদে দান করতে সমর্থ হয়েছেন তিনিই একমাত্র পারেন রজোগুণ নাশ করে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধিত করতে। এর মাধ্যমে মনের মধ্যে আর কোনরূপ চঞ্চলতার প্রকাশ ঘটে না। তখন মনের মধ্যে এক প্রশান্তির ভাবের প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে আরও উর্দ্ধে প্রাণকে প্রবেশ করাতে পারলে চিত্তে স্থিরাবস্থা এসে থাকে। মনের মধ্যে তখন ইচ্ছারহিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত চিত্ত হলে মন আর কোনরূপ পাপে আকৃষ্ট বা জড়িত হয় না। প্রাণ তখন নিষ্পাপ ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ সদাই আত্মানন্দে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

মনকে প্রাণকর্মের দ্বারা স্থিরব্রহ্মে যুক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে নিষ্পাপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন বহিঃচিন্তারূপ কর্ম থেকে কর্মফল সঞ্চিত হয় না। এর ফলে আত্মার অধোগতি নাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ব্রহ্মস্পর্শ পাওয়ার জন্য বিশেষ সুখ অনুভূত হয়।

**সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।**
**ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।২৯**
**যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।**
**তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** পরব্রহ্মরূপ শ্রীগুরুদেব যোগের দ্বারা সমাহিত চিত্ত

অর্থাৎ স্থিরচিত্ত। তিনি সকল দেহের মধ্যে আত্মার প্রকাশ বা তাঁর প্রকাশ পরিলক্ষিত করেন। এর ফলে তাঁর কাছে সকলই সমান, তাঁর মধ্যে কোন উচ্চ বা নীচের সম্পর্ক নেই। তিনি শ্বাসরূপে সকল দেহের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁর স্থান কোন দেহ হতে ত্যাগ হলে সেই দেহ শবে পরিণত হয়। তাই সর্বদা সব অবস্থাতে তিনি আমাদের সঙ্গে বিরাজ করছেন। সকল কর্ম, যা আমরা করছি সব কিছুতে তিনি নীরব দর্শকের মত নজর রেখে চলেছেন এবং সঙ্গী হয়ে আছেন। তিনি আমাদের নিকট অদৃশ্য, তাই আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। আমরা তাঁর দেহটা দেখি, তাঁর অস্তিত্ব বা তাঁর ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত করবার দৃষ্টি বা শক্তি কোনটাই আমাদের নেই। তাই তাঁর চোখের আড়ালে গেলেই আমাদের মত জীব মনে করি যে তিনি কিছুই দেখছেন না বা কিছুই বুঝছেন না। একজন ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে আসলে তিনি তার ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারেন। এমনকি সে কি বলতে চায়? বা কেউ যদি মুখে একরকম এবং মনে অন্যরকম কথা রেখে— কথা বলেন তাও তিনি বুঝতে পারেন। যেহেতু তিনি অব্যক্ত, সেহেতু আমাদের মত স্বার্থান্বেষীর দল তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখি। এর ফলে ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা সব মনের মধ্যে নিদ্রিত থাকে। এর বিচার যেদিন আমাদের উপলব্ধিতে আসবে সেদিন তাঁর পাহারা দেবার কথা আমরা জানতে পারব ।

**সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।**
**সর্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।।৩১**
**আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।**
**সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** সর্বদা আমাদের জানা উচিত গুরুদেব দেহ আমির উপর জয় প্রতিষ্ঠিত করে আমার আমিকে চিনেছেন এবং তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর সঙ্গে মিশেছেন। এর ফলে তাঁর ভাবের মধ্যে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই ভাব রয়েছে। এর ফলে তিনি সকল কিছুর মধ্যে নিজের অবস্থা পরিলক্ষিত করেছেন— সেহেতু তিনি বিষয়ে থাকতেও বিষয় মুক্ত। তিনি কখনও তার

স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হন না।

এর ফলে তাঁর কাছে সুখ দুঃখ সকলই সমান, তাঁর মধ্যে কোন আমিত্বের প্রকাশ হয় না। এই সকল যোগী মহাপুরুষগণ গুরুরূপে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

**যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।**
**এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩**
**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।**
**তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৪**

**অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।**
**অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** জীবভাবরূপ আমরা সকল সময় চঞ্চল মনের দ্বারা আবৃত এবং মায়ার দৃঢ় বন্ধনে বন্দী হয়ে আছি। প্রাণকর্মরূপী কার্য্য করতে করতে আমাদের মন প্রাণ কর্মের চেয়ে বহিঃচিন্তারূপ কর্মে অধিক মত্ত থাকে। এর ফলে স্থিরাবস্থা কি তা আমরা উপলব্ধি কবতে পারি না। আবার মায়ার বন্ধনে বাঁধা থার্কার দরুণ মনের মধ্য থেকে বিষয় চিন্তা বা সাংসারিক আপনজনের চিন্তা কিছুতেই দূরীভূত করতে পারি না। এর জন্য বা মনের চঞ্চলতার কারণে আমরা কুম্ভক অবস্থায় শ্বাসকে ধরে রাখতে সমর্থ হই না। সেই জন্য আমরা এই ক্রিয়াকে অতীব দুষ্কর বলে মনে করি।

ভগবান শ্রীগুরুদেব কূটস্থচৈতন্যে তাঁর রূপ দেখিয়েছেন। আমাদের মনকে স্থির করতে গেলে বা চঞ্চলতা থেকে ও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গেলে সেই কূটস্থচৈতন্যে সর্বদা মন রেখে চলা একান্ত দরকার। ভগবান আত্মনারায়ণ এই কূটস্থচৈতন্যে সদাসর্বদা বিরাজমান, মনের মধ্যে কোনরূপ ভয়, সংশয়, বাধা, বিপত্তি ইত্যাদি ক্রিয়াকরাকালীন আস্‌লে তাঁর নিকট একান্ত প্রার্থনা করা উচিত। এর জন্য চাই সর্বপ্রথমেই ক্রিয়ার জন্য প্রেম ও ভক্তি।

তাঁকে পাবার জন্য এই প্রেম ও ভক্তির জন্য আসে বিরহ যাতনা। আবার তার থেকে আসে প্রাণের আকুলতা। সেই আকুলতার দ্বারা তাকে স্মরণ করতে পারলে তাঁর নিকট তার প্রার্থনা প্রকাশ করলে তিনি তখন ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তখন তিনি তাঁর মনকে দু'ভ্রূর মধ্যস্থিত কূটস্থ চৈতন্যে টেনে নেন। তখন আর মনের মধ্যে অন্য কোনরূপ চিন্তা বাসা বাঁধতে পারে না। সেই অবস্থায় বসে কর্মযোগ অভ্যাস করলে বৈরাগ্য বা বীতরাগ উৎপন্ন হয়ে মনকে নিগৃহীত করে ফেলে।

**অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।**
**বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ।।৩৬**

**অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।**
**অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭**
**কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নভ্রমিব নশ্যতি।**
**অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮**

**তাৎপর্য্য ঃ—** প্রাণকর্ম করতে হলে মনকে সর্বপ্রথমে সকল বিষয় হতে সংযত করতে হয়। এই সংযম ক্রিয়া যার মধ্যে অধিক ভাবে পরিলক্ষিত হয়, তার দ্বারা এই দুষ্প্রাপ্য যোগক্রিয়া সম্পন্ন করবার সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। এই ক্রিয়া যেহেতু গুরূপদিষ্ট তাই শ্রীগুরুদেবের আদেশ উপদেশের মাধ্যমে নিজের প্রাণকর্মের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে যত্নশীল হয়ে করতে পারলে এবং তাঁর আদেশ ঠিক মত পালন করলে শ্রীগুরুদেবের কৃপার দ্বারা তার মন তখন বশীভূত হয় এবং মনের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব প্রাপ্ত হতে পারেন। সাধারণ জীবভাবাপন্ন মানুষ আত্মকর্ম পাবার সময় সকলেই শপথ করেন যে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন এবং করেনও হয়তো সাময়িক কালের জন্য। যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবস্থায় উপরিউক্ত ভাবে যোগাবস্থার কার্য্যে নিষ্ঠার সঙ্গে নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল হন এবং কিছুকাল যাবৎ করার পর মনের মধ্যে নানারূপ শিথিলতা আসার জন্য যদি সে প্রাণকর্মের ক্রিয়ায় গাফিলতি প্রকাশ করে বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেড়ে দেন, সেই সকল ব্যক্তিকে পাপ স্পর্শ করে। তখন বৃষ্টিহীন ছেঁড়া মেঘের

ন্যায় তিনি বিচরণ করেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি ছাড়া জীবের মুক্তির আর কোন উপায় নেই, তখন তারা স্থিরব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, আবার ঈড়া, পিঙ্গলার চঞ্চল গতিরূপ মধ্যাবস্থায় পড়ে সরীসৃপের ন্যায় বুকে ভর দিয়েই চলেন, উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হন না।

**এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তু মর্হস্যাশেষতঃ।**
**ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।।৩৯**
**পার্থ নৈবেহ নামূত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।**
**ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০**

**তাৎপর্য্য ঃ—** যে সকল ব্যক্তি উপরিউক্ত ভাবে প্রথমে যোগাভ্যাসের নিষ্ঠা প্রদর্শন ঘটিয়ে পরে ধীরে ধীরে অলসতার বশবর্তী হয়ে প্রাণক্রিয়ায় শিথিলতার ভাব প্রকাশ করে, সেই সকল ব্যক্তির যা ঘটবে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবুও তাদের মনের মধ্যে সংশয় থাকে যে ভগবান শ্রীগুরুদেব তার সকল কিছু অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ জেনেই তো তাঁকে ক্রিয়া প্রদান করেছিলেন। তাহলে এই জন্মে যদি তা সম্পূর্ণ না করতে পারে তা হলে পরজন্মে তাদের কি পরিণতি হবে? পরজন্মেও কি এইভাবে সরীসৃপের ন্যায় দিন অতিবাহিত করতে হবে? না অন্য কোন পন্থা দয়াল গুরুদেব তার জন্য তৈরি করে দেবেন? কারণ শ্রীগুরুদেব হলেন ক্ষমাশীল তাঁর কৃপা ও দয়া ছাড়া তো এই পাপাসক্ত সংসার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই তিনি যদি ভক্তের এইরূপ আকুল প্রার্থনা শোনেন তা হলে কি তিনি তার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকবেন? এখানে বলা যায় 'না', পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভক্তের আকুল প্রার্থনা শুনলে ঈশ্বররূপী পরম গুরুদেব তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। কারণ তিনি যে তাদের খুব ভালবাসেন, তাদের চেয়ে আপন যে আর তাঁর কেউ নেই। তাই আকুল-কাতর হৃদয়ের দুঃখ মোচন তিনি করেনই। যে সকল ব্যক্তি প্রাণকর্ম পূর্বে আগ্রহের সঙ্গে করে, পরে তাতে শিথিলতা দেখান সেই সকল ব্যক্তি পুনরায় পাপাসক্ত হয়ে পড়বার জন্য তিনি তার ঐ পাপ সংশোধন করানোর চেষ্টা করেন। কিভাবে? সে বিভিন্ন উপায়ে, এরপর তার শিথিলতার দরুণ প্রাণক্রিয়া এ জন্মে নষ্ট হয়ে যাবার জন্য তিনি তাকে পুনরায় প্রাণক্রিয়া করার

জন্য তাকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করিয়ে নেন। তাতেও যদি তার এজন্মে না হয়, তাহলে দেহত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ যেখানে করলে এই স্থিরের ক্রিয়া ঠিকভাবে করতে পারে তার ব্যবস্থা তিনিই করেন।

তবে একথা মনে রাখতে হবে প্রাণকর্মে শিথিলতা দেখানোর জন্য যে সকল ব্যক্তি বিবেক দংশনে দংশিত হয়ে পুনরায় তা করবার জন্য স্থির প্রযত্ন হন, সেই শুভকারী ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রেই উপরিউক্ত বিষয়টি প্রযোজ্য। পুনরায় অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করে ক্রিয়া নেওয়ার পরেও যে সকল ব্যক্তি তাতে সেই একইভাবে শিথিলতা দেখায় বা পুনরায় দীক্ষিত না হয়েও যে সকল ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে শিথিলতা দেখিয়েই চলে অবশেষে তাদের দুর্গতির সীমা থাকে না, পরজন্মে তারা পশুযোনী প্রাপ্ত হয়ে নরকভোগ করেন।

**প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।**
**শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।৪১**
**অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।**
**এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২**

**তাৎপর্য্য ঃ—** পূর্বের শ্লোকের তাৎপর্য্যটিতে যে শুভকারী ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তারা দেহান্তের সময় স্থিতিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং তা উপলব্ধি করতে পারেন। দেহত্যাগের পর তারা এইভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থিতিরূপ অবস্থাতে কাটান। এইভাবে বহু বৎসর ঐ স্থিরাবস্থায় কাটানোর পর তখন তিনি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে তার এই আত্মক্রিয়া করতে এবং তার থেকে স্থিরব্রহ্মে উত্তীর্ণ হতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় না। কারণ তারা জ্ঞানী যোগীকুলে বা কোন সাধক বংশে জন্মগ্রহণ করে তার ঐ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়। এরপর ঐ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্ম ঐ যোগীকুলে হয়ে যে তিনি উত্তীর্ণ হন, তা হন বটে কিন্তু তার জন্য বা ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্য তাকে বহুকাল বা বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। তার সময় কখন হবে তা কেউ বলতে পারে না। যতকাল না এইরূপ কোন যোগীকুল বা সাধক বংশ পরিলক্ষিত হবে ততকাল তাকে ঐ আত্মায় আটকে থাকতে

হবে। যা অতীব দুর্লভ।

**তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।**
**যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।।৪৩**
**পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।**
**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।।৪৪**

**তাৎপর্য্য ঃ—** যোগীকুলে বা সাধককুলে ঐ শুভকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্ম হবার পর তাঁর পূর্বজন্মের অভ্যাস কিছুই পাল্টায় না। দেহঘটের অবস্থানের জন্য পূর্বজন্মের দেহঘটের যে সকল অভ্যাস তাঁর মধ্যে ছিল সেই সকল অভ্যাস বা বুদ্ধি সবকিছুই তার বর্তমান দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এর ফলে সদ্‌গুরুর কাছে তাকে আসতেই হয় অর্থাৎ কেউ একবার সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে প্রাণক্রিয়ায় দীক্ষিত হলে পরজন্মেও তাঁকে এই ক্রিয়া করবার জন্য সদ্‌গুরুর নিকট যেতে হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ক্রিয়াদীক্ষায় দীক্ষিত হবার পর, পূর্বজন্মের ন্যায় তিনি তখন গুরুদেবের উপদেশ মতন সকল কার্য্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে ব্রহ্মপদে বলীয়ান হয়ে অধিক ফল প্রাপ্ত হয়ে বেদ শাস্ত্রোক্ত কর্মী হন।

**প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।**
**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।৪৫**

**তাৎপর্য্য ঃ—** বেদ শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হওয়ার পর যোগক্রিয়ায় সে যদি অধিক যত্নশীল হয় তা হলে তিনি তার দেহকর্মস্থিত সকল পাপ বিনষ্ট করায় সে নিষ্পাপ যোগীরূপে পরিগণিত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্থিরত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং মনের মধ্য হতে ইচ্ছাশক্তির নাশ হয়। ইচ্ছাশক্তির নাশ হবার ফলে তার কামনা-বাসনার নাশ হয়। এইভাবে ক্রিয়া করে বার বার জন্মগ্রহণের পর, প্রতিজন্মে সিদ্ধাবস্থা লাভ করার পর সহস্রারে গিয়ে পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন।

**তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগীজ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।**
**কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।।৪৬**

**যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।**
**শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭**

**তাৎপর্য্য ঃ—** যোগক্রিয়া করে যে সকল ব্যক্তি উত্তীর্ণ হতে পারেন অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হতে পারেন, সেই সকল ব্যক্তি যোগী পদবাচ্য। তপস্যা করে জপ-তপের মাধ্যমে হয়তো আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হতে পারে; যে সকল ব্যক্তির আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়েছে, সেই সকল ব্যক্তি তপস্বী পদবাচ্য। আবার কূটস্থচৈতন্যকে জেনে যে সকল ব্যক্তি কূটস্থব্রহ্মের স্বরূপ জেনেছেন সেই সকল ব্যক্তি জ্ঞানী পদবাচ্য। আজ্ঞাচক্র ও কূটস্থের উর্দ্ধে সহস্রারে যার মন পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সকল ব্যক্তি যোগী পদবাচ্য। তাই এখানে বলা যায়, যে তপস্বী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। উপরিউক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনাগুলি হতে মনে হতে পারে যে এটা অতি কঠিন কার্য্য। এর জন্য চিন্তা বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই, সর্বদা জানবে শ্রীগুরুদেব সকল সময় তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি তোমার প্রতিটি শ্বাসের খবর জানেন। তাই তোমার একান্ত কর্ম হল তাঁকে স্মরণ করা। নিজের ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, বিশ্বাস সকল কিছু তাঁকে উজার করে দাও। তুমি একহাতে দিলে তিনি তোমায় দু'হাত ভরে দেবেন, তোমার মাথার উপরে যে শীতল বটের ছায়া আছে যার তলায় বসে তুমি শীতলতা অর্জন করছো, তাঁকে সবকিছু প্রদান করে সকল কাজে তাঁকে স্মরণ করে যদি তুমি পথ চলতে পার তাহলে সকল বাধা-বিঘ্ন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্ধন, এই সবকিছু কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে এবং তিনি দু'হাত বাড়িয়ে তোমায় কোলে তুলে নেবেন। কারণ তিনি সদাসর্বদা দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে তুলে নেবার জন্যই বসে আছেন। তাই আমাদের উচিত তাঁর এই হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তাঁর স্মরণ করা।

।। ইতি অভ্যাসযোগ সমাপ্ত ।।

**—ঃ ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

## জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

**ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।**
**অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১**
**জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।**
**যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।২**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি শ্রীগুরুদেবের উপর কিভাবে বিশ্বাস করে তাঁর সকল আদেশ, উপদেশ মেনে প্রাণকর্ম করতে হয়। শ্রীগুরুদেব তাঁর প্রকাশ কূটস্থচৈতন্যে ঘটিয়ে আমাদের মতন মানবদেহের জন্ম সার্থক করেছেন। শ্রীগুরুদেব প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদারূপ কার্য্য প্রদান করেছেন এবং কিভাবে করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। তিনি নিষ্ঠুর বা নির্বোধ নন। একটি গাধা কতটা পরিমাণ পণ্য বহন করতে পারবে তা তিনি জানেন এবং তিনি আমাদের মতন স্বার্থপর গাধাদের পিঠে ততটা পণ্য চাপিয়ে দেন।

আমাদের উচিৎ নিজেদের আত্ম-অহমিকা পরিত্যাগ করে তাঁর আদেশ উপদেশ মত তাঁর দেওয়া কাজ করে চলা। তিনি যখন চাপিয়ে দিয়েছেন, কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব তাঁর। আমাদের সে দৃষ্টি বা বিচারশক্তি নেই। তাই তিনি যা দিয়েছেন তার কোন কিছুর বিচারের মধ্যে না গিয়ে তাঁর দেওয়া নির্দিষ্ট সংখ্যা-পূরণ করাই আমাদের কর্তব্য। এইভাবে, এই মনোপ্রবৃত্তি নিয়ে যদি আমরা কাজে বসতে পারি এবং এই ক্রিয়ার মধ্যে নিজের মনকে প্রবেশ করাতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর ঐশ্বর্য্য সম্পর্কে জানতে পারব।

ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে বা এই আত্মকর্মের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে যে জ্ঞান আমরা অর্জন করব, তা শুধুমাত্র নিজবোধগম্য, যা কোনরকম পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যাবে না। প্রাণকর্মের মাধ্যমে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয়, তাই হল প্রকৃত বিজ্ঞান পদবাচ্য। 'আমার-আমি' রূপ জ্ঞান

লাভ হবার পর, অর্থাৎ পরব্রহ্মের শূন্যতত্ত্ব সাধক জ্ঞাত হবার পর, সাধকের আর জানবার কিছু বাকি থাকে না। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অজানা বলে কোনকিছুই তাঁর কাছে থাকে না।

**মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।**
**যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** পশুযোনি অতিক্রম করবার পর জীব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেও সকল মানবদেহ সাধন পথে ব্রতী হয় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাধনপথে ব্রতী হন। বলতে গেলে সহস্র সহস্র মানবদেহের মধ্যে কোন একজন বা কেউ কেউ এই সাধন পথে ব্রতী হন। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে "কোটিতে গুটি", অর্থাৎ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক সাধনপথের সন্ধান করে তাতে ব্রতী হন। সাধনপথে ব্রতী হলেই যে তিনি পরমাত্মতত্ত্ব জানতে পারবেন তা নয়। পরমাত্মতত্ত্বরূপ জ্ঞান লাভ করে কেউ কেউ ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হবার পরও তাদের পতন হতে পারে। যিনি সাধনপথে বিশেষরূপে ব্রতী হবার পরও পরমাত্মতত্ত্ব জেনে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন সেই সকল ব্যক্তির আর পতনের সম্ভাবনা থাকেনা। কারণ এই সকল ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্বরূপ বিজ্ঞান জেনে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েছেন, সেইহেতু এঁরা মুক্তব্যক্তি পদবাচ্য, এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারলেই শ্রীগুরুদেবকে জানা সাধকের পক্ষে সম্ভবপর হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় '**সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।**' কারণ পরব্রহ্মে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাধকের চিরমিলন ঘটে থাকে। সেইহেতু ভগবান শ্রীআত্মনারায়ণ বলেছেন, "এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে কেউ কেউ আমায় জানতে পারে, আর সেই জানার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ নেই।"

**ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।**
**অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪**
**অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।**
**জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** ঈশ্বর ছাড়া বা শ্রীআত্মনারায়ণরূপ শ্রীগুরুদেব ছাড়া প্রকৃত পুরুষ আর কেউ নয়। কারণ তিনি হলেন স্থিরপরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ব্যতিরেকে জগতের সবকিছুই হল চঞ্চল বা প্রকৃতির অধীন। আবার এই প্রকৃতিও তাঁরই সৃষ্টি। জগৎসংসারকে চালানোর জন্য বা তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুদেব এই প্রকৃতিরূপা শক্তির সৃষ্টি করেছেন। যেমন পাহাড়— সে চির স্থির। যুগযুগ ধরে সে তার নিজের জায়গায় চিরদণ্ডায়মান। আবার তারই মধ্য হতে সৃষ্টি হয়েছে চঞ্চলপ্রকৃতিরূপা ঝর্ণা, যা তারই গা বেয়ে চঞ্চলগতিতে নেমে আসছে। সেই ঝর্ণার সৃষ্টিকর্ত্তা সে। কিন্তু সে নিজে অবিচল।

তেমন আমাদের এই জীবদেহ যা সৃষ্টি হয়েছে — তা চঞ্চল অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন স্থিরপরব্রহ্ম স্বরূপ, অর্থাৎ পরমাত্মা অর্থাৎ তিনি সকল জীবদেহের মধ্যে রয়েছেন স্থিরভাবে, আর— আমরা দেহস্থিত রিপুসকলের চঞ্চলতার ফাঁদে পড়ে প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিত্য নতুন কামনা বাসনার জন্ম দিচ্ছি।

আমাদের দেহটি আট প্রকৃতি দ্বারা গঠিত।

যেমন ঃ— **মূলাধার — ক্ষিতিতত্ত্ব**

**স্বাধিষ্ঠান — জলতত্ত্ব**

**মণিপুর — তেজস্তত্ত্ব**

**অনাহত — বায়ুতত্ত্ব**

**বিশুদ্ধাখ্য — শূন্যতত্ত্ব**

**এছাড়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।**

আত্মারূপী স্থিরপ্রাণ কর্ত্তৃক চঞ্চলপ্রাণ এই অষ্ট-প্রকৃতির সৃষ্টি করেছে। অতএব, আমাদের দেহের প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত। এই আট প্রকৃতিই হল স্থিরপ্রাণরূপী আত্মনারায়ণের অষ্টসখী।

আমাদের দেহস্থিত প্রাণবায়ু জন্মগ্রহণ করার পর সুষুম্না নাড়ী পরিত্যাগ করে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে আমাদের প্রাণবায়ু মূলাধার হতে কণ্ঠ পর্যন্ত গতায়াত করতে থাকে। তার উপরে যে স্থির ব্রহ্ম, যেখানে গেলে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়, সেইস্থানে আর যেতে পারে না। এর ফলে এই আবদ্ধ দশায় পড়ে আমরা নিত্য-নতুন কামনা ও বাসনার জন্ম দিই। এই অষ্টসখী কণ্ঠ পর্যন্ত্যই অবস্থিত, তার ঊর্দ্ধে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন।

আমাদের দেহের মধ্যস্থিত অষ্টসখী হল নিকৃষ্টা শ্রেণীর প্রকৃতি। এই সকল প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অপর আর এক প্রকৃতি রয়েছে, যা হল পরাপ্রকৃতিস্বরূপা রাধা। যিনি ষট্‌চক্রের অতীত স্থানে অবস্থান করছেন, অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তর্গত যে ব্রহ্মসূত্র রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবস্থান করছেন। তিনিই এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটি ধারণ করে আছেন, অতএব আমরা বলতে পারি, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন। কারণ, আমরা জানি — "যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে আমাদের এই দেহ ভাণ্ডে।" স্থিরপ্রাণরূপা পরাপ্রকৃতি স্থিরপ্রাণরূপ যে সমস্তের মূল ব্রহ্মসূত্র তাঁর কর্তৃক সমস্ত জগৎকে চালনা করছেন।

**এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।**
**অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৬**
**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।**
**ময়িসর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** স্থিরপ্রাণরূপা এই পরাপ্রকৃতির দ্বারাই সমগ্র জগৎ চালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমেই সকল কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। সমগ্র জগৎ এবং এই স্থির পরাপ্রকৃতি আবার সেই স্থির ব্রহ্মসূত্ররূপী গহ্বর থেকে সৃষ্টি। সমগ্র জগৎ কিন্তু স্থিরের দ্বারা চালনা করা সম্ভব নয়, তাহলে সকল কিছু স্থির হয়ে যেত, সৃষ্টি হত না। এই পরব্রহ্মরূপী স্থির পরমাত্মা থেকে স্থির পরাপ্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—পাহাড় হল স্থির, আবার এই পাহাড় থেকে চঞ্চল ঝর্ণার উৎপত্তি—সেরূপ পরাপ্রকৃতি স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মের কূটস্থ গহ্বর থেকে ব্রহ্মযোনীর কুণ্ডে বিন্দু স্বরূপে বা নক্ষত্র স্বরূপে উৎপন্ন হয়ে চঞ্চলা প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এর

ফলে প্রাণের বিস্তার লাভ সম্ভব হয়েছে। স্থির ব্রহ্ম, জীব সকলের উৎপত্তিস্থল অথবা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল এবং তাতেই লয়। সেরূপ জীবদেহ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পরাপ্রকৃতির চঞ্চল বিস্তারের দ্বারা চালিত, বাসিত বা সেবিত হয়ে থাকে এবং দেহস্থিত প্রাণবায়ু নির্দিষ্ট সময়ান্তে দেহ থেকে ত্যাগ হলে তা আবার ঐ স্থিরে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন চঞ্চলাপ্রকৃতি স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে পরমপুরুষরূপী কূটস্থগহ্বরে লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আত্মকর্মের দ্বারা প্রকৃতিস্বরূপা রাধা বা লক্ষ্মী বা দুর্গা বা দেবী কৌশিকীর সঙ্গে মিশে তাঁর পূজা অর্চনার দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে তিনি সাধকের মন হরণ করে কূটস্থগহ্বরের সম্মুখে এনে দেন। এরপর প্রবল পুরুষাকার ও সাহসিকতার দ্বারা সেই গহ্বরের মধ্যে নিজের প্রাণকে প্রবেশ করাতে হয় এবং মন বা প্রাণ ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন মন বা প্রাণ স্থির হয়ে যায়, তখন সাধকের 'আমি-আমার' বোধ থাকে না।

এইভাবে সাধক নিজেকে জানতে পারে এবং তার এই জ্ঞান লাভ হয় যে সকলকিছু বস্তু এই আমি থেকে উৎপন্ন এবং আমিতেই শেষ। অতএব সমগ্র জগৎ আমা থেকে উৎপন্ন, আমাতেই শেষ। ঈশ্বর জগতের সকলকিছুর মধ্যে অবস্থান করছেন, অর্থাৎ আমি জগতের সকলকিছুর মধ্যে অবস্থান করছি এবং বিভিন্ন ঘটে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছি। এই 'আমি' জগৎকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছি। আমার অভাব হলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন একটি সুতোর মধ্যে একটি একটি পুঁতি গাঁথলে একটি মালা হয়। এখানে ঐ সুতোটি হলাম আমি, অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ব্রহ্মসূত্র। সুতোটি ছিঁড়ে পুঁতিগুলো পড়ে গেলে আর মালার কোন অস্তিত্ব থাকে না, সেরূপ কোন ঘটের ভেতর আত্মাস্বরূপ প্রাণ অবস্থান করলে সেটি এক একটি প্রকৃতির দ্বারা চালিত হবার জন্য ব্রহ্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত। ব্রহ্মসূত্রের অভাব হলেই পরাপ্রকৃতি স্থিরে রূপান্তরিত হয়ে কূটস্থগহ্বরে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন ঐ দেহকে চালনা করবার আর কেউ থাকে না। তখন ঐ দেহ শবদেহে পরিণত হয়। পরাপ্রকৃতিস্বরূপা রাধা এবং পরমপুরুষ স্বরূপ কৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি, যা আমরা দেখতে পাই, তাতে উভয়েই যুক্ত

হয়ে আছেন। আবার যোনীর মধ্যে অবস্থিত শিবলিঙ্গ—সেখানেও পুরুষ এবং প্রকৃতি যুক্ত হয়ে আছেন। এই যুক্ত হয়ে আছেন বলেই সমগ্র জগৎ চলছে। এই শিবলিঙ্গ এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি হল উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়বস্তুটির রূপক, যা হল প্রকৃত মৈথুন ক্রিয়া।

**রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।**
**প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮**

**তাৎপর্য্যঃ**— সকল জীবদেহের সঙ্গে তিনি যেমন যুক্ত হয়ে আছেন, তেমনই অণু, পরমাণু, জল সকলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন। জলের মধ্যেও রসরূপে এবং আমাদের রক্তের মধ্যেও রসরূপে তিনি বিরাজ করছেন। তিনি দেহ ছেড়ে কূটস্থগহ্বরে মিলে গেলে জীবদেহের মৃত্যু হয়। তখন তার দেহস্থিত রক্ত আর কাজ করে না। ক্ষণিক পরে তাও শুকিয়ে যায়। চন্দ্র-সূর্য্যরূপী এই ঈড়া-পিঙ্গলার কাজও তখন বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। সকল কিছুই ঐ গহ্বরে লীন হয়ে বা 'আমি'তে মিলিয়ে গিয়ে তাতে স্থির হয়ে থাকে। আমাদের দেহ সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছুর দ্বারা গঠিত। আমাদের দেহস্থিত ঈড়ানাড়ী হল চন্দ্রনাড়ী বা বাম নাসিকা, এটা তমোগুণরূপী এবং এই স্থানে সাম্‌বেদের প্রকাশ, তা "উ" অর্থাৎ মহেশ্বর। পিঙ্গলা নাড়ী হল সূর্য্য নাড়ী বা ডান নাসিকা এটা রজোগুণ স্বরূপ এবং এই স্থানে ঋক বেদের প্রকাশ তা 'ম' অর্থাৎ ব্রহ্মা। এছাড়া সুষুম্না নাড়ী হল ব্রহ্মনাড়ী এবং তা সত্ত্বগুণের প্রতীক এইস্থানে যজুঃ বেদের প্রকাশ, এটা 'অ' অর্থাৎ বিষ্ণু। এই ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার তিনটি সন্ধিস্থল বা মিলনস্থল আছে। ঈড়ার মধ্যে প্রাণ বায়ু এবং পিঙ্গলার মধ্যে অপান বায়ু অবস্থান করছে। সূর্য্য নাড়ীর মাধ্যমে যখন অপান বায়ু প্রবেশিত হয় তখন হয় সূর্যোদয় অর্থাৎ অপান বায়ু হল সূর্যনাড়ীর সূর্য স্বরূপ। চন্দ্রনাড়ী ছেড়ে শ্বাস যখন অপান বায়ুরূপে সূর্যনাড়ীতে প্রবেশিত হয় তখন হয় প্রত্যুষ অর্থাৎ সূর্যোদয়। আবার এই অপান বায়ু ঈড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী অভিমুখে যখন প্রবিষ্ট হয় তখন ঈড়া নাড়ীতে যায় নি আবার পিঙ্গলা নাড়ীকে ছেড়েছে এই সন্ধিক্ষণে সাধকের সুষুম্না নাড়ীতে স্থিতি হয়; কিন্তু মন স্থির না
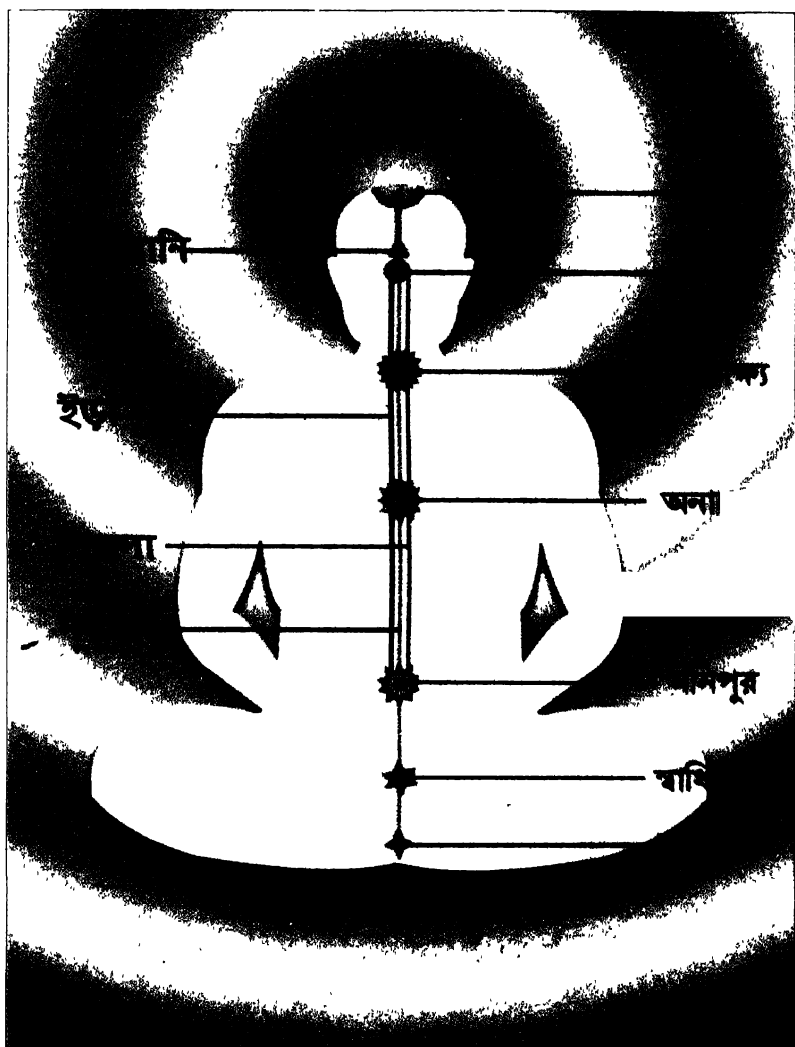
ষটচক্র

হবার জন্য তা অধিকক্ষণ সেই অঞ্চলে স্থির হতে পারে না এবং চন্দ্রনাড়ীতে প্রাণবায়ুরূপে প্রবিষ্ট হয়। ঐ সন্ধিক্ষণে সূর্যাস্ত হল। চন্দ্রনাড়ীর মধ্যে যখন প্রাণ প্রবিষ্ট হয়, তখন হয় প্রাতঃসন্ধ্যা। আবার চন্দ্রনাড়ী ছেড়ে প্রাণ যখন সুষুম্নায় স্থিতি হয় এবং পরে সূর্যনাড়ী অভিমুখে যায় এই সূর্যনাড়ীতে যায় নি এবং চন্দ্রনাড়ীতেও নেই, সেই সময় হয় সায়াহ্ন সন্ধ্যা।

এই উভয় প্রকার বায়ু যখন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সুষুম্নানাড়ীতে স্থিতিলাভ করে এবং সত্ত্বগুণে অবস্থান করে স্থিতিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রাণকর্মরূপী যোগকৌশলের দ্বারা গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সাধকের প্রাণ সত্ত্বগুণ থেকে গুনাতীত অবস্থা পর্যন্ত গতায়াত করে। এই অবস্থায় যখন স্বত্ত্বগুণ ছেড়েছে এবং গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছাই নি সেই সন্ধিক্ষণকে সূর্যনাড়ীর মধ্যাহ্ন সূর্য্য এবং চন্দ্রনাড়ীর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা হয়। ব্রহ্মযোনীব অবস্থায় তিন নাড়ীস্থিত বায়ু একত্র মিলে 'ওঁ' সৃষ্টি করেছে। কূটস্থগহ্বরের ঊর্দ্ধে একটি ত্রিকোণাকার যোনী পরিলক্ষিত হয় যে স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একসাথে মিলে 'ওঁ' সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না একসাথে মিলে 'ওঁ' সৃষ্টি হয়েছে। অ, উ, ম এই তিনটি মিলে 'ওঁ' সৃষ্টি হয়েছে। 'অ' অর্থাৎ বিষ্ণু, 'উ' অর্থাৎ মহেশ্বর, 'ম' অর্থাৎ ব্রহ্মা। এই ত্রিকোণাকার যোনীতে সবার আগে 'ম' অর্থাৎ ব্রহ্মার অবস্থান রয়েছে, মধ্যর্ভাগে 'অ' অর্থাৎ বিষ্ণুর অবস্থান রয়েছে, 'উ' অর্থাৎ মহেশ্বর ঊর্দ্ধে অবস্থান করছেন। এই তিনটি বর্ণ একসঙ্গে মিলে 'ওঁ'কার রূপী কূটস্থের সৃষ্টি করেছেন। এর পর এই যোনী অতিক্রম করলে সহস্রাধারের স্থান। যেখানে অবস্থান করলে সাধকের সর্বদা ওঁকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। আজ্ঞাচক্রে অবস্থানকালে নানারূপ শব্দ শোনা যেতে পারে, যা আমাদের শরীরস্থ নভশ্চর নামক বায়ুর কাজ। এই বায়ুও সেই 'আমি' থেকেই সৃষ্ট। যেমন — আকাশে বিরাজ করলে নানারূপ শব্দ শোনা যায়, কিন্তু তার ঊর্দ্ধে বিরাজ করলে অনাহত নাদ বা ব্রহ্মধ্বনি ছাড়া কিছু শোনা যায়না। আমাদের দেহে অবস্থিত এই পুরুষের দ্বারাই বা প্রাণের দ্বারাই সকল কার্য্য হয়ে থাকে, এবং তাঁর দ্বারাই ও তাঁর কৃপায় তাঁর সঙ্গে মিলতে পারা যায়।

**পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।**
**জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের দেহে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অবস্থিত। (অর্থাৎ, নাভির নিম্নদেশ হল পাতাল। নাভির ঊর্দ্ধদেশ হল মর্ত্য।) যা কণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত, তার উর্দ্ধদেশ হল আকাশ। এই পাতাল ও মর্ত্য নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্য পর্যন্ত হল পৃথিবী। আমাদের দেহস্থিত ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে গন্ধবাহ নামক একটি বায়ু রয়েছে। তার দ্বারা আত্মকর্ম করবার সময় আমরা নানারূপ সুগন্ধ অনুভব করে থাকি। এই কারণে তিনি পৃথিবীর মধ্যে গন্ধস্বরূপে বিরাজ করছেন এবং কণ্ঠের নীচে অবস্থান করার জন্য নানারূপ চঞ্চলতার সৃষ্টি করছেন। এর মাধ্যমে আমাদের মন সেদিকে ধাবিত হচ্ছে এবং নানারূপ বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। নাভি হল পৃথিবীর কেন্দ্রমূল। পৃথিবীর কেন্দ্রমূলে সর্বদা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড জ্বলছে সেইরূপ আমাদের নাভিমধ্যস্থিত জঠরাগ্নি সর্বদা জ্বলছে; এবং তেজের বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। এর কারণে কথা-বার্তায় বা কোনরূপ শব্দ শ্রবণের মাধমে আমাদের দেহে এই তেজ বা ক্রোধ জন্মাচ্ছে। অধিক ক্রোধ প্রকাশ পেলে নাভিস্থিত তেজ ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হয়ে শরীর গরম করে তোলে। সাধকের সাধনকালে এই তেজ জঠরাগ্নি থেকে ব্রহ্মাগ্নিতে উৎপন্ন হয়ে প্রাণকে উর্দ্ধদেশে চালিত করে কণ্ঠে ধারণ করেন, তখন তিনি হন প্রকৃত সাধক। এরপর পৃথিবী পরিত্যাগ করে যখন তিনি আরও উর্দ্ধদেশে গমন করে আকাশে বা আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি হলেন তপস্বী। ঐ আকাশে আসন পেতে ধ্যান অর্চনার দ্বারা তপস্যা করলে তা থেকে যে তপঃ সাধিত হয়, তা আরও ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন। এরপর ঐ জ্ঞানী জ্ঞান আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আরও ঊর্দ্ধদেশে গমন করে জ্ঞানলোকে বা ব্রহ্মলোকে মিলিত হয়ে যান। অর্থাৎ 'আমাতে আমি' মিলিয়ে যায়। এই সকল সাধক মৃত্যুকে চিনে, তাকে জেনে, তাতে মিলে তাকে জয়লাভ করেন। এইসকল ব্যক্তি মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, তপস্বী, সাধক বা যোগী পদবাচ্য।

**বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।**
**বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—**( সূর্য হল সৃষ্টিকর্তা। তা থেকে সকল গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। তার আলোকে সকলে আলোকিত, তার আকর্ষণে সকলে চালিত। সেই জ্যোতির্ময় সূর্য্য আত্ম-জ্যোতিরূপে সকল জীবদেহে অবস্থান করছেন। তিনি সকল দেহে বীজরূপে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছেন। তাই জীবের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সূর্য্যরূপী প্রাণবায়ু জীবদেহে সপ্ত অশ্বদ্বারা সজ্জিত রথে অবস্থান করছেন। এই সপ্ত অশ্ব হল সাতটি বায়ু। যথা ঃ— ১। প্রাণবায়ু ২। অপান বায়ু ৩। সমান বায়ু ৪। ব্যান বায়ু ৫। উদান বায়ু ৬। গান্ধারী স্থির বায়ু ৭। হস্তিনী স্থির বায়ু।

এইভাবে দেহের মধ্যে অবস্থান করে তিনি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, জ্ঞানীর জ্ঞান হয়ে নিজের ভাব ব্যক্ত করছেন। তাঁর ভাব ব্যক্তাবস্থায় থাকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত। তার ঊর্দ্ধে সকল কিছুই অব্যক্ত। তিনি এই দেহের মধ্যে অবস্থান করে সকল কিছু চালনা করছেন। তাই তাঁকে জানবার জন্য যে সকল তপস্বী বা যোগী সাধনা করছেন এবং সাধনা করে তাঁকে জেনেছেন, সেই সকল তপস্বী বা যোগীর তেজরূপে তিনি বিরাজমান।)

**বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম।**
**ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।।১১**
**যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।**
**মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** যে সকল তপস্বী ও যোগী তাঁকে জেনেছেন, তাদের জ্ঞানরূপে তিনি তাদের মধ্যে আছেন। আবার তাদের এই আত্মধর্ম পালনের জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে মেশার জন্য যে কামনা মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তিনি তাদের মনের সেই কামনা বা আত্মকামরূপে অবস্থান করছেন। যেমন ঃ— আত্মকর্ম করবার জন্য জন্মদাত্রীরূপী মাতা বা জন্মদাতারূপী পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করলে তা পাপ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ জন্মদাতারূপী পিতা অপেক্ষা জন্মরহিত পিতা অধিক বড়। সেই আত্মা যেহেতু তাদের মধ্যে ও

আমার মধ্যে রয়েছে, সেহেতু সেই 'পরম আমি'র কামনা হেতু তাদের আজ্ঞা না মানলেও তা পাপ বলে পরিগণিত হয় না। তিনি একদিকে জ্ঞানীর জ্ঞানপুত্র রূপে, আবার যোগীর যোগবল রূপে তাদের মধ্যে বিরাজমান।

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হতে গেলে বহু কঠোর তপস্যা করতে হয়। আর শুধু গুরুপ্রদত্ত উপদেশ পালন করলেই হয় না, তার সঙ্গে থাকা উচিৎ একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের আকুতি জানানো প্রত্যেক সাধকের বা সাধিকার একান্ত উচিৎ। আর বিশেষভাবে উচিৎ নিজেকে শুধু ক্রিয়ার মধ্যে নয়, ক্রিয়ার মতন করে গড়ে তোলা — অর্থাৎ ক্রিয়া করলেই মন হতে সকল বন্ধন ঘুচে যাবে—তা নয়, তার জন্য নিজের জীবনে বিশেষ ত্যাগের প্রয়োজন হয়। যেমন—আমরা যে সময় ক্রিয়া করার, সেই সময় গুরুদেবের দেওয়া সংখ্যা পূরণ করে কোন রকমে পাট সারার কাজ শেষ করে আবার পারিপার্শ্বিক বিষয় সকলের উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং তাকে পাবার চাহিদা ভিতরে ভিতরে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে থাকি। কারণ একটাই — আমরা তিনগুণের ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসি।

১। **সাত্ত্বিক**

২। **রাজসিক**

৩। **তামসিক।**

এই তিনগুণ আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত এবং আমাদের মনকে এই তিনগুণ সদাসর্বদা আবৃত করে আছে। আর আমরাও সাময়িক সুখের লালসায় তার গন্ডীর মধ্যেই বন্দী হয়ে আছি। সেই বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে চাই না। তাই আমাদের মত অহং-ইত্যাকার মনরূপী মানুষদের সাধনক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অবস্থান করা হয় না। উচ্চস্থানেই বা কেন? সেই ক্ষেত্রেই অবস্থান করা যায় না।

মনুষ্যদেহে এই তিনগুণের অবস্থান সম্পর্কে বলি। যেমন ঃ—

১। **সাত্ত্বিক** — এটা আজ্ঞাচক্র থেকে কণ্ঠদেশ অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্য পর্যন্ত

বিস্তৃত। এর কাজ হল শম এবং দম, অর্থাৎ শম হল মনকে স্থির করা এবং দম হল ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করা।

২। **রাজসিক** — এটা বিশুদ্ধাখ্য থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কাজ হল দেহে হর্ষ এবং দর্পের সৃষ্টি করা। হর্ষ অর্থাৎ আনন্দ এবং দর্প অর্থাৎ অহঙ্কার।

৩। **তামসিক** — এটা মণিপুর থেকে মূলাধার পর্যন্ত্য বিস্তৃত। এটার কাজ হল শোক এবং মোহ উৎপন্ন করা। শোক অর্থাৎ দুঃখ এবং মোহ অর্থাৎ মায়া-মমতা।

সাধককে সাধনায় উন্নীত হতে গেলে এই ত্রিগুণ রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে।

সবার আগে প্রাণকর্ম করতে করতে যখন শ্বাস আর নাভির নিম্নে গমন করবে না, তখন জানতে হবে সে তমোগুণকে ছেড়ে এখন রজোগুণের মধ্যে অবস্থান করছে। এরপর যখন শ্বাস কণ্ঠে স্থির হবে, যখন গমনাগমন কেবলমাত্র দুই ভ্রূ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে—তার নীচে আর আসবে না, তখন জানতে হবে যে সাধক রজোগুণ অতিক্রম করে এখন সাত্ত্বিকগুণের মধ্যে অবস্থান করছে। এরপর আজ্ঞাচক্র ছেড়ে যখন শ্বাস আরও ঊর্দ্ধে অবস্থান করবে, তখন জানতে হবে যে সাধক ত্রিগুণরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।। তখন আর তার মধ্যে কামনা-বাসনা দানা বাঁধতে পারে না। কারণ তাঁর শ্বাস তখন কণ্ঠের উপরে অবস্থান করছে। অতএব এই গুণসকলই তার দেহের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু সে নিজে তার সঙ্গে লিপ্ত নয়। সেইরূপ এই তিনগুণ সেই 'পরম আমি' থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তার মধ্যেই আছে, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যুক্ত নন।

**ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।**
**মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩**
**দৈবী হ্যেষ্যা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।**

**মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪**
**ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।**
**মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণজীব পূর্বশ্লোকের উল্লিখিত তিনগুণের মধ্যে সর্বদা আবদ্ধ হয়ে আছে। ক্ষণিকের ভাল, ক্ষণিকের সুখ তাদের দৃষ্টি সকলের উপর মায়ার পর্দা ফেলে রেখেছে। ঐ তিনগুণের মায়ার পর্দায় আকৃষ্ট হয়ে মনুষ্যগণ সংসার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে চরকির মত পাক খাচ্ছে। এই মায়া তাদের দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে রেখেছে। এর ফলে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বা শূণ্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে না তাই মিলিত হতে পারছে না।

এই মায়াজাল থেকে সাধকের মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ ইন্দ্রিয়সকল এই ত্রিগুণের দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করতে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় দেখা যায় ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁকে পাবার চিন্তা ইত্যাদি অধিক করলে হঠাৎ কোথা থেকে নানারূপ সাংসারিক জটিলতা এসে উপস্থিত হয় এবং আমাদের মতন এই সাংসারিক জীবদের নাকানি চোবানি খাইয়ে দেয়। এর ফলে মনের মধ্য থেকে ঈশ্বরের চিন্তা কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকে এবং তখন আমরা ভুল করে তাঁর নিকট সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করি— এই প্রার্থনা করি না যে,—'যা হয় হউক, তোমার কাজ আগে সঠিক ভাবে করে যেন উঠতে পারি'। এর ফলে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ি আর বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হতে পারি না। সেই বাধা কেটে গেলে অপর একটি এসে হাজির হয় এবং তার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আবার আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাই— অর্থাৎ আমরা সদাসর্বদা তাঁর কাছে বন্ধনের মধ্যে থেকে সেই বন্ধনের দ্বারা অর্জিত কর্মফল হতে উৎপন্ন বাধা হতে মুক্ত হতে চাই। কিন্তু বন্ধনদশা হতে মুক্ত হবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি না। তার ফলে তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এই দুস্তর মায়াজালে আবর্তনের মধ্যে পড়ে শুধু ঘুরে মরতে হয়, চরকির মত। তা থেকে মুক্ত হয়ে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ করতে মনোমধ্যে ইচ্ছা হয় না এবং সর্বজ্ঞ ব্যক্তির মত উক্তি করি যে 'আমার

দ্বারা হবে না' বা 'এ জন্মে আর হবে না'। কিন্তু একবারও বলিনা তিনি এই দেহের মধ্যে যখন অবস্থিত তখন আমার হবে না কেন?

নিজেকে নানারূপ অজুহাতের দ্বারা আবৃত করে সর্বদা নীচে অর্থাৎ পাপাসক্ত মনের মধ্যে আটকে রেখে আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে তারা কর্ম করতে অধিক কামনা করে। এর ফলে তারা তিনগুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সর্বদা পাপশীল এবং নরাধমরূপী ইচ্ছার দাস হয়ে সর্বদা অধোদেশে পড়ে থাকে ও ভাবের রাজ্যে বিরাজ করে, ভাবাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। এর ফলে তারা আর নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে পায় না। তা তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

**চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।**
**আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।১৬**
**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।**
**প্রিয়ো হি জ্ঞানীনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** উপরিউক্ত তিনগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিসকলের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। যে সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের আদেশ মতন তাঁর সম্মুখে অবস্থান করে, তাঁর নির্দিষ্ট পথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অবলোকন করে, মোক্ষপ্রাপ্তির আশা রেখে চলেন, সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা বা সেই সকলরূপ ব্যক্তির জ্ঞানকর্মরূপ সাধন দ্বারা সেই পরম 'আমি'র আরাধনা করা সম্ভবপর হয়। এই সকল ব্যক্তি অর্থার্থী ব্যক্তি পদবাচ্য।

ঈশ্বরের কাছে সকল ব্যক্তিই প্রিয়, কারণ যেহেতু সে তাঁর হতেই সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি হল শ্রেষ্ঠ, কারণ সে সদা সর্বদা মগ্ন চিত্তে তাঁর আরাধনা বা আত্মধ্যান করে তাতে মিশে থাকতে অধিক ভালবাসে। সেই হেতু সেই সকল ব্যক্তি তাঁর অধিক প্রিয়।

যেমন ধর, কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে তুমি তাকে বুঝে তার সঙ্গে মিশে গেলে, তার উপস্থিতি তোমার ভাললাগে, তার সঙ্গে মনের

কথা বলতে ভাললাগে, তাঁকে সকলের থেকে অধিক প্রিয় বলে মনে বিবেচিত হয়, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতেও অধিক ভাললাগে এবং মনে আনন্দের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত আলোচনাটির উদাহরণ হল এইরূপ যা জ্ঞানীর সঙ্গে সেই 'পরম আমি'র। কারণ জ্ঞানী যেহেতু তাকে জানতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে এবং মিশতে পেরেছে তাঁর অধিক সঙ্গ করতে তার ইচ্ছা হয়। এই জন্য জ্ঞানী তাঁর অধিক প্রিয়।

**উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।**
**আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।।১৮**
**বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।**
**বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।১৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** জ্ঞানীব্যক্তি আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে তাঁর স্বরূপ জানতে পারেন। এর ফলে আত্ম সম্বন্ধে তাঁর জানার আর কিছু বাকি থাকে না। তখন তিনি নিজেই আত্মাস্বরূপ বা ব্রহ্ম স্বরূপ। সেইজন্য তিনি চারিপ্রকারের লোক, যারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন—তা থেকে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানীগণ "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই দর্শে দৃষ্ট। তিনি সমুদয় জগৎকে বাসুদেবময় দেখতে পান। জ্ঞানী হওয়া খুব সোজা কথা নয়। জ্ঞানী হতে গেলে—প্রতিবার যে শ্বাস আমাদের বাইরে বেড়িয়ে যাচ্ছে — তাকে অন্তর্মুখী করা একান্ত দরকার, কারণ বহির্গমনমুখী শ্বাসের মধ্যে আমাদের অজপা রয়েছে। তাই হল আমাদের বা জীবদেহ সকলের আয়ু। এই আয়ু শেষ হয়ে গেলে জীব দেহত্যাগ করে। তাই বহিঃ প্রাণায়ামরূপী শ্বাসকে ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী করতে হবে। কারণ বহিঃপ্রাণায়ামরূপী শ্বাসের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে না। সত্যিকারের বা সঠিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটাতে গেলে অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে হবে। এইভাবে শ্বাসকে ক্রমান্বয়ে গুরূপদিষ্ট সাধনাভ্যাসের দ্বারা উল্টো করে সুষুম্না নাড়ীপথে চালনা করে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিতিলাভ করলে তবেই জ্ঞানী হওয়া সম্ভব। এটা কোন একদিনের কর্ম নয় বা একজন্মের কর্ম নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে ক্রমান্বয়ে চেষ্টার দ্বারা ও কঠোর সাধনার দ্বারা তবেই এই অবস্থায় পৌঁছান

যায়। তখন তিনি হন মহাত্মা পদবাচ্য।

**কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।**
**তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০**
**যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।**
**তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।২১**

**তাৎপর্য্যঃ**— সাধারণ মানুষগণ জ্ঞানীর মতন সর্ববিশ্বকে বাসুদেবময় দেখতে পারে না। তারা নিজের বোধসকল কাজে লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতন কার্য্য করে নিজেদের পছন্দমতন সকল নিয়মকানুন ও আচার অনুষ্ঠানাদি তৈরী করে এবং সেইমতই নিজেদের কাজ করে চলে। ফলে তাদের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। তাঁরা নানারূপ দেবদেবীর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সকলের মূলে যে 'পরম আমি' — তার কথা ভুলে গিয়েছেন। তাঁরা অসুখ করলে,সন্তান লাভের জন্য, অগ্নিভয়ের জন্য, সুখে থাকার জন্য, বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য, শত্রুনিধন করা ইত্যাদি কামনা সিদ্ধ করার জন্য—যথাক্রমে মা শীতলা, মা ষষ্ঠী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী বা দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্ত্তি অর্চনা করে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তির ভন্ডামি দেখিয়ে উদ্ধারলাভ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে উদ্ধার আর তাদের লাভ হয় না।

সাধারণ জীব তর্কের খাতিরে হয়তো বলতে পারে — যেহেতু সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু- পরমাণুতে যদি তাঁর অবস্থান থেকে থাকে, তা হলে এই মূর্ত্তি আদি রচনা করে তাঁর পূজার্চনা করলে ফলপ্রাপ্তি হবে না কেন?

তখন বলতে পারা যায় যে — সকল কিছুর মধ্যে যেহেতু বাসুদেব রয়েছেন, সেইহেতু কোন মূর্ত্তির অর্চনা করলে তাঁরই মূর্ত্তির অর্চনা করা হয় এবং তা থেকে ফলও লাভ করা সম্ভবপর হয় যদি তা কামনা-বাসনা বর্জিত বা কামনা-বাসনা শূন্যভাবে তাঁর অর্চনা করা যায়।

তখন সাধারণ মানুষ যে যে দেবতারূপে কল্পনা করে তাঁকে গড়ে, তাঁর পূজার্চনা করে. ভক্তি ও শ্রদ্ধা মনোমধ্য হতে কামনাশূন্য ভাব যদি তাঁর নিকট অর্পণ করে, তা হলে সেই 'পরম আমি' তাদের সেই আচার ও শ্রদ্ধানুযায়ী

ফলের বিধান করেন।

এই দেবার্চনা শ্রদ্ধাপূর্বক করতে পারলে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটতে পারে। এর পর সদ্‌গুরু লাভ হলে তাঁর দ্বারায় গুণাতীত অবস্থা তিনি প্রাপ্ত হতে পারেন। মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা হয়। এতে চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র, গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে হলে সদ্‌গুরুকরণ আবশ্যক। যেমন দেওঘরের বাবা তাঁর গীতায় যে উদাহরণটি দিয়েছেন তাই তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন — "রামপ্রসাদ সেন পূর্বে কালী উপাসনা করতেন, পরে তাঁর সদগুরুলাভ ঘটে এবং তিনি একজন সাধক বলে বিখ্যাত হন। তখন অর্থাৎ সদ্‌গুরুলাভের পর তাঁর দ্বারা অন্যপ্রকার সঙ্গীত রচিত হয়। যেমন —

"এবার এক ভাব ভেবেছি।
এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নেই মা —
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
এক তারার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্মাধর্ম সব ভুলেছি।"

**স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।**
**লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান হি তান্।।২২**
**অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।**
**দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষ আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা যদি দেবতার বা মূর্ত্তির পূজার মধ্য দিয়ে তার প্রতি অর্চনা সঠিক ভাবে করে, তা হলে ঈশ্বর তার সেই সকল প্রার্থনা তার বিশ্বাসের হেতু মঞ্জুর করে দেন। তখন ঐ সকল দেবতা বা ঐ স্থানের দেবতা জাগ্রত দেবতারূপে পরিগণিত হন, যা এই সাধারণ মানুষদের দেওয়া নাম। সকল ঈশ্বরই, সকল দেবতামূর্ত্তি, সকল অণু-পরমাণুই সদাসর্বদা জাগ্রত। কেবলমাত্র নিদ্রিত আমাদের এই মন। তাই তারা সম্মুখের যা কিছু বস্তু হাতের কাছে পায় এবং অলসতার দরুণ কম কষ্টে লাভ হয়-তাই

করে। কঠোর পরিশ্রম করতে তারা চায় না।

দেবতামূর্ত্তির উপাসনা করে (বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম একান্ত দরকার) যে সকল কামনা ঈশ্বরের নিকট সে করে, ঈশ্বর তার সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে তার সেই কাম্য বস্তু প্রদান করেন।

গুরুকরণের পর গুরুদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হলে তখন তাকে এই মূর্ত্তিরূপ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ হতে হয় না। মূলবস্তুরূপ আত্মনারায়ণের উপাসনা করে তার দ্বারা তাঁকেই পাওয়া হয়ে থাকে।

দেবতারূপ মূর্ত্তির কাছ থেকে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের দ্বারা কোন বস্তুর প্রাপ্তি ঘটলে তা চিরজন্ম থাকে না। কারণ তা অস্থায়ী কামনার জন্য সেই কাম্য বস্তু লাভ হয়েছে। তাই তা আজ থাকলেও কাল নাও থাকতে পারে। যেমন তুমি হঠাৎ করে ঈশ্বরের নিকট বিশেষ কামনার মাধ্যমে একটি লটারীর টিকিট পেলে এবং তার প্রথম পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি পেলে। সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা সারাজীবন থাকবার নয়। তা কাল পূর্ণ হবার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। তখন কি হবে?

তাই গুরূপদিষ্ট পথে যদি তুমি আত্মনারায়ণকে পাও বা তার সাথে মিশতে পার—তাহলে আদি, অনাদি, অনন্তকালে তুমি তার সঙ্গে মিশেই থাকবে, তা থেকে বিচ্যুত তুমি কখনও হবে না। তাঁর নির্দেশে যদি তোমার পুনরায় জন্ম হয়, তা হলেও তুমি তাঁর থেকে বিচ্যুত হবে না এবং ঐ অবস্থায় থেকে তোমার সকল কর্মফল সেই 'পরম আমি'তে লয় হয়ে যাবে, কোন কর্মফল সৃষ্ট হবে না ও মৃত্যুর পরও তুমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে।

**অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।**
**পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪**
**নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।**
**মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মক্রিয়া বা প্রাণেরক্রিয়া করতে গেলে, সেই পরব্রহ্মকে জানতে গেলে সদ্গুরুকরণের বিশেষ আবশ্যক। সদ্গুরুর দ্বারাই

সেই আত্মার প্রকাশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি কূটস্থগহ্বরে সেই আত্ম-নারায়ণের প্রকাশ ঘটিয়ে সাধককে তা দর্শন করিয়ে দেন। সেই গুরূপদিষ্ট পথে তাঁর আদেশ উপদেশ ইত্যাদির দ্বারা পথ চললে এবং নিজের সংযম, ক্ষমতা ও জেদের দ্বারা মনের কামনা-বাসনাকে দমিত করে রাখতে পারলে গুরূপদিষ্ট এই যোগপথে সাধক সাধিকারা অগ্রসর হতে সক্ষম হন। গুরুকরণের পরও, আত্ম-নারায়ণের দর্শন পাবার পরও সাধারণজীব যেহেতু ত্রিগুণরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত এবং কামনা-বাসনার বেড়াজালে বদ্ধ, সেহেতু তারা পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে তাদের মতন মায়িক জীব হিসেবে কল্পনা করে। তিনি যে মায়ার অতীত এবং তিনি যে ভাবাতীত হয়ে পরব্রহ্মস্বরূপ নিরঞ্জন, তা তারা ভাবতে বা বুঝতে পারেন না। কারণ মায়ার দ্বারা আবৃত থাকার জন্য তারা সেই পরম পুরুষকে চিনতে পারেন না বা চিনতে জানেন না।

জীবদেহ মনুষ্যজন্ম ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সুষুম্না নাড়ী ত্যাগ করে। এর ফলে যে স্থির সাম্যাবস্থায় সে যুক্ত ছিল, সেই যুক্ত অবস্থা থেকে সে ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্বাস তখন অন্তর্মুখী থেকে বহিঃর্মুখী হয়ে পড়ে এবং কামনা-বাসনার জন্ম হয় — অর্থাৎ স্থির পরব্রহ্ম থেকে তখন সে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যোগাবস্থা থেকে ছিন্ন হয়ে মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করে এবং প্রাণ মায়ার আবরণে ধীরে ধীরে আবৃত হয়ে পড়ে ও প্রাণে চঞ্চল ভাবের সৃষ্টি হয়। এই মায়া হল ভগবান শ্রী আত্মনারায়ণের যোগমায়া। এই মায়ার আবরণের জন্যই পরমভাব তার নিকট প্রকাশিত হয় না। পরমভাবকে জানতে হলে যোগমায়াকে অতিক্রম করতে হবে। সাধারণ জীব এই যোগমায়ার আবর্তন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কামনা-বাসনার জন্য সংসাররূপী বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে থাকে। এর ফলে সেই 'পরম আমি' রূপ আত্মতত্ত্ব তার কাছে অধরাই থেকে যায়। জন্মরহিত যে স্থির নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাকে অস্বীকার করে বা তাকে মানতে চায় না। চঞ্চলাবস্থারহিত হয়ে যে স্থির অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানতে পারেন—বাকি সকলে তা জানতে পারেন না। তাই যিনি তাঁকে জানতে পারেন—তিনিই হলেন জ্ঞানী পদবাচ্য এবং আর সকলে মূর্খ পদবাচ্য।

**বেদাহং সমতীতানি বৰ্ত্তমানানি চাৰ্জ্জুন।**
**ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।২৬**
**ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।**
**সৰ্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।২৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মাকে জেনে বা তাকে চিনে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানী হয়েছেন সেই সকল ব্যক্তি ত্রিভূত সম্পর্কে জানতে পারেন, অর্থাৎ জ্ঞান অবস্থায় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই তাঁর কাছে অধরা বা অজানা থাকে না। তার ফলে তাঁর কাছে নিজস্ব ভূত সকলাদি জানতে পারেন। যেমন তিনি পূর্বে কোথায় ছিলেন, কোথা থেকে এসেছেন, বৰ্ত্তমানে কোথায় রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কোথায় যাবেন। তেমনি, তিনি অপর অর্থাৎ সাধারণ জীবসকলের ত্রিভূত বা ত্রিকাল সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সকল ব্যক্তি ত্রিকাল জানতে পারেন বলে এই সকল ব্যক্তিকে ত্রিকালজ্ঞ বলে। এঁরা ব্যতীত অপর কেউ তাঁকে জানতে বা বুঝতে বা কোথা থেকে এসেছেন বা কোথায় যাবেন তা জানতে পারে না। এই সকল জ্ঞানী আত্মভাবে থাকার জন্যই ভূতসকল জানতে পারেন আর অপর ব্যক্তিগণ ভূতভাবেই অর্থাৎ বৰ্ত্তমান ভাবে থাকার জন্য তারা নিজ সম্পর্কে — অপরের সম্পর্কে জানতে পারে না।

মনুষ্যদেহে তিনগুণের প্রাধান্য আছে বলে তারা যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত যেহেতু মনের স্থান — তার ঊর্দ্ধে যেহেতু নয় — সেহেতু কণ্ঠের নীচে যখন শ্বাস থাকে তখন সেই সকল ব্যক্তি বা আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিগণ মনের ইচ্ছার দাস হয়ে তার দাসত্ব করে। এর ফলে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জন্ম নেয় সেইজন্য বিবেকরূপ বিতরাগ তাদের আসে না। নিজে যা ভাল বুঝবেন সেইগুলিকে তারা সঠিক বলে মনে করেন এবং সেই পথে চলেন। তাই পদে পদে আঘাত পান। 'বিবেক বীতরাগ' কথার অর্থ হল আসক্তিশূন্য অবস্থা। এর ফলে মানুষ মোহে আবৰ্ত্তিত হয়ে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে। সেই বন্ধন ছিন্ন করে আত্মাকে দেখতে বা চিনতে পারেন না।

**যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।**
**তে দ্বন্দ্ব মোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮**
**জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।**
**তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্।।২৯**
**সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।**
**প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।।৩০**

**ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ।**

**তাৎপর্য্যঃ**— গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম বা আত্মকর্ম যারা নিষ্ঠার সঙ্গে করেন, তারা পুণ্যবান্ পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি হলেই তা পাপ। প্রাণকর্মের দ্বারা সেই পাপ বা ইন্দ্রিয়দমন কার্য্য যেহেতু তাঁরা করছেন, সেহেতু তারা পুণ্যবান্ এবং তাদের দ্বারা কৃত এই প্রাণকর্ম হল পুণ্যকর্ম। এর মাধ্যমে মনোমধ্য হতে পাপ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তখন মনোমধ্য হতে দ্বন্দ্ব, ভয়, মায়া-মোহ ইত্যাদি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। এইভাবে গুরূপদিষ্ট পথে তাঁর আদেশানুযায়ী প্রাণকর্ম নিষ্ঠা, যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করলে এবং একান্তভাবে সেই কর্মকেই চাইলে বা তাতে আসক্ত হলেই মনোমধ্য থেকে কামনা-বাসনার নাশ হয়, অর্থাৎ ইচ্ছার নাশ হয়।

তখন ভববন্ধনরূপ এই ব্যাধি বা জীবন-মৃত্যুরূপ এই বেড়াজাল ছেদন করে লতানে গাছের মতন আত্মরূপ বটবৃক্ষতে জড়িয়ে তাকে আশ্রয় করে তাঁর উপদেশ ও আদেশের মাধ্যমে একান্ত যত্নসহকারে সাধনা করলে তখন সাধক আত্মবিষয়ক সকল রহস্য জানতে পারেন। তখন আত্মার সঙ্গে বা পরমগুরুর প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে তাতে লয়প্রাপ্ত হন। এই সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালে এবং দেহত্যাগ করবার সময় পরমগুরুর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন এবং সেই পরমগুরুদেব তাকে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

**— ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ সমাপ্ত —**

**—ঃ ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

## অক্ষর ব্রহ্মযোগ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
আধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।।২
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।।৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।৪

তাৎপর্য্যঃ— মূলাধার হল ক্ষিতিতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত্তিকা, স্বাধিষ্ঠান হল জলতত্ত্ব অর্থাৎ জল। মৃত্তিকার উপর জল অর্থাৎ মৃত্তিকা জলকে ধারণ করে আছে। এর উপর মণিপুর চক্র অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব। সেখানে প্রাণপুরুষ বা মহাপ্রাণরূপ পুরুষোত্তম শয়ন করে আছেন। তিনি শয়ন করে আছেন বলে অজপারূপ শ্বাস- প্রশ্বাসের গতি বিস্তার হচ্ছে। এখানে সেই পরমপুরুষোত্তমের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাগ্নির সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্যনাড়ীর দ্বারা এবং চন্দ্রনাড়ীর দ্বারা এই নাভিমূল যুক্ত। এর ফলে সূর্য্যনাড়ীস্থিত বায়ুর দ্বারা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে চঞ্চল প্রাণের রস সঞ্চারণকারী ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করা হয় বা তাদের ইন্ধন জোগান হয়। এর ফলে মায়া-মোহ, কামনা-বাসনারূপ ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং দেহস্থিত বায়ু চন্দ্রনাড়ীর দ্বারা বাইরে বেড়িয়ে যায়। এর ফলে ক্রমশঃ আমরা যে প্রাণের সহিত বা আত্মার সহিত যুক্তাবস্থায় ছিলাম তা ধীরে ধীরে ভুলে যাই ও মায়া-মোহের আবর্ত্তে আবৃত হয়ে বন্দী হয়ে পড়ি।

স্থির প্রাণরূপ পরব্রহ্ম হল জগতের মূলস্বরূপ। এর কোন ক্ষয় নেই। তাই একে অক্ষর বলে। এর সঙ্গে বা এই পরব্রহ্মের সঙ্গেতে যুক্ত হয়ে আত্মভাব প্রাপ্তি হয়, এই ভাবকেই অধ্যাত্ম বলে।

মনুষ্যদেহ ধারণ করবার পর তা যুক্তাবস্থা খণ্ডন করে ভূতসকলের মধ্যে আটকে পড়ে। এর ফলে সেই ভূতসকলের উৎপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাকে জড়িয়ে ধরে। আত্মকর্মের দ্বারা মন যখন এই সকল ভূত থেকে নিবৃত্তি পেয়ে ব্রহ্মাভিমুখে গমন করে, তখন 'আমি-আমার' বোধরূপী সত্তা কিছুই উপলব্ধি হয়না। এই অবস্থাকে প্রলয়ের অবস্থা বলে এবং সেই অবস্থা থেকে মন নীচে নেমে এলে বা নিম্নগামী হলে ভূতসকলের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় সাধক যা কিছু করেন তাই কর্ম বলে বিদিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়ে যখন সাধক স্থির হয়, তখন তার 'আমি-আমার' বোধ থাকে না। সেই সময় সবকিছুই তাঁর কাছে ব্রহ্ম বলে বিদিত হয় এবং এরপর সেই অবস্থা হতে নীচে নেমে এলে তখন আবার তাঁর দেহবোধ জাগ্রত হয় এবং কর্মের সহিত যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় তিনি যা কিছু করেন তাই কর্ম বলে বিদিত হয়।

প্রাণের যে তেজ তা ব্রহ্মাগ্নি থেকে উদ্ভূত বা নাভি বা মণিপুর হতে উদ্ভূত। নাভি হতে প্রাণ বের হয়ে গেলে মনুষ্য দেহ শবদেহে পরিণত হয়। এই মণিপুর চক্রে পৃথিবীরূপ দেহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। একে স্থিরপ্রাণরূপ কূটস্থচৈতন্য সর্বদা অধিকার করে রেখেছেন। এইজন্য একে অধিভূত বলা হয়ে থাকে।

কণ্ঠ পর্যন্ত হল দেবতাদের স্থান। এর ঊর্দ্ধে কূটস্থচৈতন্যরূপী পুরুষ বা পরব্রহ্মের স্থান। তিনি হলেন সূর্য্যের চেয়েও অধিক জ্যোতির্ময় এবং গুণাতীত ও তা থেকে সকল গুণাদি সম্পন্ন দেবতাগণের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তাঁর অভাবহেতু এই দেবতাগণের কোন অস্তিত্ব থাকে না। আবার ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণও তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। এই কারণে তাঁকে অধিদৈবত বা দেবতাদের অধিপতি বলা হয়ে থাকে।

আজ্ঞাচক্র হল শূন্যতত্ত্ব। এই আজ্ঞাচক্রেই অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি রূপেই তিনি অবস্থান করছেন। এই স্থানেই প্রাণকর্মরূপ যজ্ঞের কর্মক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্রে প্রাণকর্মরূপী যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁকে অধিযজ্ঞ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনিই এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা।

আবার তাঁর থেকেই স্থিরপ্রাণরূপ প্রাণকর্মের অবস্থা এবং অজপারূপ প্রাণের চঞ্চলাবস্থা — দুই-ই সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জন্য তাঁকে যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বা অধিযজ্ঞ বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কর্ম কি, প্রলয় কি, ব্রহ্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈবত কি, এবং অধিযজ্ঞ কি?— তা জানতে পারা গেল।

**অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।**
**যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়।।৫**
**যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।**
**তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাবভাবিতঃ।।৬**

**তাৎপর্য্যঃ**— উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সকল কিছুই প্রাণ থেকে সৃষ্ট। যত দেব দেবীর মূর্তি আছে তাদের মধ্যে দেবগণ হল কূটস্থরূপী গহ্বর পরম পুরুষের রূপক এবং যত দেবী আছেন তারা হল কূটস্থ গহ্বরের সম্মুখে যে নক্ষত্র আছে সেই পরা প্রকৃতি।

মনুষ্য দেহ এই সকল সমন্বয়ে গঠিত। ভগবান শ্রী আত্মনারায়ণ বলেছেন দেহত্যাগের সময় তুমি যদি আমাকে স্মরণ কর এবং আমাকে মন-প্রাণ অর্পণ কর তাহলে তুমি আমাতে লীন হয়ে যাবে; সেহেতু আমরা কোন মানুষ দেহত্যাগ করলে তার চোখে তুলসী দিই এবং হরিনাম সংকীর্তন করে তাকে শ্মশান ঘাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাই। যাতে তার মরদেহের পূর্বাশ্রিত আত্মার গতি শ্রীহরির পদতলে অর্পিত হয়।

উপরিউক্ত এই আলোচনাটি থেকে এটা স্পষ্ট যে কোনরূপ উচ্চ গতি সেই আত্মার হয় না। কানের কাছে হরিনাম সংকীর্তন করলে প্রাণ না থাকার জন্য তা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। তাই সমগ্র অনুষ্ঠানটি বৃথা বিলাপ বলে পরিগণিত হয়। মনুষ্যদেহ যেহেতু কামনা বাসনার দাস বা অহং ইত্যাকার মনের দাস, সেহেতু প্রকৃত আত্মস্মরণ বা ঈশ্বর চিন্তা তার দ্বারা সম্ভব হয় না, কারণ তার সম্মুখে মায়া-মোহ রূপী পর্দা তার দুচোখ বন্ধ করে রেখেছে। সেই

চোখ উন্মোচিত না হওয়ার জন্য সঠিক ঈশ্বর চিন্তা তার দ্বারা হয়না।

প্রকৃত স্মরণ করবার জন্য সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। একমাত্র প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াযোগ বিদ্যার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন হতে পারে। প্রকৃত স্মরণ হলে চোখ, জিভ, ঠোঁট, কান, মন ও প্রাণ সকলই স্থির হয়ে যায়, কোনরূপ ভাবে তারা স্পন্দিত হয় না। সেই অবস্থায় মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ টানের অনুভব করা যায়। এর মাধ্যমে প্রকৃত স্মরণ হয়ে থাকে, তখন 'আমি-আমার' বোধ লোপ পায়। এই অবস্থায় থেকে যিনি দেহত্যাগ করেন সেই সকল ব্যক্তি 'আমি' নামক পরমব্রহ্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। এতে কোন সংশয় নেই।

সাধারণ জীব মৃত্যুর সময় মোহজাল থেকে যেহেতু বের হতে পারে না, সেহেতু তারা ঐ জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মোহের দ্বারা বিষয় সমূহে আটকে মনের মধ্যে যে কামনার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে থাকে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার ফলে সেই কামনার জন্য দেহান্তের পর সে সেইরূপ পরিবেশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, যেমন ঃ— ভরত রাজা মৃত্যুর পূর্বে মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, এর ফলে পরজন্মে তিনি মৃগযোনি প্রাপ্ত হন।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সঠিক রূপে যোগাভ্যাসের দ্বারা ভগবৎ চিন্তায় রত থেকে যদি কেউ দেহত্যাগ করেন তা হলে তিনি ভগবৎ প্রাপ্ত হন। তাই প্রতিটি প্রাণকর্মীর ভগবৎ চিন্তায় রত থাকা বিশেষ দরকার।

**তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।**
**মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্মাবৈষ্যস্যসংশয়ম্।।৭**
**অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।**
**পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮**

**তাৎপর্য্যঃ**— প্রাণকর্মরূপী ইন্দ্রিয়যুদ্ধ বা সাধন-সমরে যুদ্ধ করে সাধক

যদি মনবুদ্ধি পরম পুরুষের পদতলে অর্পণ করতে সমর্থ হয় বা লয় করতে পারে, তা হলে মনোবুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয়ে মনোমধ্য হতে অহং জ্ঞান দূরীভূত হয়। তখন মায়া মোহের জাল ছিন্ন করে সাধক পরব্রহ্মরূপী সেই 'আমি'তে মিলিয়ে যায় এবং সেই 'আমিই' হয়ে যায়।

প্রথমেই সাধকের এই অবস্থা বা ভাব প্রাপ্তি হয় না। একাগ্র চিত্তে গুরূপদেশ মত বহিঃচিন্তা দূর করে উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করলে ১২টি প্রাণায়ামেই প্রত্যাহার বা মনে একাগ্রতা এসে পড়ে, এইভাবে ধীরে ধীরে গুরূপদেশ মত প্রাণায়ামের সংখ্যা উত্তমরূপে বাড়িয়ে গেলে ধ্যানের ক্ষমতা বা সেই আত্মচিন্তা অনন্য মনে স্থির চিত্ত দ্বারা দিব্য পরম পুরুষের ধ্যান বা চিন্তা করতে করতে মন তখন তার সহিত আটকে যায়, তখন 'আমি আমার' বোধ কিছুই থাকে না। এই আত্মার সঙ্গে মন নিমগ্ন হয়ে থাকবার জন্য মন ধীরে ধীরে আরও উচ্চাবস্থা বা সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

**কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।**
**সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯**

**প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন**
**ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।**
**ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্**
**স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** উপরিউক্ত ভাবে প্রাণকর্ম করতে থাকলে ত্রিজগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব তার বোধে আসে এবং সেই শূন্যধাতুরূপ প্রাণের সঙ্গে মিলে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সহস্রারে অবস্থান করে এবং মৃত্যুকালে সেই সূর্য্যসম জ্যোতিঃরূপ উত্তমপুরুষকে দুভ্রূর মধ্যস্থিত কূটস্থে স্থির করে স্থির চিত্তে যোগবলের দ্বারা সুষুম্না নাড়ী পথের মাধ্যমে যিনি প্রাণকে চালনা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন— যা সম্পূর্ণ গুরুবক্তৃগম্য, গুরুদেবের উপদেশ, আদেশ ও কৃপা ব্যতিরেকে এই অবস্থায় পৌঁছান কোন সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়।

**যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি**
**বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।**
**যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি**
**তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১**
**সর্ব্বাদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।**
**মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২**
**ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।**
**যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অন্তর্গত বস্তু অজপারূপে প্রাণ অপানের মধ্য দিয়ে কার্য্য করছে। এই সকল বস্তুর কার্য্যরূপ তত্ত্ব জেনে আসক্তি শূন্য হয়ে যে সকল সাধক কূটস্থব্রহ্মাতে প্রবেশ করেন তারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, আর তাঁদের মন ব্রহ্মে বিচরণ করে সকল কার্য্য অনিচ্ছার ইচ্ছায় করছে বলে তাঁর সকল কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য পালনরূপ কার্য্যরূপে পরিগণিত হয়।

গুরুদেবের উপদেশ মতন প্রাণকর্ম করে জীবিত অবস্থায় মৃত্যুকে চিনে বা তাতে মিশে গেলে বা তাকে জয়লাভ করলে আর পুনরায় জন্ম হয়না। সেই পরমব্রহ্মরূপ বিষ্ণুরপদে আপন মন অর্পণ করে বা পিণ্ড দিয়ে চির মুক্ত অবস্থা জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুদেবের উপদেশ মত 'ওঁ'কাররূপী স্থিরের ক্রিয়ার দ্বারা শরীরস্থ সকল দ্বার বন্ধ করে বা বহিঃ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করতে না দিয়ে কূটস্থে তাঁর স্মরণ করে, প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ করে এই ধ্যান করতে করতে যিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ছেদন করে পরম গতি প্রাপ্ত হন, তিনি মুক্ত পুরুষ পদবাচ্য। দেহত্যাগ হবার পর তিনি সেই মুক্তাবস্থায় বা সেই পরমপদ প্রাপ্ত হবার জন্য তাতেই আটকে থাকেন।

**অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।**
**তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪**
**মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।**
**নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫**

**আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।**
**মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** জীবিতাবস্থায় থেকে গুরূপদেশ মত প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যিনি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি পরম ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকায় ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু দেখেন না। তখন শ্রীগুরু যোগীর যোগবলরূপে তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন। পরমপদরূপ স্থিরব্রহ্মের সহিত তিনি যুক্ত হয়ে থাকেন বলে তিনি যোগী পদবাচ্য। চঞ্চল আত্মাকে স্থির পরমাত্মায় লয় করে তিনি মহাত্মা পদবাচ্য হয়েছেন, এর ফলে তাঁকে আর আবর্তনশীল এই সংসার মরীচিকার ফাঁদে পড়তে হয় না অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগরূপ সংসার গহ্বরে আর পতিত হতে হয় না। পরমসিদ্ধি লাভ করবাব ফলে ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি আত্মার সহিত যুক্ত অবস্থায় থাকেন।

অপর সকল সাধারণ মানুষ যাদের আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে স্থিতিপ্রাপ্তি হয়নি তারা নিত্য নূতন কর্মফল সৃষ্টি করার জন্য এই আবর্তনশীল ধারার মধ্যে পড়ে; তাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং সংসাররূপ মায়াজালে ঘুরে মরতে হয়। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে যতক্ষণ না স্থিতি প্রাপ্তি হচ্ছে ততক্ষণ মুক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সাধকের আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়ে থাকে কিন্তু সেই স্থিতি প্রকৃতরূপ বা নিঃশেষ রূপ স্থিতিপ্রাপ্তি নয়। এ অবস্থা হতে সাধক নিম্নে পতিত হতে পারে। তখন সাধকের পুনরায় চঞ্চল ভাবের উদয় হয়, সেহেতু আবার নূতন কর্মফলের সৃষ্টি হয় এবং দেহান্তের পর আবার পুনঃ জন্ম হয়ে থাকে। দেহান্তের পূর্বে সেই পরম 'আমি'তে স্থিতি প্রাপ্তি ঘটলে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ হয় না।

**সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।**
**রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।।১৭**
**অবক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।**
**রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্মের দ্বারা সাধকের শ্বাস যখন আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে, তখন ঈড়া, পিঙ্গলা নাড়ীরূপী চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ীর শ্বাস ১০০০ করে বইতে থাকে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় মোট ২০০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। তখন ঐ অবস্থায় সাধক ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। শ্বাস আরও ঊর্দ্ধদেশে সুষুম্না নাড়ীতে স্থিতিলাভ করলে সূর্য্য ও চন্দ্রনাড়ী একসঙ্গে জুড়ে যায় অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ী দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হবার পরও সুষুম্না নাড়ীতে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, আবার চন্দ্র নাড়ী দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হলে তা আবার সুষুম্না নাড়ীতে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। দুই নাড়ীর মাধ্যমে শ্বাস ১০০০, ১০০০ করে ২৪ ঘন্টায় দুই হাজার বার গমনাগমন করে। এই উভয়ের যুগ্মভাবে যে স্থিতি হয় তাকে যুগ বলে এবং এইভাবে কাজ চলতে থাকে। এইভাবে সহস্রবার শ্বাস-প্রশ্বাস গতায়াত করে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন তিনি সহস্র যুগাত্মা। ব্রাহ্মণ যখন দিন রাত্রি যোগবলে বিদিত হন তখন তিনি অহোরাত্রবেত্তা রূপে পরিচিত হন।

ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আটকে থাকলে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে সাধক দিবা এবং রাত্রি সম্বন্ধে জানতে পারেন। এই দিনের শেষ এবং রাত্রির শুরু অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীর মধ্য দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হলে দিন হয় এবং চন্দ্র নাড়ীর মধ্য দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হলে রাত্রি হয়। এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে স্থিতি হয় তাও সুষুম্না নাড়ীতে আটকে থাকে— যা অজ্ঞানতাবশতঃ এই ঈড়া পিঙ্গলায় প্রাণ আটকে থাকার জন্য তাঁকে জানা যায় না। সুষুম্না নাড়ীস্থিত ব্রহ্মসূত্রে নিজের মনকে গ্রথিত করলে সেখানে প্রাণ আটকে যায় এবং গুরূপদিষ্ট 'ওঁ'কাররূপী প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণ ঊর্দ্ধে গমন করে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়।

**ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।**
**রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।।১৯**
**পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।**
**যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক বা ব্রাহ্মণগণ প্রাণকর্মের মাধ্যমে ঈড়া, পিঙ্গলার গতি সকল সম্বন্ধে বিদিত হন। 'ঈড়া' হল চন্দ্র নাড়ী এবং পিঙ্গলা হল

সূর্য্য নাড়ী। ঈড়া নাড়ীস্থিত বায়ুর গতির দ্বারা রাত্রি হয় ঐ অবস্থায় সাধক লয় প্রাপ্ত হন। পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত বায়ুর দ্বারা দিন হয়, তার মাধ্যমে সাধকের তমসা নাশ হয়ে অন্তর্জগৎ প্রকাশিত হয়। এইভাবে ২০০০ প্রাণায়াম কিছুকাল অভ্যাস করলে সূর্য-নাড়ীর ক্রিয়ার প্রভাব ও চন্দ্র নাড়ীর ক্রিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে সাধকের অনুভূতি হয়। যোগীরা সাধারণতঃ উক্ত অভ্যাস করে থাকেন।

অন্তর্জগৎ, বহির্জগতের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ সাধারণের যখন দিন হয় যোগীদের তখন ঈড়ায় থাকার জন্য রাত্রি হয়। আবার সাধারণের যখন রাত্রি হয়, যোগীদের তখন পিঙ্গলায় থাকার জন্য দিন হয়।

সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ী ছেড়ে সুষুম্না নাড়ীতে স্থিতি হলে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তা একটি পরম ভাব, তাকে সনাতন অব্যক্ত ভাব বলে, যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আবার সুষুম্না মার্গে মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ভাব, সেই ভাবে স্থির হলেই তা ইন্দ্রিয়ের অধীন। তার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে যখন প্রাণ প্রবিষ্ট হয় তখন তা 'বিজ্ঞান', পরম পদ। সেইস্থানে ইন্দ্রিয় না থাকার জন্য তা অব্যক্ত ভাব, ঐ ভাব আদি, অনাদিঅনন্তকাল ধরে রয়েছে। সনাতন এই অব্যক্ত ভাব কখনও বিনষ্ট হবার নয়। জীব দেহত্যাগ করলেও তা কখনও বিনষ্ট হয়ে যায় না।

**অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।**
**যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।২১**
**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।**
**যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।।২২**

তাৎপর্য্যঃ— এই উপরিউক্ত অব্যক্ত ভাবে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত দুই মার্গের শ্বাসের গতি ক্ষয় হয়ে যায়। সুষুম্নায় গতির স্থিতিকে পরম গতি বলে অর্থাৎ তখন অপান বায়ু আজ্ঞাচক্রে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। দেহ ত্যাগের সময় সুষুম্না মার্গের মাধ্যমে প্রাণ বায়ুকে বের করতে পারলে পরমাত্মায় স্থিতি প্রাপ্তিরূপ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এর ফলে তাকে আর সংসার রূপী ঘূর্ণাবর্তে

ফিরে আসতে হয় না। স্থিরে আটকে থাকে বা কূটস্থের ঊর্দ্ধস্থানে প্রাণ আটকে থাকে বলে প্রাণের মধ্যে আর চঞ্চল গতি প্রকাশিত হয় না। তখন সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে পরম 'আমির' সহিত মিলে যায়। সেই ধামই পরমধামস্বরূপ।

(স্থির পরমাত্মারূপ সেই পরম পুরুষের সহিত মিলিত হতে গেলে একান্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর কৃপার দ্বারাই তাঁকে লাভ করা সম্ভব হয়। অহং এর একটু ছিটে থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যখন দেহরূপী আমি থাকে না তখনই এক লক্ষ্যে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ ভক্তি দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়।)

**যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।**
**প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩**
**অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাষা উত্তরায়ণম্।**
**তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** দেহের ভববিস্তারকারী জঠরাগ্নিরূপ তেজস্তত্ত্ব বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুর কার্য্য সঠিক ভাবে চালিত হয়ে থাকে, এর ফলে প্রাণের বিস্তার সম্ভব হয়।

শরীরের তেজ, প্রাণরূপী আত্মার সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার দ্বারা সূর্য্য নাড়ীর গতি প্রকাশিত হয়। আবার তিনি কূটস্থ চৈতন্যের জ্যোতির স্বরূপ প্রাণরূপী আদিত্য, তার বর্ণ বা রং হল শুভ্র বা সাদা, কারণ তাঁর হতেই সকল বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে ও তাঁতেই লয় পেয়েছে। এই সকল বর্ণ একসাথে মিলে এই শুভ্র বর্ণের বা সাদা বর্ণের সৃষ্টি করেছে। তাঁর বর্ণ সাদা, কারণ তিনি দেহের অতীত স্থানে অবস্থান করছেন। সাদা কোন বর্ণের মধ্যে নয়, তাই তিনি বর্ণাতীত। সুষুম্না মার্গরূপী অব্যক্ত পথে গমন করে যিনি ব্রহ্মমার্গে স্থিতিলাভ করেছেন সেই স্থির- প্রাণরূপ মহাত্মা দেবতা পদবাচ্য। সুষুম্না মার্গের মধ্যদিয়ে ঐ সকল ব্রহ্মজ্ঞগণ প্রাণকে গমন করিয়ে মৃত্যু বরণ করেন এবং ব্রহ্মে লীন হন। সেইহেতু এই সকল ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইচ্ছামৃত্যুরূপ প্রাণত্যাগ করবার পরিচয় পাওয়া

যায়। দেহত্যাগ কালে কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র জ্যোতি দর্শন হয়ে থাকে। ইচ্ছামৃত্যু প্রাপ্ত হবার জন্য তাদের আর পুনরায় গমনাগমন হয় না।

**ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।**
**তত্র চান্দ্রমাসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।।২৫**
**শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।**
**একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।।২৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** সুষুম্না মার্গের দ্বারা প্রাণকে যে সকল যোগী বা সাধক ব্যক্তি উত্তীর্ণ করাতে পারেন, তাদের উত্তরায়ণের গতি হয়। আবার যে সকল সাধক ঈড়া নাড়ীস্থ পথের দ্বারা প্রাণবায়ু উত্তীর্ণ না করাতে পেরে পুনরাগমন করেন, তাঁদের দক্ষিণায়ন গতি হয়। দক্ষিণায়ন হল উত্তরায়ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্মযোগীগণ মৃত্যুর সময় অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভের জন্য যে সকল যোগী যোগসাধন করে চলেছেন, মরণের সময় তাঁরা চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন। এর ফলে কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য তাদের আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কারণ ঐ সকল ব্যক্তি চন্দ্রলোকে অবস্থানের জন্য চন্দ্রের অল্প আলো দেখতে পান, কূটস্থ জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির ছটা দেখতে পান না। এর ফলে মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে স্থিতি ভোগ করতে আবার সংসারে আসতে হয় বা জন্মগ্রহণ করতে হয়। যে সকল সাধক দক্ষিণায়ন গতি কাটিয়ে প্রবল প্রাণ কর্মের দ্বারা উত্তরায়ণ গতি প্রাপ্ত হন, তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজালে আবদ্ধ হতে হয় না।

শুক্লগতি ও কৃষ্ণগতি এই দুই প্রকার গতির দ্বারা জীবের যথাক্রমে গমনাগমন রোধ ও গমনা-গমন হয়ে থাকে। শুক্ল বর্ণের জ্যোতি দর্শনের ফলে সাধকের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং মৃত্যুর সময় ঐ জ্ঞানালোকে দেহত্যাগ করে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি ঈড়া নাড়ীস্থিত কৃষ্ণবর্ণরূপী তমঃ অন্ধকারে দেহত্যাগ করেন, তাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়।

**নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।**

**তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।।২৭**

**বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব**
**দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।**
**অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা**
**যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** উপরিউক্ত শুক্ল বা শুভ্র, কৃষ্ণ বা কালো গতিরূপ যে তত্ত্ব তা যথাক্রমে মোক্ষ ও সংসার প্রাপক তত্ত্ব। সাধকের আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করবার পরও সেখান থেকে পতনের সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই প্রত্যেক জীবের উচিত যোগ ক্রিয়ার দ্বারা শ্রী গুরুদেবের আদেশ উপদেশ সঠিক ভাবে মেনে সদাসর্বদা ঈড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ সুষুম্না মার্গে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে সেই পথ অনুসরণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। কারণ এই মার্গই হল ব্রহ্ম-সনাতন। যোগীগণ যোগাদি এবং তপস্যাদি করে বেদ সমূহকে জানতে পারেন। এর পর ব্রহ্মাগ্নি তেজসকুণ্ডে নিজ প্রাণকে আহুতি দিয়ে প্রকৃত হোমের কার্য্য শেষ করে তপঃ-সনাতন লাভ হয়ে থাকে, এর পর সেই তপস্যার ফল অতিক্রম করে যোগীগণ সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এর ফলে তিনি ত্রিগুণ স্বরূপ বেদাদির ফল অতিক্রম করে হোম শেষ করে আজ্ঞাচক্ররূপ তপোলোককে অতিক্রম করে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন এবং সেখানে লয়প্রাপ্ত হয়ে মুক্তাবস্থা লাভ করেন বা প্রাপ্ত হন।

**।। ইতি অক্ষর ব্রহ্মযোগ সমাপ্ত।।**

**—ঃ ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**
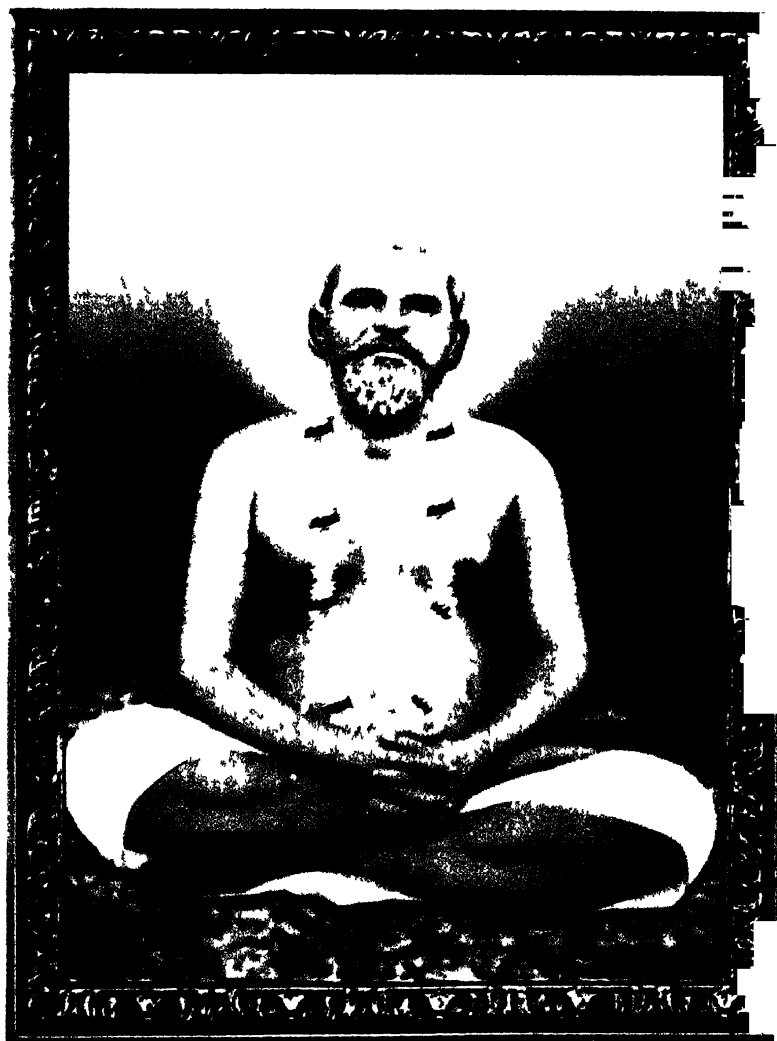
যোগীশ্বর শ্রী শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

# নবমোঽধ্যায়ঃ

## রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

**ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।**
**জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১**
**রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।**
**প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।।২**

তাৎপর্য্যঃ— প্রাণসূর্যরূপ পরমাত্মতত্ত্বে যে জ্ঞান লুক্কায়িত আছে তা সাধক সাধন করে তার সঙ্গে মিলে গেলে তবেই মাত্র জানতে পারে। এই জানারূপ জ্ঞান শুধু মাত্র তাঁর বোধগম্য। এই অবস্থায় যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সাধকদ্বারা অব্যক্ত অর্থাৎ সেখানে মন না থাকাতে কোনরূপ বিষয় সম্বন্ধে সাধক বলতে পারেন না।

এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ গুহ্যতত্ত্ব। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে সাধকের বোধগম্য হয়, সেই সাধকই মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন।

এই জ্ঞান, সকল জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অতি পবিত্র। এটা সম্পূর্ণ নিজবোধগম্য এবং ধর্মসম্মত। যার মাধ্যমে জীবের পোষণ হয়ে থাকে তাকে ধর্ম বলে। প্রাণ থেকে জীবের পোষণ হয় বলে প্রাণায়াম ধর্ম পদবাচ্য। এই প্রাণায়ামরূপী আত্মক্রিয়ার দ্বারা প্রাণকে পরব্রহ্মে স্থিতিলাভ করাতে পারলে এবং তা থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের দ্বারা নিজে জ্ঞানী হতে পারলে, অধ্যাত্মবিষয়ে সকলকিছু জ্ঞান তিনি লাভ করতে পারেন। অক্ষয় পরব্রহ্মকে লাভ করে মুক্তিপ্রাপ্ত হবার ফলে কোনকিছু কষ্টকর বলে বোধ হয় না। সকল কিছু তাঁর কাছে সমজ্ঞান হয়ে থাকে।

**অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।**
**অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।।৩**

**ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।**
**মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।।৪**
**ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।**
**ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** এই কার্য্য করতে গেলে পূর্বেই বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার বিশেষ দরকার। যে সকল ব্যক্তি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর ভজনা বা আরাধনা করে, সেই সকল ব্যক্তি প্রাণায়ামরূপ মহাধর্মের সাহায্যে প্রাণকর্ম্ম করে পরব্রহ্মপ্রাপ্ত হতে পারে। আর যে সকল ব্যক্তির এই বিষয়ে শ্রদ্ধা নেই, সেই সকল ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্ত না হয়ে জন্মমৃত্যুরূপী উপত্যকায় পুনরায় প্রেরিত হয় বা সংসারপথে পুনরায় আসতে হয়।' যে অব্যক্ত সনাতন সকল ঘটে ও পটে রয়েছেন, তিনি আধারভেদে নিজের ব্যাপ্তির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। যাঁর আধার যত বড় হয়, তাঁর ব্যাপ্তি সেখানে তত বেশী হয়। তাই প্রাণকর্ম্মরূপী কর্ম করেই তুমি যে এজন্মে মুক্ত হতে পারবে — তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিজের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে তুমি যে আধার তৈরী করলে এবং তাঁর ব্যাপ্তি তুমি যতটুকু বুঝতে পেরেছ, পরজন্মে তাঁর প্রকাশ তোমার এই আধারে সেইরূপ বিরাজ করবে। ভূত সকলের দ্বারা আমাদের সম্মুখে পর্দার সৃষ্টি হয়ে আছে। সেইহেতু আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতারূপী ডাক তিনি শুনতে চান, কিন্তু আমাদের মতন পাপাসক্ত জীব সেইভাবে তাঁকে ডাকি না। তাই তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও অধরারূপে আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছেন।

কূটস্থে পরমগুরুদেব যে জ্যোতির দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, তাই নিরঞ্জন ব্রহ্মরূপ পরমেশ্বর। সাধারণ মানুষ এঁর দর্শন না পাবার জন্য তারা তাঁকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে পারে না। তিনি কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছেন। পূর্বালোচিত রূপ তার মধ্যে থেকেও তাদের সহিত যুক্তাবস্থায় নেই। কারণ চঞ্চলতার দরুণ স্থিরভাবরূপ অব্যক্ত সেই 'পরম আমি'কে অনুভূত করা সম্ভব নয়।

**য়থাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।**
**তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৬**
**সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।**
**কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** চঞ্চলতার হেতু আমাদের মত সাধারণ জীব তাঁকে লাভ করতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি বা সাধক চঞ্চলভাব রহিত হয়ে পরমাত্মায় মিশতে সমর্থ হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি পরমাত্মায় মিলিত হয়ে তত্ত্বাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মহাকাশে লয়প্রাপ্ত হন। তখন তিনি তাঁকে চিনতে এবং তাঁর সহিত মিশতে পারেন। তাই চঞ্চল মনের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে বা চিনতে হলে তিনিময় রূপ স্থিরে নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে।

সাধক সাধনা করতে করতে যখন আজ্ঞাচক্রে আটকে যায় এবং তদূর্দ্ধে শ্বাস প্রেরণ করে পরব্রহ্মে মিলিত হন, সেই সকল ব্যক্তি সর্বভূতে পরা প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এর পূর্বে শ্বাস যখন তিনি কণ্ঠে ধারণ করেন, তখনও তিনি অষ্টপ্রকৃতির মধ্যে থাকেন অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এদের অস্তিত্ব কিছু কিছু করে লুপ্ত হয় এবং একের সহিত অপর মিশে যায়। যেমনঃ— ক্ষিতি তত্ত্বে ষোল আনার মধ্যে ক্ষিতি আট আনা, দুই আনা জল, দুই আনা তেজ, দুই আনা বায়ু, দুই আনা শূন্যতত্ত্ব অবস্থান করেন। এইরূপে তখন সকল তত্ত্বের মধ্যে সকল তত্ত্ব অবস্থান করে। সেইরূপ আকাশতত্ত্বে আট আনা আকাশ, দুই আনা ক্ষিতি, দুই আনা জল, দুই আনা তেজ, দুই আনা বায়ু অবস্থান করে। এরপর প্রাণকে আরও ঊর্দ্ধে গমন করাতে পারলে অর্থাৎ দুই ভ্রূ'র মাঝখানে শ্বাসকে অবস্থান করাতে পারলে ক্ষিতি জলে লয়প্রাপ্ত হয়, জল তেজে লয় প্রাপ্ত হয়, তেজ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে একে অপরের দ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়ে শুধু শূন্য অংশ অবস্থান করে। তখন তার সহিত অপর তিন প্রকৃতি অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার মিশে থাকে অর্থাৎ তখনও অহংজ্ঞান মরে না।

এই অবস্থায় যদি কেউ দেহত্যাগ করেন, তা হলে অষ্টপ্রকৃতি জন্মগ্রহণের সময় আবার তাঁর দেহের সহিত যুক্ত হয়ে পুনরায় জীবরূপে সংসারে আসেন।

' আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে সাধক আরও উর্দ্ধে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করিয়ে ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে এবং আকাশকে মহাকাশে লয়প্রাপ্ত করেন এবং সেখান থেকে আরও উর্দ্ধে কূটস্থজ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সেখানে লয়প্রাপ্ত হয়। এইভাবে অষ্টপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। মহাকাশে অবস্থানকালে সাধক যে জ্যোতি দেখতে পান, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জে নিজেকে মেশাতে পারলে সাধক নিঃশেষরূপে স্থিতির অবস্থা প্রাপ্ত হতে সমর্থ হন।

**প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।**
**ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮**
**ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।**
**উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।।৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষ বা চঞ্চলপ্রাণরূপী জীবগণ চঞ্চল প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করে তার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। এর ফলে মনের মধ্যে নানান কামনা-বাসনার জন্য আসক্তির বশীভূত হয় এবং জীবভাবে মন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে কর্মসকল করে থাকে। তাদের স্থিতিলাভ হয় না। সেইহেতু তাদের বারম্বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এর ফলে কর্মফল যা সৃষ্ট হয়, তা সৃষ্ট হতেই থাকে, খন্ডিত হয় না। কারণ মনের কামনার কোন শেষ নেই। এই অবস্থায় 'আমি' রূপী পরমপদ, প্রকৃতির দ্বারা চঞ্চল হয়ে সকল কার্য্য করে এবং আসক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে — পরব্রহ্মরূপী 'আমি' চঞ্চল হয় কি করে?

পরমপদরূপী 'আমি' থেকেই চঞ্চলাপ্রকৃতি এবং স্থিরপ্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে চঞ্চলাপ্রকৃতির মধ্যেও তাঁর অবস্থান আছে, কিন্তু গুপ্তভাবে।

সাধারণ মানুষ ইচ্ছার অধীন হয়ে থাকে বলে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই 'আমি' রূপী পরব্রহ্ম উদাসীনতারূপী অবস্থায় যখন অবস্থান করেন, অর্থাৎ শ্বাস যখন প্রাণকর্মের দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধভাগে অব্যক্তরূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগ করেন। সেই সময় কোন কর্মবন্ধনই তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না।

**ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।**
**হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১০**
**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।**
**পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১**
**মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।**
**রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।১২**

তাৎপর্য্যঃ— স্থিরপ্রাণ চঞ্চল প্রকৃতিতে অবতরণ করে বা এসে স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি করেছেন বা প্রসব করেছেন। স্থাবর কথার অর্থ হল — যে সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে, কিন্তু যা চলমান নয়, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিজভার বহন করবার ক্ষমতা যার নেই — সেইরূপ জীব। যেমন — বৃক্ষ।

জঙ্গম কথাটির অর্থ হল — যে সকল জীব চলমান অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিজভার বহন করে নিয়ে যেতে পারেন — সেইসকল জীবকে জঙ্গম জীব বলে। যেমন — মানুষ।

পরমাত্মারূপী 'আমি' যখন অব্যক্ত থেকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্ত অবস্থা ধারণ করেন, তখন এই সকল বিশ্ব প্রসবিত হয়। স্থির অবস্থায় যে অব্যক্ত ভাব — সেই অবস্থায় সকল জীবদেহ (মনুষ্যরূপী) পৌঁছাতে পারে না বলে বিশ্বসংসাব চলছে।

নাভি থেকে বা মণিপুর থেকে মূলাধার পর্যন্ত তমোগুণের স্থান। এই অবস্থায় শ্বাস থাকে বলে মায়া-মোহের সৃষ্টি হয়। মোহের দ্বারা আবৃত হয়ে জীবসকল নানারূপ বুদ্ধিভ্রংশকারী কার্য্য করে থাকে বা অনেক নীচ প্রকৃতির

কার্য্য করে থাকে। নাভি থেকে গলদেশ বা মণিপুর থেকে বিশুদ্ধাখ্য পর্যন্ত রাজসিক ভাবাপন্ন হয়ে জীব অহংবশে নানারূপ আসুরিক কার্য্যও করে থাকে। এই সকল ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা চঞ্চল হয়ে থাকে। এই সকল ব্যক্তি মূর্খ পদবাচ্য। এর ফলে তারা পরমতত্ত্ব জানতে পারে না এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অবজ্ঞা করে। তারা নানারকম নামধারী হাড়মাংসবিশিষ্ট দেহটিকে মানুষ পদবাচ্য মনে করে এবং তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই তারা তাদের দেওয়া নামধারী এই হাড়মাংসবিশিষ্ট মানুষদের ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, তিরস্কার, অমর্য্যাদা এমনকি প্রাণহরণ পর্যন্ত করে থাকে।

অহং-এর বশবর্ত্তী হয়ে তারা সদাসর্বদা কাজ করে বলে পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকেও হাড়মাংসবিশিষ্ট মানুষ বলে ভাবে।

হাড়মাংসবিশিষ্ট দেহই মানুষ পদবাচ্য নয়। সেই দেহকে যিনি দেহাভ্যন্তরে বসে চালনা করছেন, একমাত্র তিনিই মানুষ পদবাচ্য।

**মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।**
**ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।১৩**
**সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।**
**নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিতযুক্তা উপাসতে।।১৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষগণ দেবদেবীর মূর্ত্তির সামনে কামনা-বাসনাপূর্ণ মন নিয়ে পূজার্চনা করে থাকে। সেই পূজার মাধ্যম হয় তার বা ঐ জীব সকলের কোন একটি কামনা পূরণের আকাঙ্ক্ষা। এই সকল আরাধনার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না বা তাঁকে ভজনা করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র যে সকল ব্যক্তি পরমপদে স্থিতিলাভ করে সর্বদা অনন্যচিত্তে তাঁকে ভজনা করেন, তাঁদের দ্বারাই তাঁর ভজনা করা সম্ভবপর হয়। সাধারণ জীব হরিনাম করে এবং খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন করে এবং বিভোর ভাবে নৃত্যগীত করে চলে। স্তোত্র বা মন্ত্রের দ্বারা হৈ-হুল্লোড় করে, কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করলে তা সঠিক কীর্ত্তন নয়। একে সম্পূর্ণ গৌণকীর্ত্তন বলা হয়ে থাকে।

স্থিরকার্য্যের দ্বারা প্রাণ যখন পরমব্রহ্মে আটকে যায়, তখন সেই স্থির অবস্থায় ঠোঁট, জিভ, মন, প্রাণ কিছুই নড়াচড়া করে না। তখন সেই আত্মানন্দে মন জুড়ে যায়, এবং তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। এটাই প্রকৃত কীর্ত্তন পদবাচ্য।

গৌরাঙ্গদেব যে কীর্ত্তন করেছিলেন, সেই কীর্ত্তন ঈশ্বরাভিমুখে মনকে প্রেরিত করে মনের বা চিত্তের শুদ্ধিকরণ করার পরিকল্পনা মাত্র,তা মোক্ষ লাভের জন্য নয়। তাই ওঁ-কার ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তিযুক্তভাবে আত্মধ্যানের মাধ্যমে যে 'আমার' সহিত যুক্ত, একমাত্র সেই 'আমার' উপাসনা করে।

**জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।**
**একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।১৫**
**অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।**
**মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রকৃত পূজা কথার অর্থ হল সম্যকরূপে প্রাণের স্থিতি বৃদ্ধি করা। তিনরকম লোক 'আমি'রূপ পরমপদের উপাসনা করেন। ১। যে সকল ব্যক্তি 'আমি' হারা হয়ে বা অহং ভাবরহিত হয়ে 'আমাকে' তন্ময়রূপে ধ্যান করেন, সেইসকল ব্যক্তি 'আমার' উপাসনা করেন।

২। যে সকল ব্যক্তি 'আমি কেউ নই, আমি তাঁর দাস' এইভাবে ভাবিত হয়ে, তাঁর উপাসনা করেন।

৩। আবার কোন কোন ব্যক্তি 'সর্বভূতে আমার অবস্থিতি' এই জেনে 'আমার' উপাসনা করেন।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে বায়ুকে প্রেরণ করে মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে ধারণ করে যে পরমপদ প্রাপ্ত হন, তাঁর দ্বারাই বায়ুকে তাঁর আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয় অর্থাৎ তিনি নিজ ইচ্ছা মতন বায়ুকে চালনা করতে পারেন, তখন চন্দ্রনাড়ীস্থিত বায়ুর ধারা সাধক আস্বাদন করতে পারেন। এটা সোমরস পদবাচ্য। এই অমৃত পান করবার পর সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ

অবগত হন। এর ফলে মৃত্যুভয় তখন সাধকের আর থাকে না। আত্মকর্মের দ্বারা প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ করিয়ে পরমপদ লাভ করাই হল প্রকৃত যাগক্রিয়া। এই যাগ দেওয়ার মধ্য দিয়েই চন্দ্রনাড়ীস্থিত অমৃতরূপ রস উৎপন্ন হয়। তখন সাধকের সকল অংশে সেই 'আমি'র প্রভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ সোমধারারূপ সেই যাগের মধ্যেও 'আমি'র অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। মণিপুর চক্রে যে ব্রহ্মাগ্নি আছে, তার মধ্যেও সেই 'আমি' প্রতীয়মান হয়। এইরূপে সমগ্র অংশেই তাঁর অবস্থান পরিলক্ষিত হয় এবং সবকিছুই সেই 'আমি'তে পরিলক্ষিত হয়। ওঁ-কার ক্রিয়ার দ্বারা আত্মকর্ম করে পিতার সহিত বা পরমপিতার সহিত মিলিত হওয়াই হল প্রকৃত মহালয়। প্রাণের কর্মের দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিপ্রাপ্তি হল প্রকৃত শ্রাদ্ধ পদবাচ্য এবং তার মাধ্যমে আত্মক্রিয়া করাই হল প্রকৃত তর্পণ এবং তার সহিত মিশে যাওয়াই হল প্রকৃত পিতৃউদ্ধার পদবাচ্য।

**পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।**
**বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ।।১৭**
**গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।**
**প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ**—সেই পরমব্রহ্মরূপী 'আমি' থেকেই সকল মানব, কীট-পতঙ্গ, অণু, পরমাণু, জীবজন্তু ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তিনি হলেন জগতের ধারক ও বাহক, অর্থাৎ মাতা ও পিতা। কূটস্থ গহ্বরে যে ব্রহ্মযোনী আছে, তিনি সেইরূপ জগতে মাতৃস্থানীয়া। আবার কূটস্থচৈতন্যরূপী যে পরমপুরুষ স্বরূপ আছে, সেইরূপে তিনি জগতে পিতৃস্থানীয়।

তিনি আবার সকল জগতের জ্ঞানস্বরূপ। তাঁকে জেনে জ্ঞানী যে জ্ঞানলাভ করেন, তিনি সেই জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য জ্ঞান স্বরূপ। সেই জ্ঞান হল পবিত্র। তাই এতটুকু ময়লার আঁশ তার মধ্যে নেই। তিনি হলেন চিরসুন্দর, চিরউজ্জ্বল, চিরজাগ্রত। তিনি সদাসর্বদা তাই জাগরিত হয়ে আমাদের দেহাভ্যন্তরে অবস্থান

করছেন। তিনি হলেন পবিত্র-নির্মল, তাই তাঁর সঙ্গে মিশতে গেলে কামনারূপী ময়লার এতটুকু আঁশ থাকলে চলবে না।

তিনি হলেন স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। এই প্রাণের দ্বারাই আমাদের দেহের পোষণ হয়ে থাকে বলে তিনি হলেন জীবের ধর্মস্বরূপ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী তিন দেবতা বা তিনগুণ তাঁর সঙ্গে মিশে আছে বলে তিনি আমাদের দেহে স্বয়ং 'ওঁ-কার' রূপ।

তিনি সূর্য্যনাড়ী এবং চন্দ্রনাড়ীর মধ্যস্থ অজপারূপে রয়েছেন এবং শরীরের মধ্যে বর্হিজগতের এবং জগতের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বা জোয়ার-ভাটারূপে অবস্থান করছেন। এছাড়া তিনি জঠরাগ্নিতে তেজরূপে অবস্থান করে অন্ন পরিপাকের দ্বারা দেহের পোষণ করছেন। তিনি হলেন এই দেহে প্রভুস্বরূপ। প্রভু কথার অর্থ হল 'প্র' অর্থাৎ প্রধানরূপে 'ভু' অর্থাৎ অধিপতি। তিনি আমাদের দেহে যেহেতু মাতা ও পিতা, সেহেতু তিনি আমাদের দেহে বা সমগ্র জগতে প্রধান অধিপতিরূপে বিরাজ করে সমগ্র জগৎকে চালাচ্ছেন। তাঁর অভাব হলে এই দেহ বা জগৎ বিকল হয়ে পড়বে। চোখ দিয়ে আমরা যা দেখতে পাই, সেই দর্শনশক্তি তাঁর মাধ্যম হয়ে থাকে, অর্থাৎ দর্শনের মধ্যে তিনি দর্শনশক্তিরূপে রয়েছেন। তাঁর অভাবে দর্শন হয় না। চোখে দুই নাড়ী অর্থাৎ পুষানাড়ী এবং অলম্বুষানাড়ী। এই দুই নাড়ীর মধ্যে তিনি উদান এবং ব্যান বায়ুরূপে রয়েছেন। এই দুই বায়ুর দ্বারা বা এদের অবস্থিতির জন্য আমরা দেখতে পাই। তিনি আমাদের দেহের সকল অণু-পরমাণুর সহিত একসূত্রে বাঁধা আছেন এবং দেহসকলকে বহির্জগতের হাত থেকে সর্বদা রক্ষা করে চলেছেন।

তিনি যেহেতু কর্তা, সেহেতু তিনি জীবদেহে কখনও অমঙ্গল সাধন করতে পারেন না। তাই তিনি মঙ্গলময় কর্ত্তা বলে তাঁর স্মরণে সকলই মঙ্গল হয়ে থাকে। প্রাণকর্মের দ্বারা সঠিকভাবে একান্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাহায্যে তাঁতে স্থিতিলাভ করতে পারলে তখন তার মন-প্রাণ সেই 'আমি'তেই লয়প্রাপ্ত হয়। জগতের সকলকিছুই তা থেকে সৃষ্ট এবং তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাঁর

লয় হয় না। তাই তিনি 'অবিনাশী' পদবাচ্য। তাঁর অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য, বিনাশ সম্ভবপর নয়।)

**তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।**
**অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।।১৯**
**ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা**
**যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।**
**তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক —**
**মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম সঠিকভাবে করলে প্রাণের বিস্তার সঠিকপথে চালিত হবে। গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্মের মাধ্যমে মণিপুর চক্রে যে তেজ রয়েছে, সেই তেজের দ্বারা শরীরে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা প্রাণায়ামরূপী প্রাণ-অপান বায়ুর সাহায্যে বৃষ্টিপাত হয়ে দেহস্থিত তাপ শীতল হয়ে যায় অর্থাৎ নাভিক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরস্থ তেজ উৎপন্ন করে প্রাণায়ামরূপী কার্য্যের দ্বারা ঐ তেজরূপী বায়ুকে বা প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদেশে চালিত করে অর্থাৎ চক্রে চক্রে স্মরণ করে উপরে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়ার নাম 'বৃষ্টি আকর্ষণ ক্রিয়া'। এরপর অপানবায়ুর মাধ্যমে আবার চক্রে চক্রে স্মরণ করে রেচকের দ্বারা মূলাধারে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়ার নাম হল বৃষ্টিবর্ষণ ক্রিয়া। এর মাধ্যমে পৃথিবীস্থিত মৃত্তিকা অর্থাৎ মূলাধার শীতল হয়ে যায়।

যে সকল যোগী সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত রমণ করেন, তাঁদের দ্বারা এই সকল শীতলতা অনুভব করা সম্ভবপর হয়। এই অবস্থাও পরব্রহ্মরূপী সেই 'আমি' কর্তৃক সম্পাদিত হয় অর্থাৎ জীবনেও যেমন তাঁর উপস্থিতি, মরণেও তেমন তাঁর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ জীবদেহ যখন অষ্টপ্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ বা ব্যক্তাবস্থায় থাকে — তখন হল জীবন। সেই অবস্থাতেও সেই 'আমি' উপস্থিত থাকে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অষ্টপ্রকৃতিরহিত অবস্থা ধারণ করে যখন জীব অব্যক্তরূপী স্থিরাবস্থায় থাকে, তাইই প্রকৃত মরণ বা মৃত্যু পদবাচ্য।

সাধারণ ক্ষেত্রে যে মৃত্যু আমরা দেখে থাকি— তা প্রকৃত মৃত্যু পদবাচ্য নয়। এটা কেবল এক দেহ পরিত্যাগ করে অপর দেহ পরিধান করা মাত্র। সেই অব্যক্তরূপী স্থিরাবস্থাও 'আমি'। এই কারণে সেই মৃত্যুর মধ্যেও 'আমি'র অবস্থান। যে সকল ব্যক্তি স্থিরপ্রাণে লয় হয়ে সর্বদা স্থিরে রয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি মৃতব্যক্তি পদবাচ্য। এই সকল ব্যক্তি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁদের কোন ক্ষয় হয় না— তাঁরা অক্ষয় পুরুষ। তাই এই সকল ব্যক্তি একমাত্র সৎ-ব্যক্তি বা নিত্য ব্যক্তি পদবাচ্য। চঞ্চল প্রাণ, স্থির প্রাণ হতেই সৃষ্ট। স্থির-প্রকৃতির সহিত স্থির-পুরুষ যুক্ত হয়ে চঞ্চল প্রাণের সৃষ্টি করেছে। এই প্রাণ প্রত্যহই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চল প্রাণরূপী ব্যক্তিগণ অনিত্য বা অসৎ ব্যক্তি পদবাচ্য। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না অর্থাৎ যথাক্রমে তমঃ, রজঃও সত্ত্বগুণই হল বেদত্রয় অর্থাৎ ঈড়া সাম্‌বেদ, পিঙ্গলা ঋক্‌বেদ ও সুষুম্না যজুর্বেদ। গুরূপদিষ্ট আত্মকর্মের দ্বারা সম্যক প্রকারে প্রাণের বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থাৎ পূজার্চনা করে যে সকল ব্যক্তি আত্মানন্দে বিলীন হন, সেই সকল ব্যক্তি সোমরস পান করে বা অমৃত পান করে অমরত্ব প্রাপ্ত হন এবং মহাতেজরূপ জ্যোতির্ময় আত্মায় বিলীন হয়ে ইন্দ্রলোক বা স্বর্গে অবস্থান করেন তাঁরা দিব্যরূপ ও নক্ষত্র দর্শন করে দেবভোগ বা প্রসাদ ভক্ষণ করে থাকেন। এই প্রসাদ বা ভোগই প্রকৃত প্রসাদ বা ভোগ পদবাচ্য।

**তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং**
**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।**
**এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না**
**গতাগতং কামকামা লভন্তে।।২১**
**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।**
**তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মকর্ম করতে এসে সাধারণ মানুষ যে ঐ জন্মেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবেন — তা নয়। ঈশ্বরপ্রাপ্ত হতে গেলে কঠোর পরিশ্রম ও

সাধনাভ্যাসের বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে তপস্যা করতে হয়। শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, ভালবাসা যদি তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে এই কার্য্য সম্পাদন করতে পথ আরও প্রশস্ত হয়। শ্রীগুরুদেবের বিশেষ কৃপার দ্বারা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অন্তরের আকুলতা দিয়ে যদি কেউ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করেন এবং তারপর যদি তিনি দেহত্যাগ করেন, তা হলে তাঁকে উপরোক্ত ঐ আজ্ঞাচক্র থেকে নিম্নে নেমে আসতে হয় এবং অষ্টপ্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পুনরায় তিনি এমন কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, যাতে তাঁর সাধনার সেই অবস্থা তিনি প্রাপ্ত হতে পারেন। পূর্বজন্মে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যদি কেউ আত্মক্রিয়া প্রাপ্ত হন, তা হলে পরজন্মে এসেও সেই সদ্‌গুরু লাভ তাঁর হয়ে থাকে এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপার দ্বারা পূর্বজন্মের কৃত প্রাণকর্মে তাঁর যে স্থানে অবস্থিতি হয়েছিল, সেই স্থানে অবস্থান হতে পারে। যদি সেই জন্মে এসে সে কামনা-বাসনার কবলে পড়ে কর্মফলের সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে তাও শ্রীগুরুদেব হরণ করেন। এর জন্য ঐ ঊর্দ্ধে গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রবলভাবে তাঁর নিকট একান্ত প্রার্থনা ও প্রাণের ব্যাকুলতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। তবেই পূর্বজন্মের অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে স্মরণ-মনন সঠিকরূপে করতে পারলে তখন গুরুকৃপার দ্বারা তার বহির্চিন্তা মনোমধ্য হতে দূরীভূত হয় এবং সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য তার সমাধি ও মোক্ষপ্রাপ্তির প্রচেষ্টাজনিত কার্য্য আত্মনারায়ণ স্বরূপ শ্রীগুরুদেব বহন করেন এবং আপনা আপনিই তিনি তার চিত্তে সেই ভাবের উদয় করে থাকেন। এতে যদি আন্তরিকতার সহিত গুরুদেবের এই অসীম কৃপার মাধ্যমে উপাসনা করা সম্ভব হয়, তখন তিনি যুক্তবুদ্ধিশালী হয়ে মোক্ষপথ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

**যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।**
**তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তবিধিপূর্ব্বকম্।।২৩**
**অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।**
**ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষ নানারূপ দেবদেবতার মূর্ত্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করে তার ভজনা করে থাকেন। কিন্তু এটা প্রকৃত ভজনা পদবাচ্য নয়। কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে, শঙ্খ ও উলুধ্বনি, ধুপ,দীপ সজ্জিত করে পুষ্প ও বিল্বপত্রাদির দ্বারা মন্ত্র ও স্তোত্র উচ্চারণের মাধ্যমে চঞ্চল ভাবের ও অহংভাবের বিশেষ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটা প্রকৃত পূজা পদবাচ্য নয়। এটাকে গৌণ পূজা বলা হয়। এতে মোক্ষপ্রাপ্তি সুদূর পরাহত।

তবে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার দ্বারা বিশেষ মনোনিবেশের মাধ্যমে কামনা বিবর্জিত ভাবে যদি কেউ দেবদেবীর ঐ প্রতিমার ভজনা করে, তা হলে তাদের চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র, চিত্ত নিরোধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় না। এই গৌণ পূজার্চনা করে সঠিক সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলে, মনের মধ্যে ভগবৎ কৃপা পাবার ইচ্ছা প্রবল হলে এবং শ্রদ্ধা দৃঢ় হলে সদ্‌গুরু লাভের মাধ্যমে গুরূপদিষ্ট আত্মক্রিয়া করতে পারলে আত্মনারায়ণ লাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি হতে পারে।

ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতাদের পূজা করাটাও তাঁরই পূজা করা, কিন্তু এই সকল দেব-দেবতার পূজা গুণস্বরূপের পূজা মাত্র, গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে সদ্‌গুরুলাভ অত্যন্ত আবশ্যক। এছাড়া ভগবদ্‌প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করা যায় না। এর ফলে সেইরূপ পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানা সম্ভবপর হয় না। সেইহেতু জীবের প্রাণ পুনরাবর্ত্তিত হয়ে থাকে অর্থাৎ আবার সংসাররূপ বেড়াজালে বন্ধনদশা কাটাতে আসতে হয়।

**যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্‌যান্তি পিতৃব্রতাঃ।**
**ভূতানি যান্তিভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্।।২৫**
**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।**
**তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।২৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করবার পর শ্রীগুরুদেবের আদেশ উপদেশ মত আকাশের ক্রিয়া বা স্থির বায়ুর ক্রিয়া সঠিকরূপে যদি করতে পারেন, তা হলে তাঁর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়া হল প্রকৃত শ্রাদ্ধের

ক্রিয়া। এর মাধ্যমে পিতৃগণ অর্থাৎ পূর্বের সপ্তম পুরুষ এবং পরের সপ্তম পুরুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁদের শ্রাদ্ধ কার্য্য অন্ন দ্বারা পিন্ড দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর ফলে ঐ পিতৃগণ উদ্ধার লাভ করেন অর্থাৎ স্থিরপ্রাণক্রিয়ারূপী শ্রাদ্ধের দ্বারা স্থিরব্রহ্ম অন্নদ্বারা ক্রিয়াযোগ গুরূপদেশ মত করতে পারলে প্রাণরূপী বায়ুর সপ্তবায়ু এবং অপানরূপী বায়ুর সপ্তবায়ু ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। এটাই প্রকৃত বিষ্ণুপদে পিন্ডদান বা পিতৃযজ্ঞ পদবাচ্য।

সাধক প্রাণের পঞ্চতত্ত্বময় চঞ্চলভাবকে স্থিরভাবে সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃত পূজার্চনার দ্বারা কূটস্থ গহ্বরে স্থিতিরূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে লয়প্রাপ্ত হন। এটাই প্রকৃত ভূতযজ্ঞ।

প্রাণবায়ুর মাধ্যমে আমাদের দেহস্থিত অজপা সতত গমনাগমন করছে। প্রাণায়ামরূপী শ্বাসের দ্বারা প্রাণকে স্থিরকরণরূপ কার্যই প্রকৃত অতিথি সেবা। এই অজপা যেহেতু সেই 'পরম আমি' থেকে সৃষ্ট, তাই তাঁর সেবা করার অর্থ আত্মনারায়ণের সেবা করা। তাই অতিথি সেবা মাত্রই নারায়ণের সেবা করা বলা হয়ে থাকে।

সনাতন ব্রহ্মরূপী ত্রিবেদসকল তাঁরই স্বরূপ। তাই মন, প্রাণ, বুদ্ধি স্থির করে ব্রহ্মে লেগে থাকলে প্রকৃতভাবে তাতে স্থিতিপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ কূটস্থের উর্দ্ধস্থানরূপ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হলে সদাসর্বদা ব্রহ্মে লেগে থাকা হয়। এই ক্রিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ পদবাচ্য।

বিশেষ সংযত হয়ে প্রকৃত ভক্তির দ্বারা পত্র পুষ্পাদির মাধ্যমে দৃঢ় প্রেমের সহিত যদি কেউ আত্মনারায়ণের পূজা করেন, তা হলে স্থিরপ্রাণরূপী আত্মনারায়ণ তা গ্রহণ করেন, কিন্তু সেইস্থানে মুখে একরকম বাক্য এবং মনে অন্যরকম বাক্য থাকলে সেই পূজা বা দান তাঁকে দেওয়া হয় না বা তাঁকে প্রদান করা হয় না। এটা গৌণপূজা রূপে বিদিত হয়। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র উচ্চারণ করে গেলেই আর সচন্দন বিল্বপত্র, পুষ্প তাঁর দিকে প্রদান করলেই তা প্রকৃত পূজা বা ধ্যান নয় এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ সংযতাত্মা না হবার জন্য তারা ব্রাহ্মণ

পদবাচ্য নয়। তাই একমাত্র সংযতাত্মা হয়ে যিনি তাঁকে পত্র-পুষ্পাদির মাধ্যমে পূজার্চনা করেন, তাঁর পূজা আত্মনারায়ণ গ্রহণ করেন।

**যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।**
**যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।২৭**
**শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ।**
**সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষ যে সকল পূজা, অর্চনা, ধ্যান, দান করে থাকেন, তা অহং ভাবাপন্ন হয়ে করে থাকেন বলে তাদের এই সকল দানাদি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। কারণ এই সকল মানুষের মনে একরকম এবং মুখে একরকম ভাব থাকে ও অলসতার কারণে নানারূপ অজুহাত সৃষ্টি করে আসল কর্ম হতে বিরত থাকেন। যেমন — মুখে বলছেন ঈশ্বর তুমি এটা গ্রহণ কর', কিন্তু মনে ভাবছেন 'একশত লোকের আয়োজন করেছেন, সবাই খেতে পাবে কিনা!' ব্রহ্মধ্যানের মাধ্যমে কর্ম করে অহংভাব মুক্ত হয়ে এইসকল উপরোক্ত সামগ্রী প্রদান করলে, তা ঈশ্বর গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ আসক্তিরূপ বন্ধনে আবদ্ধ বলে তাদের সকল কাজ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত বলে, সুখ-দুঃখ ভোগে আসক্ত বলে তারা সঠিক উপায়ে প্রাণ-মন ঈশ্বরের পদতলে অর্পণ করতে পারেন না। একমাত্র যে সকল ব্যক্তি আত্মযোগে যুক্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষারূপ আসক্তিরহিত হয়ে যোগে অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় মনকে লয়প্রাপ্ত করে ব্রহ্মে মিশতে পেরেছেন, সেই সকল সন্ন্যাসী ব্যক্তির দ্বারাই অর্পণ করা সম্ভব হয়।

**সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।**
**যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষ্ চাপ্যহম্।।২৯**
**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।**
**সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** তিনি অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সকল ঘটেই

বিরাজমান। তাই তিনি কারও শত্রুও নন, অনিষ্টকারীও নন। আবার তাঁর কাহারও প্রতি দ্বেষ ভাবও নেই, প্রিয় ভাবও নেই। যে সকল যোগীগণ দেহরূপ ঘটে প্রাণের চঞ্চলাবস্থারহিত করে আত্মার সহিত সততভাবে যুক্ত হয়ে থাকেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট তিনি প্রকাশিত হয়ে থাকেন। চঞ্চল ব্যক্তিগণ প্রাণের ক্ষয় বা আয়ুক্ষয় করে চঞ্চল গতির মধ্যে আবদ্ধ হয়েই তাকে অধিক চঞ্চল করে চলে। এর ফলে তাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশ লাভ করতে পারেন না। চঞ্চল ব্যক্তির দ্বারা হাজার পাপকার্য্য হয়ে থাকে। সেই পাপকার্য্য করেও এই বাসুদেবরূপী আত্মকর্মে যদি কোন ব্যক্তি অনন্যমনে তাঁর ভজনা করেন এবং তাঁর সহিত রত থেকে উত্তম অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যদি তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে, তাহলে সেই দুরাচারী,ব্যভিচারী ব্যক্তির পাপ খন্ডন হয়ে যায় এবং তিনি পুণ্যাত্মা বা তপস্বীরূপে পরিগণিত হন ও ঈশ্বর তাঁর দ্বারা অর্পিত দানসকল গ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁর মধ্যে তিনি তাঁর উপস্থিতি ঘটিয়ে থাকেন। তখন তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। যেমন রত্নাকর দস্যু আত্মকর্মের দ্বারা বাল্মিকী নামে তপস্বীরূপে জগতে পরিচিত হয়েছিলেন।

**ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।**
**কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।৩১**
**মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।**
**স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম।।৩২**

**তাৎপর্য্যঃ—** সদ্‌গুরূপদিষ্ট আত্মক্রিয়ার দ্বারা যিনি আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন বা পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর কোন ভাবেই সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হন না — যা প্রতিজ্ঞা করে বলা যেতে পারে। এই পরমাত্মকর্ম বা এই আত্মক্রিয়া সকল শ্রেণীর মানুষই পেতে পারে, সেখানে কোন জাতিভেদ নেই, কারণ তিনি মনুষ্যরূপী জীব ছাড়াও সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন।(তাঁর নিকট স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ নেই। তাই স্ত্রী হোক বা পুরুষই হোক, ব্রাহ্মণ হোক বা অ-ব্রাহ্মণ হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক

বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকই হোক, সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই কর্ম পেতে পারেন। কারণ এই সম্প্রদায় বা ভেদাভেদ মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট। ভগবান আত্মনারায়ণ এই সকল ভেদাভেদ সৃষ্টি করেন নি।)

আমাদের দেহস্থিত চতুর্বর্ণ অর্থাৎ রজঃ ও তমঃগুণ বিশিষ্ট বৈশ্য, তমঃগুণ বিশিষ্ট শূদ্র, সত্ত্ব ও রজঃগুণ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ— এই চতুর্বর্ণের কথা বলা আছে। কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠিসমষ্টির ভাগের কথা বলা নেই।

যখন সাধক তমোগুণে বিরাজ করেন, তখন মায়া, মোহ ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, অর্থাৎ তখন তিনি হন শূদ্র। এরপর সাধক যখন মায়া, মোহ, সুখ-দুঃখ ও অহঙ্কারের মধ্যে বিরাজ করেন বা তামসিক ও রাজসিক ভাবে বিরাজ করেন, তখন তিনি হন বৈশ্য।

আত্মক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের উদ্দেশ্যে যখন কোন ব্যক্তি সাধন সমরে প্রাণায়ামরূপী অস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তখন তিনি হন ক্ষত্রিয়। তখন তিনি সত্ত্ব ও রজঃগুণের মধ্যে অবস্থান করেন।

যুদ্ধরূপ কর্মযোগের অভ্যাসের দ্বারা যিনি পরমাত্মায় স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। তখন তিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন। রজঃ তমোগুণ ত্যাগ করে যিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন, তখন সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ঋষিভাব প্রকাশিত হয়। এই সকল ঋষি ব্যক্তি রাজর্ষি পদবাচ্য।

**কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।**
**অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।৩৩**
**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।**
**মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** ভূমিষ্ঠ হবার আগে গর্ভাবস্থায় সকল শিশু আত্মানন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর সহিত বিচ্ছিন্ন হয়ে, মধ্যাবস্থায় যোগভ্রষ্ট

হয়ে চঞ্চল অবস্থায় পতিত হয়।

চঞ্চলাবস্থায় থেকে সদ্গুরুকরণের দ্বারা তাঁর আদেশ ও উপদেশ পালন করে একান্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাশীল এবং একান্ত ভালবাসারূপ যুক্তচিত্তে বা মনে যিনি আত্মার আরাধনা করেন, তিনি আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে সমাহিত হয়ে সাধনা করলে সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তখন সেই 'পরম আমি'কে জেনে তাঁকে ডাইনে,বামে, উর্দ্ধে, অধেঃ, দশদিকে নমস্কার করতে থাকেন এবং সকলদিকেই তাঁর অবস্থিতি অর্থাৎ সেই 'ওঁ'কাররূপী নমস্কারের দ্বারা সকলদিকেই 'ওঁ'কাররূপী পরব্রহ্ম প্রতীয়মান হন।

তাই ঈশ্বর বলেছেন একান্তচিত্তে 'ওঁ'কাররূপী প্রাণক্রিয়ার দ্বারা দশদিকে তুমি আমায় নমস্কার করলে, এবং দৃঢ় ভালবাসাযুক্ত আত্মকর্মের মাধ্যমে আমার উপাসনা করতে পারলে — তুমি আমায় প্রাপ্ত হবে।

এই উপরোক্তভাবে 'ওঁ'কাররূপী ক্রিয়ার দ্বারা দশদিক নমস্কারে নমস্কারে ভরে দিলে আত্মানন্দের সহিত বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়ে তাতে লয়প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

**।। ইতি রাজবিদ্যা - রাজগুহ্যযোগ সমাপ্ত।।**

**—ঃ ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# দশমোঽধ্যায়ঃ

## বিভূতিযোগ

**ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।**
**যত্তেঽহং প্রীয়মানায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১**
**ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।**
**অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।২**

**তাৎপর্য্যঃ**— কূটস্থ চৈতন্যরূপী পরমগুরুদেব তোমাকে প্রাণকর্ম প্রদান করে (সদগুরু লাভের দ্বারা যারা প্রাণকর্মরূপ আত্মক্রিয়া প্রাপ্ত হয়েছেন এই উক্তি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) তোমার উপর বিশেষ কৃপা করেছেন এর জন্য সর্বদা মনে রাখবে তুমি বা তোমার জন্ম-জন্মান্তর সার্থক্ হয়েছে। তিনি বিশেষ তেজোরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জ নিয়ে আমাদের এই দেহে অবস্থান করছেন এবং কি করে আমাদের মঙ্গল হয় সর্বদা তিনি তারই চেষ্টা করছেন। আমাদের কি করে আত্মিক উন্নতি হয় সর্বদা সেইদিকে নজর রেখে চলেছেন অর্থাৎ তিনি বিশেষ রূপে আমাদের বহন করে চলেছেন যাতে আমরা এই আত্মকর্মে মন নিবদ্ধ করে, তাঁর মুখনিঃসৃত পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করে আপন কর্মরূপ আত্মকর্মে শ্রদ্ধাবান হই এবং সেই কর্ম যাতে নিষ্ঠা সহকারে পালন করি। তিনি সদাসর্বদা আমাদের হিত সাধনের জন্য বা যাতে ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ করে মঙ্গলময়ের সঙ্গে মিশতে পারি তার চেষ্টা করছেন।

আজ্ঞাচক্রই হল দেবলোকস্বরূপ, যাঁরা আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন অর্থাৎ 'খ' অর্থে আকাশ, সেই আকাশে আসন পাততে সক্ষম হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি বা দেবগণ খেচরী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সকল অবস্থাতেও ভাব বা দেবভাবরূপী ভাব রয়েছে, সেইহেতু আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে সেখানে স্থিতিপ্রাপ্ত হলে তাঁতে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়া নয়, কারণ সেখানে ভাবের অবস্থা রয়েছে আবার কূটস্থ মণ্ডলে যে অবস্থান করছেন তিনিও সেই একইরূপে

ভাবের মধ্যে অবস্থানের জন্য তিনিও তাঁতে স্থিতিপ্রাপ্ত হতে পারেননি। তিনি হলেন সকল ভাবের অতীত অর্থাৎ ভাবাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি কূটস্থ মণ্ডলে যে জ্যোতির দর্শন হয় তারও উর্দ্ধে অবস্থান করছেন। তাঁকে জানতে গেলে সেই কূটস্থ জ্যোতির উর্দ্ধে যে জ্যোতি রয়েছে তাঁতে নিজেকে অঞ্জলি দিতে হবে অর্থাৎ তাঁকে জানতে বা চিনতে গেলে তাঁতে লয় হতে হবে এবং যিনি জানতে যান তিনিও সেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যান এবং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান।

অতএব তাঁকে জানতে গেলে বা বুঝতে গেলে, যতক্ষণ ব্যক্তভাব প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তুমি তাঁকে জানতে বা বুঝতে পারবে না। যখন ব্যক্তভাব ছেড়ে অব্যক্ত ভাবে পৌঁছতে পারবে এবং এক বিশেষরূপ শান্তির আলয়ে নিমজ্জিত থাকতে পারবে তখনই তুমি তাঁর আবির্ভাব এবং সকল সম্পর্কে জানতে পারবে।

**যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।**
**অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩**
**বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।**
**সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।।৪**
**অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।**
**ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথক্ বিধাঃ।৫**

**তাৎপর্য্যঃ—**(মহাপ্রাণস্বরূপ পরমাত্মাই হচ্ছেন পরমেশ্বর। এই স্থির মহাপ্রাণ থেকেই প্রাণের সৃষ্টি এবং তা এক এক দেহে এক এক আধার স্বরূপে বিরাজ করেন। তিনি সর্বময়রূপে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অবস্থান করছেন, তাই তাঁর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। যে সকল ব্যক্তি এই সকল ভাব অবগত হয়ে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে সেই বোধরূপে মায়ামোহ অতিক্রম করে তাঁতে লেগে থাকেন সেই সকল ব্যক্তি পাপমুক্ত হন।

স্থির বুদ্ধিরূপ আত্মবুদ্ধির দ্বারায় প্রকৃত শান্তিপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হবার জন্য তারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন বলে সকল মোহ

থেকে মুক্ত হন। কোন রকম বন্ধন না থাকার জন্য তারা বিশেষ শান্তিপ্রাপ্ত হন। এই সকল ব্যক্তি 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই জ্ঞান লাভ করবার জন্য সকলের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাবার জন্য হাজার আঘাত লাঞ্ছনা অপমান পেয়েও তাঁরা সকলকে ক্ষমা করে দেন, সেহেতু তাঁরা সর্বদা ক্ষমাশীল ব্যক্তি পদবাচ্য।

সাধারণ মানুষ মায়া মোহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবার জন্য তারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে চলে, এর ফলে প্রকৃত সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম তাদের দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রাণকর্মের দ্বারা এই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর হয়। তাই আমরা সাধারণ জীব যা কিছু বলি, যা কিছু দেখি এবং যা কিছু শুনি ও যা কিছু করি তা কামনা-বাসনারূপী ভ্রমজালে আবদ্ধ হয়ে করি। এর ফলে যা কিছু করি, শুনি, দেখি, বলি সকলই মিথ্যা বলে পরিগণিত হয়, তা আসল সত্য পদবাচ্য নয়। প্রাণকর্মের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করলে এবং ব্রহ্মজ্ঞ হলে তবেই ইন্দ্রিয় দমন করা সম্ভবপর হয়। মুখে করব-করব ইত্যাদি জোর করে বললেই প্রকৃতরূপে ইন্দ্রিয় দমন করা সম্ভবপর নয়, আবার অন্তঃকরণে স্থিরতার জন্য যে শান্তিভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করে কর্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি লাভ করলে তবেই প্রকৃত শান্তিলাভ হয়, মুখে শান্তি, শান্তি করে চীৎকার করলে শান্তি পাওয়া যায় না।

এইভাবে সঠিকভাবে গুরূপদিষ্ট উপায়ে প্রাণকর্ম করলে হিংসা, দ্বেষ, ভয়, ভবরোগ (চঞ্চল প্রাণের আবদ্ধ দশারূপ বন্ধন) প্রভৃতি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যশ (আত্মধর্মের অনুষ্ঠান করে আত্মজ্ঞ হওয়া) লাভ করা যায়।)

**মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।**
**মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃপ্রজাঃ।।৬**
**এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।**
**সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—**(আমাদের এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটিতে সাত বায়ু অবস্থান করছে। এই সাতটি বায়ুর প্রত্যেকটির মধ্যে আবার সাতটি করে বায়ু

আছে। যা এই দেহের মধ্যে আবর্তিত আছে তা হল (১) প্রবহ বা প্রাণবায়ু (২) সংবহ বা অপান বায়ু (৩) বিবহ বা সমান বায়ু (৪) উদ্বহ বা ব্যানবায়ু (৫) আবহ বা উদানবায়ু (৬) পরিবহ বা গান্ধারী নাড়ী স্থিত স্থির বায়ু (৭) পরাবহ বা হস্তিনী নাড়ীস্থ স্থির বায়ু। উপরিউক্ত এই সপ্ত মহর্ষিগণ কূটস্থ স্থানরূপ হৃদয় আকাশেও রয়েছেন।

ভগবান আত্মনারায়ণ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠএই সাত মহর্ষিগণের যে নাম করেছেন সেই সকল কোন হাত পা ওয়ালা ঋষি পদবাচ্য নয়। এগুলি আমাদের দেহস্থিত বায়ুর উপাধি মাত্র।

জীব সকলের প্রাণ সর্বদা চঞ্চল প্রাণের মধ্যে অবস্থান করায় মনের উৎপত্তি হয়েছে। এই মন নানারকম কামনা-বাসনার মধ্যে আবর্তিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় অনুমান করে বা বোধ করে আপন ইচ্ছা পোষণ করে। এই সকল ইচ্ছা তারা চার প্রকারের অবস্থায় প্রকাশ করে থাকে (১) সত্ত্বগুণে (২) রজোগুণে (৩) তমঃ গুণে (৪) রজঃস্তমঃ গুণে। মনের এই বোধ করাকে মনু বলে। এই থেকে চার প্রকার যুগের সৃষ্টি হয়েছে যেমন সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ, ও কলিযুগ। মন যখন সত্ত্বগুণে অবস্থান করে তখন স্থির, সত্যযুগের প্রকাশ হয়। এর পর মন যখন রজঃগুণে অবস্থান করে তখন ত্রেতা যুগের প্রকাশ হয়, আবার মন যখন রজস্তমঃগুণে অবস্থান করে তখন দ্বাপর যুগের প্রকাশ হয় এবং মন যখন কেবলমাত্র তমোগুণে অবস্থান করে তখন কলি যুগের প্রকাশ হয় অর্থাৎ মনে সপ্ত বায়ুর দ্বারা এবং তাদের প্রত্যেকের আরও সাতটি করে বায়ু ৭ x ৭ = ৪৯ বায়ুর দ্বারা মনের এই চার প্রকারের ভাবের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ চারগুণের মধ্যে মনে চার প্রকার ভাবের সৃষ্টি হয়, এই চার ভাবে চার যুগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত এই ৪৯ বায়ুকে জেনে যিনি স্থিরাবস্থা লাভ করেছেন এবং আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন সেই সকল ব্যক্তি প্রাণকর্মকালে সর্বদা অচল সমাধিতে যুক্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ আমি-হারা ভাবরূপ সমাধি প্রাপ্ত হন।

**অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।**
**ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।৮**
**মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।**
**কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯**
**তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।**
**দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।১০**
**তেষামেবানুকম্পার্থমহজ্ঞানজং তমঃ।**
**নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১**

তাৎপর্য্যঃ— আমিই প্রাণরূপী আত্মা অর্থাৎ পরম পরাৎপর শ্রী শ্রী গুরুদেবই হলেন পরম প্রাণরূপী আত্মা। তিনি সাধারণ মনুষ্যগণকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করবাব উদ্দেশ্যে ধরায় অবতরণ করেন। তিনি সর্বদা আসক্তি শূন্য এবং অহং রহিত কর্তা ও সর্বদা স্থির প্রাণরূপ আত্মারই ভজনা করেন। তাঁরা ক্ষণকালও আত্মা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। সর্বদা তাঁরা আত্মচর্চায় নিযুক্ত থেকে এবং সাধারণ মনুষ্যগণকে সেই পথে চলবার আদেশ, উপদেশ ও আত্মক্রিয়া প্রদান করে আত্মচর্চায় নিযুক্ত থাকতে বলেন এবং আত্মচর্চার মাধ্যমে তাদেরকে তিনি সন্তোষ ও শান্তি প্রদান করেন। তাঁর এই পথ অনুসরণ করে যে সকল ব্যক্তি তাঁর ভজনা করেন সেই সকল ব্যক্তি তাঁর দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং 'আমি'-রূপী স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে লাভ করেন। তখন তাঁদের দেহে আত্মবিষয়িনী বুদ্ধি প্রকাশিত এবং সেই সকল সাধকের মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও আন্তরিকতার প্রকাশ দেখে তিনি তাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন এবং আলোকময় পথে তাকে বা সেই সাধককে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

**পরম্ ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।**
**পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।১২**
**আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।**
**অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।।১৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** জীবদেহ তিনগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা সর্বদা চলছে এবং নানাপ্রকার কামনা-বাসনা উৎপন্ন করছে। নাভিমন্ডল হল তেজস্তত্ত্ব স্বরূপ। এই নাভিমধ্য থেকে জীবভাবরূপী জীবদেহের সৃষ্টি হয়েছে। শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপ এই জীবভাবে থেকেই কূটস্থচৈতন্য শ্রীগুরু কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয়।

শ্রীগুরুদেব কূটস্থের ঊর্দ্ধে সহস্রারের স্থানে সদাসর্বদা অবস্থান করেন। আমাদের উচিৎ তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর উপর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের ন্যায় দিন যাপন করা। কারণ তিনি হলেন পবিত্র জ্যোতির্ময় আত্মার রূপস্বরূপ' তিনি 'আমি' ময় হয়ে রয়েছেন বলে তিনিই সেই নিত্যপুরুষ, তাঁর কোন ময়লা নেই। তিনি সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান। তাঁর উৎপত্তি বা প্রকাশ নেই। তিনি আপন হতে প্রকাশিত হন ও তিনি জনন রহিত এবং তিনি আমাদের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। তিনিই হলেন আদিদেব এবং সর্বদা আকাশে বা আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে কূটস্থ ব্রহ্ম দর্শন করিয়ে দেবতুল্য পদবাচ্য হয়েছেন এবং খেচরীসিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ঋষি পদবাচ্য হয়ে দেবর্ষি হয়েছেন। সেইহেতু তিনি নারদ পদবাচ্য। ত্রিতন্ত্রীরূপ বীণা বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদির অতীত স্থানে অবস্থান করছেন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপী বেদ সকল বিদিত হয়ে গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনিই স্বয়ং কূটস্থব্রহ্ম স্বরূপ।

তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর উপর নিজ আত্মশ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, ভালবাসা প্রদর্শন করে তাঁর নির্দিষ্ট পথ যিনি প্রকৃষ্টরূপে অবলোকন করতে পারেন, সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞানসংযোগে স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেব আপনা আপনি তাঁকে উপলব্ধি করিয়ে থাকেন এবং সাধককে নিজে ধরা দিয়ে তাকে তাঁর রূপ সকল সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে থাকেন।

**সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।**
**ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।।১৪**
**স্বয়মেবাত্মনাত্মানাং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।**
**ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা সাধকের জ্ঞানলাভ হলে ভগবৎ

সম্পর্কে তখন তিনি নিজেই সব কিছুর উপলব্ধি করতে পারেন এবং বিশেষ গুরুকৃপার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে খেচরী সিদ্ধি রূপ স্থিতিলাভ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ, সদ্‌গুরুলাভ করেও তাঁর উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন না করবার জন্য চঞ্চলতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বা শ্রীগুরুদেবকে তত্ত্বতঃ জ্ঞানে তাদের জানা সম্ভবপর হয় না। তারা সেইহেতু তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করেন। তাঁকে জানতে গেলে নিরঞ্জন পরমপদরূপ জ্ঞানাতীত অবস্থা বা সহস্রারে স্থিতি প্রাপ্ত হতে হবে। সেইহেতু সাধারণ মানুষ সেই সহস্রারে বা আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে অবস্থান না হবার জন্য তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না। তাই তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করেও মনের মধ্যে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে এবং সহজে তাঁর উপর বিশ্বাস আনতে পারেন না। নির্দিষ্ট এই পথে চলতে গেলে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা একান্ত আবশ্যক। তাঁর কথা এবং তাঁর কাজের উপর বিশ্বাস না থাকলে ভক্তি, শ্রদ্ধা আসা সুদূর পরাহত। ভক্তি, শ্রদ্ধা একমাত্র তাঁর উপর বিশ্বাসের দ্বারাই আপনা হতে এসে থাকে বা তিনি এনে দেন। বিশ্বাসটুকু তোমাকে নিজে থেকে আনতে হবে। অহংভাব মনে যত অধিক দানা বাঁধবে, বিশ্বাসভাব তত অধিক পিছনে পিছিয়ে যাবে। এর ফলে প্রকৃত ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাদের দ্বারা বা মনুষ্যরূপী জানোয়ারদের আসা সর্ম্ভব নয়।

এই কারণে ভগবান আত্মনারায়ণ স্বরূপ গুরুদেব বলছেন, নিজের উপর জোর খাটাও অর্থাৎ মন যা মানতে চাইছে না (গুরুবাক্য), তাকে বোঝাও এবং সেটাই সঠিক বলে বিশেষ জোরের সঙ্গে বিশ্বাসের দ্বারা এগিয়ে চল। তা হলেই তোমার চেষ্টা দেখে স্বয়ং 'আমিরূপী গুরুদেব' তোমার মধ্যে সেই বিশ্বাস এনে দেবেন।

এইভাবে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চল। পরম গুরুদেব সর্বদা সর্ব অবস্থাতে তোমাকে সঠিক পথে অর্থাৎ যে পথে চললে তোমার মঙ্গল সাধিত হবে, তিনি সর্বদা তাই করে থাকেন। তিনি তোমার অমঙ্গল, তোমার অনিষ্ট কখনও, কোনভাবেই চান না। তিনি পুরুষোত্তম আত্মারূপে আমাদের মতন জীবরূপী

ভূত সকলের মধ্যে শিবরূপে বিরাজ করছেন। তিনি হলেন আমাদের রক্ষা কর্ত্তা। আমাদের মধ্যে অহং জ্ঞান এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে আমরা তাঁকে নিতান্তই দেহধারী আমাদের মতনই সাধারণ জীব বলে মনে করি। তাই তাঁর নির্দিষ্ট পথে যতক্ষণ না নিজে চলে নিজের মনোমধ্য হতে অহং জ্ঞান দূরীভূত করতে পারছি,ততক্ষণ সেই জ্ঞানব্রহ্মের পরিচয় আমাদের দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁর কথা, তাঁর পথ, তাঁর উপদেশ, আদেশ অতি যত্ন সহকারে পালন করার চেষ্টা করা আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য। তবেই তুমি তাঁর প্রভাবে, তাঁর কৃপাতে এবং তাঁর নির্দিষ্ট পথে তাঁর দ্বারাই অগ্রসর হতে সক্ষম হবে — নচেৎ নয়।

**বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।**<br>
**যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬**<br>
**কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্।**<br>
**কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।।১৭**<br>
**বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।**<br>
**ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** ভগবান আত্মনারায়ণরূপী শ্রীগুরুদেব যোগৈশ্বর্য নিয়ে সকল জীবদেহে অবস্থান করছেন এবং তপস্বীগণের দ্বারা সেই যোগৈশ্বর্য্য বা বিভূতি জানা সম্ভবপর হয়। যিনি এই যোগরূপ মিলন করান, তিনি যোগীন্ পদবাচ্য, অর্থাৎ তপস্বী এই যোগীন্ পদবাচ্য।

সাধকের সাধনাভ্যাস কালে প্রথমাবস্থায় মন স্থির না হওয়ার জন্য সর্বদা এই নানারূপ দর্শনের ইচ্ছা এবং বিভূতি দেখবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জেগে উঠে এবং একবার দেখলে বারবার দেখবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। চঞ্চল অবস্থায় বা চঞ্চল মনের বশবর্ত্তী হয়ে এই আত্মক্রিয়া করবার জন্য আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার স্বরূপ চিনতে পারে না, এইসকল দৃশ্য বা বিভূতি দেখে তাঁর মধ্যে নানারূপ ভাবে তাঁর দর্শনের চেষ্টা করতে থাকে এবং মনের ইচ্ছা, দর্শন হওয়ার জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট ব্যক্ত করতে থাকে। মনের কামনার জন্য অনেক সময়

কূটস্থমধ্যে আত্মনারায়ণের দর্শনও পরিস্ফুট হয় না। চঞ্চল মনের বশবর্ত্তী হবার জন্য ক্রিয়া করা কালে কল্পনাজনিত নানাপ্রকার রূপ সাধক তার কল্পনার মাধ্যমে এঁকে বসে এবং সেই কল্পনা করতে করতে তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে। সেই কল্পনা মনের মধ্যে জাগরিত হওয়ার জন্য প্রাণকর্ম সঠিক উপায়ে হয় না, কারণ মনের মধ্যে তখন 'ওঁ'কার ও চক্র কিছুই স্মরণ হয় না। শুধুমাত্র বসে বসে নানারূপ কল্পনা করাই হয় এবং পরে ক্রিয়া থেকে উঠে চঞ্চলতার হেতু মনে করে যে 'আমি এর দর্শন পেলাম' বা মনের মধ্যে যে দর্শনের চিন্তা করছে, তা ভেবে প্রাণকর্ম করে ওঠার পর নিজেকে একটা বড় কেউকেটা মনে করে। আসলে তাদের কিছুই হয় না। যখন প্রকৃত দর্শন ও বিভূতি প্রকাশিত হবে, তখন সাধকের সেইদিকে কোন খেয়ালই থাকবে না। আজ্ঞাচক্রে মন যখন স্থির হয়ে আটকে যাবে এবং আরও ঊর্দ্ধে তা গমন করবে, তখন সাধকের প্রকৃত বিভূতি বা দর্শন হবে। পূর্বে অর্থাৎ প্রাণকর্ম শুরু করবার প্রথমাবস্থায় যা সকল দর্শন হবে তা কল্পনা থেকে উদ্ভূত। সেইদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করা একান্ত দরকার। এই সকলই ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা সাধককে বাধা দেওয়ার স্বরূপ। তাই প্রতিটি সাধককে অর্থাৎ প্রাণকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন সেই সকল সাধককে এই সকল দর্শন এবং বিভূতিতে মন না দিয়ে গুরূপদিষ্ট কাজ করে চলা উচিৎ।

**হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।**
**প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।।১৯**
**অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।**
**অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ**— শ্রী গুরুদেবের বিভূতির অন্ত নেই। সকল দৃশ্যমান বা যা প্রকাশিত হয় সেই সকলই তাঁর বিভূতি স্বরূপ। সকল ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাধক যখন মায়ামোহরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে, তখন জীবদেহ মধ্যে সেই প্রাণরূপী আত্মা বা শ্রীগুরুকে চিনতে পারবে। তখন তিনি দেখতে পাবেন আজ্ঞাচক্রে যিনি রয়েছেন, মূলাধারেও যিনি রয়েছেন, আবার দেহের

সকল অংশে যিনি রয়েছেন, সকলই সেই 'পরম আমি' রূপ গুরুদেব। তিনিই হলেন সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্তা অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে যে 'আমি', ভূমিষ্ঠ হবার পরেও সেই 'আমি', আবার দেহান্তর হবার সময়ও সেই একই 'আমি' অবস্থান করছেন। শুধু দেহের নাশ হচ্ছে। দেহী দেহ পরিবর্তন করে অপর দেহে গমন করছেন। তখনই সাধক তাঁর প্রকৃত বিভূতি সম্পর্কে অবগত হবেন।

**আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।**
**মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।।২১**
**বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।**
**ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের দেহের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং আরও যে দুই প্রকারের বায়ু রয়েছে তাদের মধ্যেও সেই 'আমি'রূপী পরব্রহ্মের অবস্থান রয়েছে। সেই 'আমি' রূপী প্রাণ হল জ্যোতিসকলের কিরণরূপ সূর্য্য, তাই বলা হয়েছে "সবিতা মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল"। এর মধ্যবর্ত্তীস্থানে ভগবান আত্মনারায়ণ বিরাজ করছেন। তাই বলা হয়েছে "সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ।"

দেহের মধ্যে মেরুদন্ডের উপরিভাগে ব্রহ্মযোনীর স্থান। আজ্ঞাচক্রের গহ্বরে মন প্রবেশ করাতে পারলে পূর্ণচন্দ্ররূপ নক্ষত্র দর্শন হয়। প্রাণক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস ঊর্দ্ধে স্থির করলে ব্রহ্মরন্ধ্র হতে একপ্রকার মিষ্ট রস মুখের মধ্যে নিঃসৃত হয়, তা অমৃত পদবাচ্য। এই অবস্থা একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হতে পারে। ঐ রস আস্বাদন করলে সাধকের অমরত্বপ্রাপ্ত হয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। আমাদের দেহের মধ্যে বহুবিধ নাড়ী রয়েছে। তাদের মধ্যে পিঙ্গলা সূর্য্যস্বরূপ, ইড়া চন্দ্রস্বরূপ এবং সুষুম্না অগ্নিস্বরূপ। এই চন্দ্র নাড়ীর সাহায্যে অপর সকল নাড়ীতে রস সঞ্চারিত হওয়ায় দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধক যে অমৃত পান করে তা এই চন্দ্র নাড়ী হতেই নিঃসৃত হয়। আমরা সদ্‌গুরুর দ্বারা বাসুদেবের যে গোলাকার মূর্ত্তি দেখি, তা সকলই চার বেদ স্বরূপ অর্থাৎ

যে অগ্নিবর্ণ নক্ষত্র দেখতে পাই তা ঋকবেদ স্বরূপ। যে কালবর্ণের গোলক দেখতে পাওয়া যায়, তা সামবেদ স্বরূপ। যে সাদাবর্ণের জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় তা যজুর্বেদ স্বরূপ এবং এর পর সাদা ও পীতবর্ণ মিশ্রিত হয়ে যে সোনালী রং-এর জ্যোতির ছটা দেখতে পাওয়া যায় তা অথর্ববেদ স্বরূপ। ঐ কালবর্ণরূপী গোলকই হল শূন্যধাতুরূপী প্রাণ আর ঐ সাদাবর্ণ হল আকাশ, প্রাণ ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণ, অপান বায়ুকে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গলোকে, বা দেবলোকে বা ইন্দ্রলোকে বা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থাপন করতে পারলে তখন সাধকের সকল ইন্দ্রিয় দমন করে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় এবং ইড়ানাড়ীস্থিত বায়ু বিগলিত হয়ে সুধাধারা বর্ষণ করে এবং দেহের পুষ্টি সাধন করে।

পরমাত্মারূপী 'আমি' হতে আমাদের দেহস্থিত সকল বায়ু সৃষ্ট হয়েছে এবং তার মধ্যে তিনি থেকে তাদের দ্বারা দেহস্থিত সকলকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে দেহের মধ্যে ভূতসকল, চেতনা সকল, তেজ, রক্ত, বায়ু সকলই পুষ্টি লাভ করছেন। এই দেহ 'আমি' রূপী পরমাত্মাযুক্ত হয়ে আছেন বলে সকল কার্য্য সঠিক রূপে চলছে, তাঁর অভাবে সকলই লয় হয়ে যাবে, তাই এক্ষেত্রে বল্সা যায় প্রাণরূপী আত্মাই হল সকল ভূতের চেতনা স্বরূপ।

**রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।**<br>
**বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।।২৩**<br>
**পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।**<br>
**সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ**—( প্রাণের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান ইত্যাদি বায়ু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রাণের যে স্থির ভাবরূপ অবস্থা রয়েছে সেই সকল স্থির অবস্থাই মঙ্গলময় শিব পদবাচ্য।

সেই শিবের একাদশ নাম রয়েছে, যেমন ঃ— (১) অজ (২) একপাৎ (৩) অহিব্রধ্ন (৪) পিনাকী (৫) অপরাজিত (৬) ত্র্যম্বক (৭) মহেশ্বর (৮)

বৃষাকপি (৯) শম্ভু (১০) হর ও (১১) ঈশ্বর।

(১) **অজ ঃ—** যিনি পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়ে জন্ম রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ যিনি উৎপত্তি ও নাশ বিহীন আত্মার সহিত মিলিত হন তিনি 'অজ' পদবাচ্য, কারণ তার মৃত্যু ও জন্ম কিছুই হয় না।

(২) **একপাৎ ঃ—** পরব্রহ্মরূপী আত্মনারায়ণ এই প্রাণ ধারণ করে আছেন। ত্রিজগতে আর কেউ নেই যিনি একে ধারণ করতে পারেন, কারণ তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্ত্তা শিব স্বরূপ। এই অর্থে তিনি একপাৎ পদবাচ্য।

(৩) **অহির্ব্রধ্ন ঃ—** কথাটির অর্থ হল অধিদেবতা।

(৪) **পিনাকী ঃ—** তিনিও এই প্রাণ স্বরূপ। পিনাকী— 'ওঁ' কার রূপী ধনুক বা পিনাক ধারণ করে আছেন যিনি, অর্থাৎ যিনি মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আমাদের এই দেহকে ধারণ করে রয়েছেন, তিনিই জীবাত্মারূপী শিব স্বরূপ, তিনিই পিনাকী পদবাচ্য।

(৫) **অপরাজিত ঃ—** ৪৯ বায়ুর মধ্যে পবন নামক বায়ু সমান বায়ুর মধ্যে একটি বায়ু, তা যিনি ধারণ করে আছেন, তিনিই অপরাজিত পদবাচ্য।

(৬) **ত্র্যম্বক ঃ—** তিন লোকের যিনি পিতা অর্থাৎ স্থিরব্রহ্ম দেহের মধ্যে আধার স্বরূপে থেকে উর্দ্ধ, অধঃ মধ্য তিন লোককে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রক্ষা করে চলেছেন। যিনি এইরূপ করেন তিনিই ত্র্যম্বক পদবাচ্য।

(৭) **মহেশ্বর ঃ—** প্রাণ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে, পরমেশ্বররূপী আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে, অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণে যিনি পরিবর্তিত হন, তিনিই মহেশ্বর পদবাচ্য।

(৮) **বৃষাকপি ঃ—** স্থিরপ্রাণরূপী আত্মা কর্ত্তৃক প্রাণের স্থির বায়ুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এটাই ধর্ম পদবাচ্য। এর দ্বারা প্রাণের পোষণ হয়ে থাকে অর্থাৎ যে সকল সাধক পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়ে প্রাণের পোষণ সাধন করে থাকেন, সেই সকল ব্যক্তি বৃষাকপি পদবাচ্য।

(৯) . **শম্ভু ঃ**— ইন্দ্রিয় দমন করে যখন অন্তঃকরণের স্থিরতা সাধকের দ্বারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করার হেতু তাঁর প্রাণ পরমাত্মায় মিলিত হয়। এর ফলে তিনি যা কিছু করেন সকলই মঙ্গলের জন্য করেন, তাই তিনি শিবরূপী শম্ভূ পদবাচ্য।

(১০) **হর ঃ**— হৃদয়কে হরণ করে ভাবরূপ অবস্থা হতে ভাবাতীত অবস্থায় যখন সাধক পদার্পণ করেন, তখন সেই প্রাণরূপী আত্মাই হর পদবাচ্য।

(১১) **ঈশ্বর ঃ**—(মনুষ্য দেহের মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব অবস্থিত। এদের মধ্যে ব্যোম বা শূন্য তত্ত্বই হল কুবের পদবাচ্য। আমাদের কণ্ঠতে বায়ুকে ধারণ করবার পর যেখানে সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রার রয়েছে, সেই অঞ্চলে মনকে প্রবেশ করাতে হয় এবং ব্যোমাতীত অবস্থায় অর্থাৎ পরমশূন্যে লয় প্রাপ্ত হয়ে কুবেরের ভাণ্ডার থেকে সাধনার্জিত ধন সাধকের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুবেরের ভাণ্ডার, কারণ পরমাত্মা কোনদিন শেষ হবার নয়। তাই তিনি কুবের ভাণ্ডার-স্বরূপ। তখন সাধক ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে তিনি কুবের জয়ী ঈশ্বর বা ধনঞ্জয় পদবাচ্য বলে বিদিত হন।

এই ঈশ্বররূপী 'আমি' দেহমধ্যস্থিত অষ্ট নাড়ীর মধ্যে অগ্নি রূপে অবস্থান করছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব।)

**আপ ঃ**—(আপবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যে চিত্রা নাড়ী আছে তার মধ্যে স্থির বায়ুরূপে অবস্থান করছেন। এর দ্বারা দেহের মধ্যে রক্ত সরববাহ সচল আছে।)

**ধ্রুব ঃ**— অলম্বুষা নাড়ীর মধ্যে যে উদান বায়ু রয়েছে তাঁরই একটি নাম হল ধ্রুব। এর দ্বারা বায়ু ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়ে বা শরীরমধ্যস্থ বায়ু উর্দ্ধদিকে গতি করে ঢেঁকুর উঠিয়ে থাকে, এই বায়ু মস্তকে ধারণ করলে (প্রাণায়ামের দ্বারা) নিশ্চয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

**সোম ঃ—** ঈড়া নাড়ীস্থিত যে প্রাণবায়ু রয়েছে তাই সোম পদবাচ্য।

**অনল ঃ—** সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যে সমান বায়ু রয়েছে তাই অনল পদবাচ্য। একে স্থির করে কূটস্থ পর্যন্ত গমনাগমন করায় ঊর্দ্ধ ও অধোরূপী ঘর্ষণের দ্বারা অর্থাৎ শ্বাসকার্য্যের দ্বারা নাভিতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তার মাধ্যমে খাদ্য-খাবার পরিপাক হয় অর্থাৎ অনল বায়ুর মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক হয়ে থাকে।

**অনিল ঃ—** গান্ধারী নাড়ীর মধ্যে যে স্থিরবায়ু রয়েছে, তার নাম অনিল। এটা মনের মধ্যে 'সকল কিছু বুঝিয়াছি' এমন আবরণ সৃষ্টি কবে রাখে, যার ফলে কিছুই বোঝা যায় না। এই বায়ুর জন্যই গুরূপদেশে ক্রিয়ার অনুভব সত্ত্বেও ক্রিয়ার কিছুই বোঝা যায় না।

**ধর ঃ—** পূষা নাড়ীর মধ্যে যে ব্যান বায়ু রয়েছে তার মধ্যে একটি হল এই ধর বায়ু। এই বায়ুর দ্বারা দেহধারণ করা সম্ভবপর হয়েছে। এই বায়ুর দ্বারা জীবদেহের গায়ে মাংসগুলি লেগে রয়েছে, খসে পড়ছে না। সকল প্রকার জীবদেহের মধ্যে এই বায়ু রয়েছে। তাই যত বড় জীবদেহ হোক না কেন এই বায়ুর অবস্থানের জন্য তাদের দেহধারণ সম্ভবপর হয়েছে।

**প্রত্যুষ ঃ—** পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত যে অপান বায়ু রয়েছে, তা'ই সূর্য্য পদবাচ্য। অপান বায়ু এই পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যখন স্থিরবায়ুতে রূপান্তরিত হয়, এর পর ঐ স্থিরাবস্থা হতে নিম্নে গমন করে। ঐ বায়ু যখন সাধকের যোগনিদ্রা ভঙ্গ করে এবং তাকে জাগরিত করে, তা যে বায়ুর মাধ্যমে হয়ে থাকে তাকে প্রত্যুষ বায়ু বলে। অপান বায়ুর মধ্যে একটি বায়ু হল প্রত্যুষ বায়ু।

**প্রভাব ঃ—** হস্তিনী নামক নাড়ীতে একটি স্থির বায়ু রয়েছে যা কূটস্থের মধ্যে থেকে চিৎ স্বরূপ আত্মাকে অনিচ্ছার ইচ্ছায় তৎপর করিয়ে ইচ্ছার সৃষ্টি করছেন। এই বায়ু প্রভাব বায়ু পদবাচ্য।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যে ব্রহ্মযোনীর স্থান, ঐ স্থানই শীতল ও শান্ত। ঐ

স্থান অতিক্রম করলে তখন সাধকের এক অপার শান্তি অনুভব হয়ে থাকে। তাই এই স্থানই সুমেরু পদবাচ্য। এই ব্রহ্মযোনী অর্থাৎ কূটস্থের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ভ্রূদেশের পশ্চাতে একটি পর্বতের ন্যায় ত্রিকোণাকার যোনী দেখতে পাওয়া যায়। এই পর্বতের ন্যায় ত্রিকোণাকার যোনীই সুমেরু পর্বত পদবাচ্য। এই ব্রহ্মযোনী স্থানে পরমাত্মা পূর্ণজ্যোতির্ময়রূপে রয়েছেন।

সকল সম্মানিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রাণকে উর্দ্ধস্থানে স্থির করে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে সমর্থ হয়েছেন এবং যুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি বৃহস্পতি পদবাচ্য। তিনি সকল দেহের মধ্যে অবস্থান করে দেহরাজ্যের অগ্রজ বা সেনাপতিরূপে অবস্থান করছেন। তাই তিনি কার্ত্তিক পদবাচ্য। আমরা লক্ষ্য করেছি কার্ত্তিকের একটি হাতে তীর, অপর হাতে ধনুক থাকে। তার অর্থ দেহরূপী ধনুকের দ্বারা, গুরুরূপী শর বা তীর এবং প্রাণায়ামরূপী যুদ্ধের দ্বারা যিনি ইন্দ্রিয়গণকে এবং পঞ্চতত্ত্বাদিকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তিনি উত্তমপুরুষরূপ কার্ত্তিক পদবাচ্য। আমাদের দেহের মধ্যে নদী, সাগর সকলই রয়েছে। যেমন বাম নাসিকায় ঈড়া নাড়ী হল গঙ্গানদী পদবাচ্য, ডান নাসিকায় পিঙ্গলা, হল যমুনা নদী পদবাচ্য। মেরুদন্ড মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ী হল সরস্বতী নদী পদবাচ্য। বামকর্ণে গান্ধারী নাড়ী হল কাবেরী নদী পদবাচ্য। ডান কর্ণে হস্তিনী নাড়ী হল সিন্ধু নদী পদবাচ্য। ডান চোখে অলম্বুষা নাড়ী— গৌতমী নদী পদবাচ্য, বামচক্ষে পুষা নাড়ী হল তাম্রপর্ণী বা তাপ্তীনদী পদবাচ্য। এই সকল নদীরূপী বায়ু, নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং মস্তকে অবস্থান করে স্থির হয়ে মেরুদন্ডের উর্দ্ধে প্রশান্ত মহাসাগররূপ আত্মানন্দে বিলীন হচ্ছে।

আমাদের দেহস্থিত ক্ষীরোদসাগররূপ হৃদিস্থান 'ওঁ'কাররূপী বায়ুর দ্বারা মন্থন করতে পারলে বায়ু উর্দ্ধদিকে গমন করে। এর ফলে মূলাধারস্থ কুলকুন্ডলিনী শক্তিরূপী সর্প প্রাণকর্মরূপী মন্থনের দ্বারা আদিত্যহৃদয়ে দেবী কৌশিকী, ভ্রূ'র উর্দ্ধে প্রকাশিত হন। ইনিই হলেন পরা প্রকৃতি, যা জ্যোতির্মণ্ডল রূপ মণি বা নক্ষত্রস্বরূপ। তখন ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যস্থিত বায়ু স্থির হয়ে সুষুম্নায় অবস্থান করে এবং এই তিনবায়ু একত্রে মিলিত হয়ে মহাসাগর বা আত্মানন্দে

বিলীন হয়ে যান। তাই ঐ স্থান ত্রিবেণী সঙ্গম এবং 'রাজস্থান' স্বরূপ। এইভাবে প্রাণকর্ম করে মনের অবগাহন করাতে পারলে কর্মফলজনিত যে সকল পাপ উদ্ভূত হয়েছিল, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

**মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।**
**যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫**
**অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীনাঞ্চ নারদঃ।**
**গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।।২৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণরূপী আত্মাই হচ্ছেন শিব স্বরূপ। এই প্রাণের প্রকাশ সপ্ত বায়ুরূপে বা মহর্ষি রূপে, এই প্রাণবায়ুকে উচ্চে অর্থাৎ দেহের উচ্চস্থানে অবস্থান করিয়ে স্থির প্রাণরূপী ব্রহ্মে মিলিত হতে পারলে, এই প্রাণ বায়ু যা চঞ্চল তা কূটস্থের উর্দ্ধে অব্যক্ত ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়ে স্থির ব্রহ্মরূপী পদে অবস্থান করেন। এই স্থির বায়ুই ভৃগু পদবাচ্য। অব্যক্ত স্থানে অবস্থান করার জন্য প্রণব ধ্বনি ছাড়া তার আর কিছুই বাচক ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। সেইহেতু তিনি একাক্ষর। প্রাণ অপানের ঊর্দ্ধরূপী ক্রিয়ার দ্বারা অজপার যজ্ঞ বা ক্রিয়া যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সাধন করেন, সেই সকল ব্যক্তি সহস্রাররূপ হিমালয়ে স্থিতি প্রাপ্ত হন। সেই অঞ্চলে মন প্রবিষ্ট হলে শান্ত ও শীতল হয়ে যায়। তাই সহস্রার হিমালয় পদবাচ্য।

(আমাদের এই দেহ অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষ স্বরূপ, যেখানে আত্মা সদা সর্বদা বাস করছেন। তা অর্থাৎ এই দেহ কেবল মাত্র সাধনোচিত কাজ করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। কোনরূপ ভোগ বিলাস করবার জন্য এই দেহ সৃষ্টি হয় নি। প্রাণকর্মের দ্বারা — আত্মার ধ্যান করিয়ে যে সকল ব্যক্তি আত্মস্থ হতে পারেন সেই সকল ব্যক্তি অশ্বত্থী পদবাচ্য অর্থাৎ বৃক্ষগণের মধ্যে 'আমিরূপী' অশ্বত্থই বিরাজ করছে। সেইহেতু পূজা অর্চনা কালে অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষ সাধারণ মানুষগণ পূজা করে থাকেন। জ্ঞানদাতা একমাত্র নারদরূপী আত্মাই হচ্ছেন স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীগুরুদেব। সেইজন্য পরম গুরুদেব নারদ পদবাচ্য। কূটস্থের মধ্যে কালো গোলাকার বা ঘনশ্যাম বর্ণের যে গোলক পীত জ্যোতির মধ্যে

দেখতে পাওয়া যায় তাই পরব্রহ্ম আত্ম নারায়ণ স্বরূপ শ্রীগুরু।)

**উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।**
**ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।।২৭**
**আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।**
**প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পানামস্মি বাসুকিঃ।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** সদগুরু লাভের পর তাঁর আদেশ উপদেশ মেনে প্রাণকর্ম করা উচিৎ। সাধক এই ওঁকার রূপী প্রাণকর্ম করবার সময় প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ুর ঘর্ষণ করে থাকেন। এটাই সমুদ্র মন্থনের ক্রিয়া। ত্রিকূট ব্রহ্মযোনীরূপী মন্দর পর্বতকে এই মন্থন ক্রিয়ার দ্বারা বিগলিত করা সম্ভবপর হয়। সাধক বায়ুকে স্থির করে সেই স্থির বায়ুর দ্বারা মুলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী রূপী যে সর্প অবস্থান করছে তাকে উর্দ্ধে অবস্থান করিয়ে এই মন্দর পর্বতরূপী সহস্রারের দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে টানা পোড়েন যা চলতে থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের ঘর্ষণের ফলে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে অশ্ব এবং ঐরাবৎ অবস্থিত। অশ্ব হল আমাদের দেহস্থিত মন যা সর্বদা ছুটে বেড়ায় এবং ঐরাবত হল স্থির বায়ুরূপ। 'ওঁ'কার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণের গতি এই মন্থনরূপ প্রাণ কর্মের মাধ্যমে দুই ভ্রূর মধ্যে স্থির করতে পারলে সেইস্থানে আদ্যাপ্রকৃতিস্বরূপা মা জগদ্ধাত্রীর প্রকাশ হয়ে থাকে।

এই কূটস্থ চৈতন্যই নরদেহের অধিপতি স্বরূপ। এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সকল রিপুগণের দমন এবং সাধনায় সহায়তাকারী রিপুগণের পালন হয়ে থাকে। তাই এই কূটস্থচৈতন্যই নরদেহের বা মানবদেহের রাজা রূপে অভিহিত হন। সেই কূটস্থ মধ্যে পরম 'আমি'রূপী নরাধিপ অবস্থিত, অর্থাৎ ঐ কূটস্থের মধ্যেই পরব্রহ্ম স্বরূপ আমির প্রকাশ।

স্থির বায়ুর ক্রিয়ায় পরব্রহ্মরূপী সেই 'আমিই' হল বজ্ররূপী অস্ত্র, যার মাধ্যমে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়ে থাকে সেইহেতু একে হৃদয় বিদারক বলা হয় অর্থাৎ হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদের সময় 'ওঁ'কাররূপী যে চক্র সাধক দেখতে পান, তাই

হৃদয় বিদারক। পরব্রহ্মরূপী সদ্গুরুর দ্বারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। সাধকের একান্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দ্বারা যদি এই প্রাণকর্ম করা সম্ভবপর হয় তবেই ভগবান গুরুদেব তার মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকেন কারণ তিনি হলেন কামধেনু স্বরূপ এবং তার দ্বারাই ইচ্ছারহিত কাম উৎপন্ন হয়, তাই তিনি কন্দর্প স্বরূপ। আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল স্থির বায়ু রয়েছে, সেই সকল স্থির বায়ুকে ঊর্দ্ধে এবং অধেঃ স্থিতি ঘটিয়ে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে এবং মূলাধারে স্থিতি ঘটিয়ে প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু চালনা করছেন। তার ফলে বায়ু বের হয়ে গেলে পুনরায় তা প্রবেশ করে। তিনিই দেহের স্থিতিরূপ আধার রূপে ঊর্দ্ধে এবং অধেঃ উভয় স্থানে অবস্থান করছেন। তাই চঞ্চল প্রাণ ঠিকভাবে চালিত হচ্ছে। তিনি এই দেহভাণ্ডটি চালনা করছেন এবং দেহের মধ্যস্থিত স্থির বায়ুরূপী নাগ সকলকেও চালনা করছেন। সেইহেতু তিনি বাসুকি পদবাচ্য।

**অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।**
**পিতৃনামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।।২৯**
**প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।**
**মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহম্ বৈনতেয়শ্চ পক্ষিনাম্।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মের দ্বারা নাগাদিরূপ বায়ুকে কণ্ঠ হতে ভ্রূ'র মধ্যে নিঃশেষরূপে অবস্থান করাতে পারলে স্থিরপ্রাণরূপ ঐ নাগবায়ু বা উদান বায়ু স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। ঐ স্থিরবায়ুই অনন্তনাগ পদবাচ্য। আমাদের দেহে যে রক্ত চলাচল করে তা ব্যান বায়ুর দ্বারা হয়ে থাকে অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণের দ্বারা তা মস্তকে এবং প্রশ্বাসের দ্বারা পায়ে অর্থাৎ সমগ্রদেহে হরিণের মতন লাফিয়ে বেড়ায়। এই বায়ু বরুণ পদবাচ্য। প্রাণ-অপান বায়ুর মধ্যে যে প্রাণ সর্বদা গমনাগমন করছে, সেই প্রাণ হল আদিত্য স্বরূপ।

উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করে অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে যিনি স্থির হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি সংযমী ব্যক্তি পদবাচ্য। এই সকল ব্যক্তির দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মকে জানা সম্ভবপর হয়। এই ব্রহ্মই হল ধর্মস্বরূপ এবং যিনি এই ব্রহ্মকে জানতে পারেন এবং সেখানে লয়প্রাপ্ত

হন, সেই সকল ব্যক্তি ধর্মরাজ বা যমরাজ পদবাচ্য। এই সকল সংযমকারী ব্যক্তির দ্বারাই জীবের পোষণ হয়ে থাকে।

আমাদের মনের মধ্যে চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপী রিপুসকল হল দৈত্যস্বরূপ এবং মনকে স্থিরাবস্থায় অবস্থান করবার জন্য যে সকল বায়ু বা রিপু সাহায্য করে থাকে, তারা প্রহ্লাদ বা আনন্দস্বরূপ। প্রাণকর্মের দ্বারা মনকে পরাবস্থায় রাখতে পারলে এই আনন্দ প্রস্ফুটিত হয়। এই সময় স্থির প্রাণকে অর্থাৎ যা অজপা রূপে আমাদের দেহে অবস্থিত, সেই অজপাকে মস্তকে ধারণ করে যিনি সর্বদা স্থির হতে পেরেছেন, তিনিই এই অজপাকে বশ করতে পেরেছেন। আত্মক্রিয়া করবার সময় প্রাণ স্থির হলে সাধক আজ্ঞাচক্রে সিংহরূপ অথবা ব্যাঘ্ররূপ দেখতে পান। তা'ই 'আমি'রূপ পরম আত্মার বিক্রমস্বরূপ। এছাড়া প্রাণ স্থির হলে দুই ভ্রূর মধ্যে উড়ন্ত পাখী দৃষ্টিগোচর হতে পারে। তা আকাশে গমনরূপী খেচরী অবস্থা। প্রাণ সমানবায়ুতে স্থিতিলাভ করলে দুই ভ্রূ'র মধ্যদেশে নির্বাতস্থ দীপের ন্যায় এক জ্যোতি দর্শন হয়ে থাকে। তা হল সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপ। ঐ অবস্থায় সাধকগণ এইরূপে একজায়গা হতে অন্য জায়গায় বা এক স্থান হতে বহুস্থানে গমনাগমন করতে পারেন। ঐ দীপ হল এই সূক্ষ্মদেহের প্রতীক স্বরূপ।

**পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।**
**ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।৩১**
**সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।**
**অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতাহম্।।৩২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের দেহের মধ্যে যে ঊনপঞ্চাশ বায়ু রয়েছে, তাদের মধ্যে পবন নামক বায়ু কণ্ঠ হতে যোনিদেশ পর্যন্ত অবস্থান করছে। তাই এই বায়ু অতি পবিত্র। এই বায়ুর দ্বারা মন পবিত্র এবং মুগ্ধ হয়ে থাকে। ভগবান আত্মনারায়ণ শরীরস্থ বেগবান বায়ুর মধ্যে পবন। প্রাণের উর্দ্ধগতিরূপ রমণক্রিয়ার দ্বারা 'ওঁ'কাররূপী বাণক্ষেপণের মাধ্যমে প্রাণস্থির করতে পারলে আত্মারামের দর্শন লাভ হয়ে থাকে। তিনিই এই দেহরূপ পিনাকী ও গাণ্ডীব

ধারণ করে আছেন। তাই আমরা রাম চন্দ্রের মূর্ত্তিতে ধনুক ধারণ করে থাকার অবস্থা লক্ষ্য করে থাকি। অজপা হল আমাদের দেহের মকর বা কুমীর স্বরূপ। তাই প্রাণের যে ঊর্দ্ধগতিরূপ ক্রিয়া হচ্ছে সেটাই প্রাণের মকর পদবাচ্য অজপা। ঈড়া নাড়ীর মধ্য দিয়ে এই অজপা বিচরণ করছেন এবং ঈড়া নাড়ী হল গঙ্গার প্রতীক। তাই গঙ্গার বাহন হল মকর। ঈড়া নাড়ীস্থিত প্রাণবায়ুর অগ্নিস্বরূপ ক্রিয়া হচ্ছে স্রোতযুক্ত; তাই গঙ্গার স্রোতস্বরূপ, সেই জন্য একে জাহ্নবী স্বরূপা বলা হয়। এই জাহ্নবী হৃদিস্থানে অবস্থান করছেন। আর এই প্রাণরূপী আত্মাই হচ্ছে গঙ্গা।

'আমি'রূপী এই পরব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতেও ছিলেন, সৃষ্টির অন্তেও আছেন এবং মধ্যেও অবস্থান করছেন অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেও তিনি স্থির প্রাণরূপে অবস্থিত ছিলেন, দেহান্তের পরেও তিনি স্থির প্রাণরূপে অবস্থিত থাকবেন এবং ভূমিষ্ঠ হবার পরেও চঞ্চল প্রাণরূপে মধ্যাবস্থায় অবস্থান করছেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে আত্মজ্ঞ হবার পর প্রকৃত উত্তর সম্পর্কে সাধক অবগত হতে পারেন অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপী যুদ্ধের দ্বারা 'আমি'রূপী বাদী এবং ইন্দ্রিয় সকলরূপী প্রতিবাদীগণকে নিরস্ত করতে পারা যায়। স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন তিনি অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মস্বরূপ 'আমি' বাদীগণের শক্তিরূপে বা জ্ঞানরূপে তাদের মধ্যে অবস্থান করেন।

**অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামসিকস্য চ।**
**অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।৩৩**
**মৃতুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌।**
**কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীনাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।৩৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের শরীরের মধ্যে যে বায়ু রয়েছে তার মধ্যে সুষুম্নানাড়ীস্থিত বায়ু 'অ'কার, স্বরূপ, অর্থাৎ বিষ্ণু, ঈড়া নাড়ীস্থিত বায়ু 'উ' কার স্বরূপ অর্থাৎ মহেশ্বর স্বরূপ, পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত বায়ু 'ম' কার স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মা। এই তিন নাড়ীস্থিত বায়ুর মধ্যে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম' কার স্বরূপ বায়ুই স্থির বায়ু পদবাচ্য। এদের মধ্যে যে বর্ণ সমুদয় রয়েছে তন্মধ্যে সুষুম্নার

স্থির বায়ুরূপী বিষ্ণুই সেই পরম 'আমি'র স্বরূপ।

আমাদের দেহস্থিত যে ৪৯ বায়ু আছে সেই সকল বায়ু বিভিন্ন বর্ণ সমুদয় বা বর্ণমালার মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ প্রতিটি বায়ুরই একটি করে বর্ণ আছে, এই বায়ু হতেই বর্ণগুলি উদ্ভুত। এই সকল বায়ুকে কণ্ঠের ঊর্দ্ধে স্থিতি প্রাপ্ত করাতে পারলেই অজপার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়। কণ্ঠের নিচে বায়ু অবস্থানের ফলে বায়ু চঞ্চল হয়ে মনের মধ্যে ব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে প্রাণরূপী আত্মার দ্বারা যা সৃষ্টি হয় তা ব্যক্ত করা সম্ভবপর হয়। এই জন্য তাকে বিশ্বতোমুখধাতা বলা হয়। এই সকল বায়ুর বর্ণ ও তাঁদের সমাস এবং অজপাকে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করাতে হলে সদ্‌গুরুর কৃপায় প্রাণ কর্ম করে তা জ্ঞাত হতে হবে। সদ্‌গুরু ব্যতিরেকে এই সকল বিষয়ের পরিচয় অপর কেউ করাতে পারেন না, কারণ এই প্রাণক্রিয়া সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা।

আমাদের দেহের মধ্যে প্রাণ যতক্ষণ বর্তমান রয়েছে ততক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা চালিত হই এবং পঞ্চতত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হই এবং নানারূপ কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাই। সদ্‌গুরুর আদেশ উপদেশ শুনে একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে যদি প্রাণকর্ম করে সাধক শূন্যে লঁয়প্রাপ্ত হয়ে শূন্যত্ব প্রাপ্ত হয় তখন ইন্দ্রিয় রহিত ও পঞ্চ তত্ত্ব রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই হল মৃত্যুর অবস্থা— বা সর্বসংহার ভাব। তেমন সাধারণ জীবদেহে যখন নাভিশ্বাস উঠে, মৃত্যু এসে জীবের বুকের উপর চেপে বসে তখনই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রাণই হচ্ছে সংহারক মৃত্যু, এই প্রাণই হল শক্তিরূপা এবং বহ্নিবীজ তেজস্তত্ত্ব স্বরূপ। বিনা অবলোকনে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে বায়ুকে স্থির করতে পারলে মনের মধ্যে এক প্রকার স্থিরভাব এসে উৎপন্ন হয়, এর ফলে আত্মধ্যানের মধ্যে মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয়। তখন মন বিষয়ভিমুখে ধাবিত হয় না। এইভাবে আজ্ঞাচক্রের স্থানে চিত্ত বা মনকে স্থির করে ১৪৪টা উত্তম প্রাণায়াম করলে ধারণা অবস্থা জাগ্রত হয়। এই ধারণার মাধ্যমে স্থিরভাব কি বস্তু তার ক্ষণিক ধারণা সাধকের বুদ্ধিতে আসে, তাই তা ধারণাবতী বুদ্ধি পদবাচ্য। এইভাবে কূটস্থে অবস্থিতি রূপ স্থিতিশক্তি বা বায়ুস্থিরের

শক্তি দিনে দিনে বাড়িয়ে গেলে আত্মবিদ্যারূপ শক্তি, আত্মস্মরণের ক্ষমতারূপ শক্তি, ধারণাবতী বুদ্ধিরূপ শক্তি, ধৈর্য্য শক্তি, ক্ষমা শক্তি, সহিষ্ণুতা শক্তি এবং বায়ুস্থিরের অবস্থাজনিত শক্তি সাধকের মধ্যে ধীরে ধীরে গুরুকৃপার দ্বারা প্রকাশিত হয়।

**বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।**
**মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ।।৩৫**
**দ্যুতম্ ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।**
**জয়োস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট এই প্রাণক্রিয়াই হল গায়ত্রী পূজার ক্রিয়া। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা গায়ত্রী পূজা করে থাকি তা হল—

"ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো
য়ো নঃ প্রচোদয়েৎ ওঁ।"

ওঁ ভূ ঃ— মুলাধার, ওঁ ভূবঃ- স্বাধিষ্ঠান, ওঁ স্বঃ - মনিপুর, ওঁ মহঃ - অনাহত , ওঁ জনঃ - বিশুদ্ধাখ্য, ওঁ তপঃ - আজ্ঞাচক্র, ওঁ সত্যং - সহস্রার।

এই প্রাণ কর্মের দ্বারা ষট্চক্রের মধ্য দিয়ে 'ওঁ'কাররূপী বাণক্ষেপণের মাধমে দুভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ কূটস্থে মনকে এনে আরও উর্দ্ধদেশে স্থাপন করতে পারলে অর্থাৎ সহস্রারে বিনা অবরোধে স্থির করতে পারলে, বিশেষ তেজ বিশিষ্ট এক জ্যোতির দর্শন হয়ে থাকে। তাই হল গায়ত্রী দেবী বা দেবমাতা গায়ত্রী স্বরূপা অজপা অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে দর্শন ক্রিয়ার কালে যে গোলাকার কালো বর্ণের গোলক সাধক দেখে থাকেন তাই হল সাম বেদ স্বরূপ এবং প্রাণকর্মের মধ্যে যে অজপা রয়েছে সেই অজপাই হল গায়ত্রীর স্বরূপ। সুষুম্না মার্গের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ মেরুদন্ডের মূলরূপী মুলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত তখন সাধকের একভাব বিরাজ করে, এই হল ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত স্বরূপ অর্থাৎ

তখন ঈড়াও নেই পিঙ্গলাও নেই তখন তাপ বা শীতলতা কোন কিছুই সাধককে স্পর্শ করতে পারে না (ঈড়া অর্থাৎ শীতল এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ তাপ) তখন সুষুম্নামার্গে স্থিতিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সাধক আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন এবং চিরবসন্তের রাজ্যে বিরাজ করেন।

দেহের মধ্যে সত্ত্ব, রজ, তমো তিন গুণই হচ্ছে পাশা স্বরূপ বা ছলনা বা কৌশল স্বরূপ এবং যোগক্রিয়া হল দ্যূত ক্রিয়ার স্বরূপ। প্রাণকর্মের দ্বারা যোগক্রিয়ার কৌশল করায়ত্ত করতে পারলে ভবরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃরূপী এই তিন পাশাকে গুরূপদেশ মত ঠিক ভাবে চালনা করতে পারলে জয়লাভ করা সম্ভবপর হয় অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত আত্মক্রিয়ায় একাগ্রতা প্রকাশ করে মনকে সেই অভিমুখে চালনা করতে পারলে মনের মধ্যে শ্রীগুরু কর্তৃক এক শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবের সৃষ্টি হয়, একে আশ্রয় করলে পাপকর্ম কমতে থাকবে। ঈড়া পিঙ্গলার বায়ু স্থির হয়ে চালনা করে, প্রাণের মধ্য থেকে পঞ্চতত্ত্ব, তিনগুণ, ছয় রিপু, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে মুক্ত করে, চঞ্চলা প্রকৃতি স্বরূপা পরাপ্রকৃতিকে 'ওঁ'কাররূপী প্রাণকর্মের দ্বারা তুষ্ট করে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে লীন হয়ে, কূটস্থ চক্ররূপী গহ্বরের মধ্যে মন প্রবেশ করিয়ে, হৃদয় আকাশরূপ গগনে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে, পরমাত্মতত্ত্বে বিলীন হওয়া সম্ভবপর হয়। কৌশল ব্যতীত যোগক্রিয়া আয়ত্ত করা যায় না। সেই হেতু বলা হয়েছে যে যোগক্রিয়া দ্যূত স্বরূপ। এই পরমাত্মতত্ত্বে মনকে বিলীন করতে পারলে সাধক তেজস্বী হয়ে সাধনায় জয় লাভ করেন এবং পরমাত্মরূপ সেই 'আমি' প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সুষুম্নারূপ স্থির প্রাণে অবস্থান করেন।

**বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পান্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।**
**মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।।৩৭**
**দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।**
**মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।৩৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রচন্ড এই জ্যোতির ছটায় সাধক নিজেকে আহুতি

দিয়ে পুরুষোত্তম রূপ বাসুদেব রূপে বা পরমবস্তুরূপ পরমাত্মরূপে বিদিত হন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এই পঞ্চ তত্ত্বের গণ্ডী পেরিয়ে সেই জ্যোতির ছটায় যখন সাধক লীন হয়ে যান, তখনও তার নাভিতে ধনঞ্জয় নামে একপ্রকার বায়ু থাকে, এই বায়ু দেহান্তের সময় মৃতদেহের মধ্যেও থেকে যায়, এটাও পরমাত্মার প্রকাশ অর্থাৎ দেহ জড়ত্ব প্রাপ্ত হলেও তার মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ বা 'সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ' এইভাব পরিলক্ষিত হয়। আত্মস্থ হয়ে সাধকগণ তিনগুণ রূপী বেদ সমূহকে অতিক্রম করে আরও ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হন বলে ঐ সকল সাধকগণকে বেদ বিভাগকারী ব্যাস বলা হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বারা প্রাণ হতে উৎপন্ন সকল প্রকার শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে বলে ঐ সকল ব্যক্তি কবি পদবাচ্য, তাই তাঁকে শুক্রাচার্য্য বলা হয়ে থাকে।

প্রাণকর্মরূপী দণ্ডের দ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা দমিত হয়ে থাকে এবং রিপুগণ দমন প্রাপ্ত হয়, তাই চঞ্চল মনের পক্ষে বা চঞ্চল প্রাণের পক্ষে প্রাণায়ামই হল প্রধান দণ্ড স্বরূপ। সাধন সমরে জয়লাভ করতে ইচ্ছা থাকলে সদ্‌গুরুকরণ করে তাঁর আদেশ উপদেশ এবং তাঁর সুধামাখা নীতি অনুসরণ করে সাধক একান্তনিষ্ঠ হলে সাধকের দ্বারা প্রাণকার্যের গোপনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয়। মনের লয় হবার জন্য মৌনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন বিদ্রোহী কবি নজরুল, বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে আত্মক্রিয়া প্রাপ্ত হয়ে গুহ্য তত্ত্বরূপী 'আমি'কে জানতে পেরে নিজ বোধ ত্যাগ করেছিলেন, সেইহেতু শেষ জীবনে তাঁর মৌনাবস্থা প্রাপ্তি হয়েছিল অর্থাৎ যখন মনের লয় হয়ে থাকে তখন মনের মধ্যে বাকসংযম রূপ ভাবের সৃষ্টি হয়।

**যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।**
**ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯**
**নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।**
**এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।।৪০**
**যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।**

**তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্।।৪১**
**অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।**
**বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মকর্ম প্রাপ্ত হলে তা করবার সময় স্বয়ং 'আমি'রূপী গুরুদেব সাধকগণের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন এবং একান্ত প্রার্থনা এবং আন্তরিকতার হেতু তিনি তাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করে চর-অচর রূপ ভূত সকলের অস্তিত্ব লোপ করিয়ে প্রাণের স্থিরতা সাধকের মধ্যে ঘটিয়ে থাকেন।

তখন সাধকের দ্বারা বোঝা যায় ভগবান আত্মনারায়ণ স্বরূপ পরম গুরুদেব তার দেহাভ্যন্তরে উপবেশন করিয়ে তাকে প্রাণ ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মস্থ করিয়ে রেখেছিলেন।

ভগবান আত্মনারায়ণ গুরুদেব হলেন তেজস্বী মহাপুরুষ এবং পরমাত্মারূপ 'আমি'র সঙ্গে মিশে তিনি স্বয়ং 'আমি' পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই তাঁর দ্বারা উৎপন্ন সকল কার্যই তেজরূপ আত্মপ্রভাবের অংশ হতে উদ্ভূত বলে জেনো এবং এই তেজস্বী ব্যক্তির তেজ সকল সেই পরব্রহ্মের 'আমি'রই তেজ বা আত্মনারায়ণের তেজ।

পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্থাৎ যা অব্যক্ত অংশ তা লাভ হলে সাধকের দ্বারা সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর হয়। পরম গুরুদেব দ্বারাই এই সকল জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই সাধকের ভগবান সম্পর্কে মনোমধ্যে থেকে নানারূপ ভেদ জ্ঞানের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক পড়ে তা থেকে নানারূপ জ্ঞানার্জন করে বা বহুবিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে নানারূপ প্রাণের কথা শুনে মনের হিল্লোল তুলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তা নিজের বোধে আসে। তাই সদ্‌গুরুর আদেশ-উপদেশ মানা এবং তাঁর উপর থেকে সকল ভেদজ্ঞান কাটিয়ে তাঁকে মন-প্রাণ সকলই উজার করে দিয়ে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ কূটস্থে তাঁর ধ্যান করে তাঁকে জানতে পারলে তিনি ছাড়া জগতের আর কোন কিছুতেই দ্বিতীয় কোন অবস্থান নেই তা জানতে পারা যায় অর্থাৎ 'এক ব্রহ্ম

দ্বিতীয় নাস্তি'। তাই সাধক, প্রাণকর্মে উন্নতি করতে চাইলে গুরুদেবের আদেশ, উপদেশ মেনে একমাত্র কূটস্থে লক্ষ্য রেখে চল। সর্বদা তাঁকে চিন্তা করে চল, তাহলে তোমার দ্বারা সেই আন্তরিক স্মরণ মননের ফলে তুমি উত্তমরূপ প্রাণকর্ম করে তাঁকে জানতে বা বুঝতে পারবে এবং তোমার দেহস্থিত ভেদজ্ঞান কেটে জ্ঞানের আলোকমঞ্জরী প্রস্ফুটিত হবে।

তাই তাঁকে জানতে বা বুঝতে গেলে সাধককে বা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে।

।। ইতি বিভূতি যোগ সমাপ্ত ।।

—ঃ ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—

# একাদশোঽধ্যায়ঃ

## বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগত মম।।১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মীগণের স্বয়ং গুরুদেবই হল তাদের শরীরস্থ তেজরূপ। সাধন সমরে জিতেন্দ্রিয় হতে গেলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হবে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থে তাদের শেষ করা নয়, কারণ তারা শেষ হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ই থাকবে কিন্তু সকলে তারা সাধকের বশে থাকবে, অর্থাৎ পদ্মপাতার উপর জল পড়লে যেমন তা তার মধ্যেই থাকে কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় না সেরূপ অর্থাৎ জ্যোতির্মণ্ডলরূপী কূটস্থচৈতন্যে মন নিবদ্ধ হলে মন তাতে লয় প্রাপ্ত হয়ে স্থির হয়ে যায় এবং ইন্দ্রিয়সকল দমিত বা স্থির হয়ে যায় ও তাদেরকে বশ করা সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়।

পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মাই হল প্রাণরূপী আত্মা। শ্রীগুরুই হলেন পরব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই হলেন ঈশ্বর এবং প্রাণের অব্যক্তভাবরূপ স্থির পরমাত্মভাবের অতীত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হলে তবেই তার প্রকাশের অবস্থা সাধকের দ্বারা দর্শিত হয় এবং সকল কিছুর মধ্যেই সেই এক প্রাণ পরিলক্ষিত

হয় এবং তিনি বিভিন্ন প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন তা জানা যায়, এছাড়া তিনি ভিন্ন অপর কিছুই নেই ,তাও সাধকের দ্বারা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ তিনিই হলেন উৎপত্তির মূলস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা । তাঁর দ্বারাই প্রাণ-অপানের যুক্ত গতিরূপ যোগক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে,তাই তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়ে থাকে। প্রাণের ক্ষয়রহিত অবস্থা অর্থাৎ স্থির পরমাত্মারূপ অবস্থা তারই প্রতীক। কূটস্থ চৈতন্যরূপী শ্রীশ্রীগুরুদেবের দ্বারাই তাঁর এই সকল রূপ সম্পর্কে, বর্ণ সম্পর্কে, আকৃতি সম্পর্কে সাধকের নিকট প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে, তিনি ব্যতীত অপর কেউই ইহা সাধন করতে পারে না।

**পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।**
**বহূন্যদৃষ্ট পূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত।।৬**
**ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।**
**মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ**— কূটস্থের মধ্যে মনোনিবেশ করে প্রাণকর্ম করতে পারলে মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠান চক্রে প্রাণ এবং অপান বায়ুর যুক্ত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারা যায়। মূলাধার হল ক্ষিতিতত্ত্ব বা সহদেব, ও স্বাধিষ্ঠান হল জলতত্ত্ব বা নকুল। নাভি থেকে পদতল পর্যন্ত এই বায়ু যুক্ত অবস্থায় রয়েছে। অতএব প্রাণ-অপান বায়ুর এই যুক্ত অবস্থারূপই অশ্বিনীকুমার পদবাচ্য। ভগবান আত্মনারায়ণের বিশ্বরূপ দর্শনকালে তার যে শত সহস্র সহস্র রূপ রয়েছে তার মধ্যে এক একটি রূপ, যা শ্রীগুরু দ্বারা সাধক দেখতে বা জানতে সক্ষম হন। এই মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকে অশ্বিনীকুমার বলা হয় বলে নকূল ও সহদেব হলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

দেহক্ষেত্রে প্রাণই হল ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য। কূটস্থব্রহ্মে মনঃসংযোগ দ্বারা আত্মক্রিয়া করতে পারলে ঐখানেই নিরঞ্জনরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি অনুভূত হয়ে থাকে, তখন শ্রীগুরুদেবের দ্বারা তাঁর যে সকল রূপ দেখতে ইচ্ছা করবে আত্মজ্ঞানের প্রভাবে দেবতত্ত্ব পরিলক্ষিত হলে সেই সর্বজ্ঞতা স্বরূপ সমুদয় জগৎকে দেখতে ইচ্ছা করলেই কূটস্থব্রহ্মে তার প্রকাশ ঘটে থাকে।

**ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।**
**দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮**

**এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বর হরিঃ।**
**দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯**
**অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্।**
**অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** ভগবান আত্মনারায়ণরূপী সদগুরুর দ্বারা তৃতীয়চক্ষুরূপী আত্মচক্ষু প্রকাশিত হলে সাধক তার আপনরূপ সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে পারেন। গুরুদেব ব্যতিরেকে সেই চক্ষু অপর কেউ প্রদান করতে পাবেন না। গুরূপদেশ মত উত্তমরূপ প্রাণকর্মের দ্বারা বায়ুকে স্থির করতে পারলে দুভ্রূর মধ্যে অর্থাৎ কূটস্থে এক জ্যোতির সৃষ্টি হয়, যা দেখতে অনেকটা নির্বাত দীপের ন্যায়। এটাই সাধকগণের সূক্ষ্ম শরীর। এর দ্বারাই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ একস্থানে বসে অন্যস্থানে কি হচ্ছে তা জানা সম্ভবপর হয়। খেচরী সিদ্ধি অবস্থা প্রাপ্ত হলে তবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আত্মকর্মের দ্বারা আত্মস্থ হতে পারলে কর্মের অতীতাবস্থায় যার প্রকাশ, তিনিই হলেন সেই পরমাত্মা, মহা যোগেশ্বর। তিনি প্রকাশিত হলে সাধকের সকল পাপ তার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং সেই কূটস্থে মনোনিবেশের দ্বারা জগৎ সমুদয় বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সাধকের দেখা বা জানা সম্ভবপর হয়। তখন সাধক হয় পাপমুক্ত, পূণ্যবান। আর যার দ্বারা এই পাপ খণ্ডন করা সম্ভবপর হয়, তিনি হলেন 'হরি' পদবাচ্য। পরমগুরুদেব হলেন 'হরি' পদবাচ্য। কারণ তাঁর দ্বারাই সকল কাজ সম্ভব হয়। কূটস্থে স্থিতিলাভ করলে আত্মস্থ হয়ে সাধক তার নিজরূপ কূটস্থের মধ্যে বা দু ভ্রূর মধ্যে দেখতে পান। এছাড়া আকাশ, জ্যোতিঃচ্ছটা, নক্ষত্রাদি এই সকল কিছু কূটস্থের মধ্যে সাধক পরম গুরুদেবের দ্বারা দেখতে পেয়ে থাকেন।

**দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।**
**সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১**

**দিবিসূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।**
**যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মীরা দর্শন কার্য্য করবার সময় যে গোলক দেখতে পান তা এক দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতিঃবেষ্টিত হয়ে আছে, সেইজন্য তা দিব্যমাল্যধারী অর্থাৎ শ্বেতমালা পরিহিত, সেইহেতু ঠাকুর দেবতার গলায় মুক্তার মালা পরান হয়ে থাকে। তা অর্থাৎ ঐ জ্যোতি শূন্যময় আত্মার দিব্যবস্ত্র স্বরূপ, তাই তার বস্ত্র শ্বেতশুভ্র। সেহেতু ঠাকুর দেবতার গায়ে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করান হয়। সাধকের প্রাণ যখন আজ্ঞাচক্রে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, তখন সাধনকালে চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ীর মধ্যস্থিত বায়ুর ঘর্ষণের দ্বারা ঐ শূন্যতত্ত্বে এক অনির্বচনীয় সুগন্ধ সাধকের বোধে আসে। তাই হল তার দিব্যগন্ধ স্বরূপ। তাই ঠাকুর দেবতার পূজা অর্চনা কালে আমরা ধূপ ধূনা দিয়ে থাকি। উপরিউক্ত এই সকল অবস্থা গুণের অবস্থা। প্রাণকে আরও ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম নিরঞ্জনময় আকাশে স্থির করতে পারলে এই সকল গুণ তাতে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং তখন সাধক ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ আত্মকর্মরূপী ধ্যানের দ্বারা কূটস্থ মধ্যে আপন জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি পরিলক্ষিত করেন। এই কারণে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে সর্বত্র মুখবিশিষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

কূটস্থব্রহ্মই হচ্ছেন তাঁর বৃহৎ রূপ স্বরূপ, তাঁর তুলনা আর কিছুই হতে পারেনা। সহস্র সূর্যের জ্যোতি একত্র মিলিত করলে যে জ্যোতিঃপুঞ্জের সৃষ্টি হয় বা যে জ্যোতির ঝর্ণার সৃষ্টি হয়, তাই সেই মহান আত্মার জ্যোতিঃ।

**তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।**
**অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩**
**ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়।**
**প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪**

**পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে**
**সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।**

**ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ**
**মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্ব শ্লোকোক্ত আলোচনার মধ্যে যে জ্যোতির কথা বলা হয়েছে, তা সাধকের দ্বারা প্রতীয়মান হলে, সাধক তখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞানে জ্ঞানীরূপে পরিবর্তিত হন এবং দেহস্থিত ব্রহ্মমার্গে উপবেশন করে তাঁর সর্বব্যাপক রূপ পরিলক্ষিত করতে পারেন। সাধক ওঁকার রূপী যোগক্রিয়ার দ্বারা মস্তকে বায়ুকে ধারণ করলে এই সকল দৃশ্য দর্শন করতে সমর্থ হন, তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী সকল দেবতা, নাগ স্বরূপ সকল বায়ু নাভি পদ্মরূপী ব্রহ্মা, দিব্যজ্ঞানের অধিকারী সকল ঋষি সমুদয়কে এবং শরীর অভ্যন্তরস্থ সকল তত্ত্ব এই দেহরূপী আধারেই অবস্থান করছেন, তাঁর সম্পর্কে জানতে পারেন।

**অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং**
**পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।**
**নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং**
**পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬**
**কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ**
**তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।**
**পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্**
**দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** যে সকল সাধকের 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'রূপী জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপী তাঁরই প্রকাশ অনুভব করছেন। তাই সকল প্রাণীগণের নেত্র তাঁরই নেত্র, সকল প্রাণীগণের মুখ তাঁরই মুখ, সকল প্রাণীগণের দেহ তাঁরই দেহ, এই দর্শনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাই বিশ্বরূপ দর্শনের সময় তাঁর অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ এবং অসংখ্য দেহ অর্জুন দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যিনি মিশতে পেরেছেন তিনিই একমাত্র জেনেছেন তাঁর আদিও নেই, মধ্যও নেই, অন্তও নেই অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে সেখানেই

তাঁর প্রকাশ প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই যিনি তাঁর সঙ্গে মিশতে পারেন তিনি তাঁর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়ে তিনিময় হয়ে যান, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই বিশ্বেশ্বরেরই রূপ তা দেখতে পান। তাঁর সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই সকল ব্যক্তিও বিশ্বেশ্বর পদবাচ্য হন।

কূটস্থচৈতন্যই হল নারায়ণের রূপ। সোনালী জ্যোতির ছটা হল তাঁর মস্তকের উপর মুকুট স্বরূপ অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি মস্তকে বায়ুকে ধারণ করেছেন সেই সকল ব্যক্তির মস্তক কূটস্থচৈতন্যরূপী স্বর্ণজ্যোতির আচ্ছাদন রূপ মুকুট পরিহিত। তাই এই সকল ব্যক্তি কিরীটিবান ব্যক্তি পদবাচ্য। গদা হল সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ প্রাণের স্বরূপ। সকল দেহে তিনি এই প্রাণরূপে বিরাজমান, তাই তিনি গদাধর। তিনিই হলেন গোলাকার আগুনের মত বা সূর্যের মত তেজঃপুঞ্জরূপ দীপ্তিমান, তাই তিনি চক্রধারী। তাঁর রূপের কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাই তিনি সর্ব্বব্যাপক। আমাদের দেহস্থিত ষট্চক্রই হল তাঁর হস্তের পদ্ম স্বরূপ।

**ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং**
**ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মাগোপ্তা**
**সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮**
**অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-**
**মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।**
**পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং**
**স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯**

তাৎপর্য্যঃ— গুরূপদেশরূপ উপায়ের দ্বারা বা প্রাণকর্মের দ্বারা এই গুপ্ত রহস্য বা ধর্ম সম্পর্কে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয়। তাঁকে জানলেই জগৎ সংসারে আর কিছু জানার বাকী থাকে না। তাই তিনিই হলেন বিদ্যা বা সরস্বতী পদবাচ্য। সরস্বতীর হস্তের বীণাই হল আমাদের দেহের ত্রিতন্ত্রী। এই ত্রিতন্ত্রী সাধকের বশে এলে বা তাকে স্থির করতে পারলে সাধকের আত্মনারায়ণ

দর্শন হয়ে থাকে। তাই সরস্বতীর হস্তে বীণা রয়েছে। কারণ তাকে বা ইন্দ্রিয়সকলকে সাধক বশ করতে পেরেছেন।

আত্মনারায়ণের রূপ হল শ্বেত ও শুভ্র জ্যোতিঃস্বরূপ, তাই মা সরস্বতী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা।

আত্মজ্ঞান লাভ হবার পর সাধক সনাতন ধর্মরূপী এই যোগক্রিয়া সম্পর্কে সকল গুপ্ত তত্ত্ব জানতে পারেন, এবং সেই আত্মানন্দে বিভোর হয়ে তাঁর জ্যোতিঃ লক্ষ্য করেন এবং তার মধ্যে ডুবে গিয়ে বা লয় হয়ে গিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন অর্থাৎ সেই তেজোময় জ্যোতিঃ দর্শন করে থাকেন। এর পর সকল প্রাণীর মধ্যে তাঁর প্রকাশ পরিলক্ষিত করেন এবং অনন্তকাল ধরে তিনি এই প্রাণী সকলের মধ্যে অবস্থান করে বা তাদের বহন করে চলছেন, তাই তিনি অনন্ত বাহু পদবাচ্য।

ঈড়া পিঙ্গলারূপী সূর্য এবং চন্দ্র নাড়ী তাঁর দ্বারাই চালিত হচ্ছে, তাই সূর্য ও চন্দ্র তাঁর নেত্র স্বরূপ। নেত্র কথার অর্থ হল চালক, তাঁর সহিত মিলিত হতে পারলে বা যে সকল সাধক সাধনার দ্বারা তাঁকে জানতে পারেন তিনি তাতেই লয় প্রাপ্ত হন; তাই তিনি ভোক্ষ্যস্থলরূপী দৃপ্তাগ্নির মুখ স্বরূপ।

**দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি**
**ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।**
**দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং**
**লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০**
**অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি।**
**কোচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।**
**স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ**
**স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১**
**রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা**
**বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।**
**গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা**

**বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** মস্তকের উপরে বায়ুকে ধারণ করলে অর্থাৎ সহস্রারে বায়ু স্থির হলে সাধক তখন মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত রমণ করতে থাকেন এবং সুষুম্না পথের দ্বারা তিনি এই রমণ ক্রিয়া করে থাকেন। দিব্যজ্ঞান লাভ হবার পর তখন সর্ব্বময় আলোকমঞ্জরীর মধ্যে আপন আত্মাকে প্রবিষ্ট করার ফলে সকল কিছু আলোকময় হয়ে পড়ে। তখন ঐ সুষুম্না পথও তেজোরূপ আলোকে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। দেহের ঊর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব, পশ্চিম সকল কিছুই ঐ সেই আলোক কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং সাধক তখন অতীব অগ্নিময় জ্যোতিঃরূপ দৃশ্য দেখতে থাকেন, আত্মরূপী কূটস্থের মধ্যে যে মহৎ জ্যোতিঃ দর্শন করছেন তার মধ্যে দেখতে পান সকল গুণাদি বায়ু প্রবেশ করছে এবং স্থির হয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধ মহর্ষিগণ তাঁরই স্তবরূপী আরাধনায় মত্ত হয়ে অতীতাবস্থার এই শান্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, যক্ষ বায়ুরূপী বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ৪৯ বায়ু, সিদ্ধ মহাত্মাগণ সকলই আমি-হারার এই ব্যাকুলতায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরই মধ্যে স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে তাঁতে তন্ময় হয়ে আছেন।

**রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং**
**মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।**
**বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং**
**দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩**
**নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং**
**ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।**
**দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা**
**ধৃতিং ন বিন্দামিশমঞ্চ বিষ্ণো।।২৪**
**দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি**
**দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।**
**দিশো ন জানে লভে চ শর্ম্ম**
**প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** কূটস্থরূপে তিনি সকল প্রাণীর দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন। শ্বাস প্রশ্বাস সকলই তাঁর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সকল প্রাণীর দেহে তাঁর অবস্থানের জন্য তাঁর বহুবদন, বহুনেত্র, বহু বাহু, বহু ঊরু, বহু চরণ, বহু উদর, বহু দন্ত, বহু হস্ত, বহু পদ সকলই সাধকের দর্শনে আসছে এবং স্থিতি প্রাপ্তরূপ লোক সকল তাঁর এই রূপ অবলোকন করছেন।

সুষুম্নাস্থিত স্থিরপ্রাণই হল বিষ্ণু। তাঁর বর্ণ অন্তরীক্ষে ব্যাপকরূপে সমগ্র অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রয়েছে। তাঁর জ্যোতির্ময় তেজ তোমা কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। তাঁর অখণ্ড মণ্ডলাকার কৃষ্ণ গোলাকাররূপ তাঁর বিশাল নেত্র স্বরূপ। তাই তাঁকে দেখে অনেক সাধক ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর কর্ম করতে ধৈর্য্য ও শান্তি-হারা হন। সেই জ্যোতির ছটারূপ সমুদয় রূপরাশিতে অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত জ্যোতির মধ্যে সকল জগতের নিবাসস্থান ও মানবদেহ বা জীবদেহ হল সেই জগতের আধার স্বরূপ।

**অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ**
**সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।**
**ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ**
**সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬**
**বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি**
**দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।**
**কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু**
**সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭**
**যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ**
**সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।**
**তথা তবামী নরলোকবীরা**
**বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।২৮**
**যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা**
**বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।**
**তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-**

**স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯**

**লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা -**

**ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।**

**তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং**

**ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** দুর্মতিরূপ মন, সকল ইন্দ্রিয়াদি শূন্য হয়ে পঞ্চতত্ত্ব, জেদ, ভয় সকলই দেহান্তের পর তাঁরই অভিমুখে গমন করছে এবং তাঁতেই লয় পেয়ে আজ্ঞাচক্রস্থ মুখমণ্ডলের তীব্র জ্যোতির ছটায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যেমন সমগ্র নদীসকল উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়ছে, সেরূপ সকল প্রাণী তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়ে তাঁতেই গিয়ে পড়ছে। তেমন দেহ, মন, প্রাণ, দেহস্থিত ৪৯ বায়ু, পঞ্চতত্ত্ব সকলকিছুই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, অর্থাৎ অখণ্ড মণ্ডলরূপ নিরঞ্জন ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করছে।

পতঙ্গরূপী পিপীলিকাসকল যেমন অগ্নিশিখার মধ্যে পড়ে মৃত্যুকে বরণ করে, সেরূপ সকল প্রাণী মৃত্যুকে আহ্বান করে সেই মৃত্যুর জন্য তার অভিমুখে গমন করছে এবং সকল ইন্দ্রিয়াদি এবং রিপুসকল তাতেই লয় পাচ্ছে। ব্রহ্মময় এই উদরই হল তাঁর সমস্ত কিছু লয়ের স্থান অর্থাৎ উগ্র জ্যোতিঃ বিশিষ্ট তাঁর জ্বলন্ত বদন সম্পর্কে সাধক জ্ঞাত হলে সেই জ্বলন্ত মুখমণ্ডল নিয়ে তিনি সাধককে গ্রাস করেন এবং তখন সাধকের সকল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নাশ হয়ে তাঁর জ্যোতিঃপুঞ্জের দ্বারা দেহমধ্যস্থ সকল পাপ দগ্ধ হয়ে সেই সত্ত্বগুণময় জ্যোতিঃ বিশিষ্ট বিষ্ণুপদে লীন হয়ে সেইরূপ তেজ ধারণ করে জগৎ ব্যাপী বিস্তার লাভ করেন।

**আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো**

**নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।**

**বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং**

**ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১**

**কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো**

**লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।**
**ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে**
**যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২**
**তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব**
**জিত্বা শত্রূন্ ভূঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্**
**ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব**
**নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট পথে উপনীত হলে পরম শ্রীগুরুদেবের দ্বারাই কূটস্থ মধ্যে তাঁর রূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সাধক চঞ্চল মনকে শান্ত করে সেই তেজোময় জ্যোতিঃপুঞ্জে 'ওঁ'কাররূপী নমস্কারের দ্বারা আপন মনকে দগ্ধ করতে পারলে আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় এবং সাধক ব্রহ্মজ্ঞপদে অধিষ্ঠান করেন।

অজপা যা আবহমান কাল ধরে ২১৬০০ বার করে সকল জীবদেহের বহিঃপ্রাণায়াম রূপে অবস্থান করে দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণের বশবর্তী হয়ে নিজের আয়ুরূপী এই অজপাকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে চলছে, তাকে সেই অজপার গতিকে উল্টো পথে চালনা করে দেহস্থিত লোক সকলকে সংহার করে তাদের হতবল করতে পারলে তবেই আয়ু স্থির হবে। যখন আয়ু স্থির হবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়সকল আর প্রকাশিত হবে না, তারাও হতবল হয়ে অন্তে অবস্থান করবে, তখনই সাধকের প্রকৃত মৃত্যু হবে। তাই জীবিত অবস্থায় সাধক যদি আপন সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তা হলে সাধক না মরেও এই সকল ইন্দ্রিয় থেকে মুক্ত হয়ে আত্মানন্দে বিলীন হয়ে থাকতে সমর্থ হবেন। তাই ভগবান বলেছেন "যদি তুমি এইরূপে আমাকে ভজনা করে আমাতে সিদ্ধকাম হতে পার, তা হলে তুমি না মরলেও (দেহান্তর) তারা (ইন্দ্রিয়সকল রিপুগণ) কেউ থাকবে না।"

অতএব সাধন যুদ্ধে তুমি নিজেকে নিক্ষেপ কর, আপন মেরুদণ্ড খাড়া করে বস। শ্রীগুরুদেবের আদেশ উপদেশ মতন প্রাণক্রিয়া করে কূটস্থব্রহ্মে

স্থিতিলাভ কর এবং আপন দেহস্থিত সকল ইন্দ্রিয়গণাদিরূপ শত্রুদের পরাজিত করে অর্থাৎ স্ববশে রেখে সাধনরূপ আত্মরাজ্যে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।

**দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ**
**কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।**
**ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা**
**যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪**
**এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য**
**কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।**
**নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং**
**সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫**
**স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা**
**জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।**
**রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি**
**সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মপ্রকাশের দ্বারা যে সকল ব্যক্তি নিস্তেজ হয়ে থাকে অর্থাৎ স্থির হয়ে থাকে, সেই সকল ব্যক্তির জেদ, ভয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হয়। সাধন সমরে ঐ সকল শত্রু পরাজিত হয়ে সাধকের বশে এসে থাকে, তখন সাধকের সাধনায় তারা সম্যক প্রকারে জয়প্রাপ্ত হয়ে দিব্যদৃষ্টির প্রকাশ হয় এবং কূটস্থচৈতন্যকে দশদিকে ওঁকাররূপী ক্রিয়ার দ্বারা প্রণাম জানান সম্ভবপর হয়।

আত্মানন্দে বিভোর হয়ে সেই আনন্দ নিকেতনে স্থিতিলাভ করে তত্ত্বাদি ভাবে লয় হয়ে ভাবাতীত বা তত্ত্বাতীত অবস্থা লাভ করে সাধক তাঁর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনরূপী কীর্ত্তনে অর্থাৎ বিভোর হয়ে আত্মানন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তবুদ্ধির অবস্থাপ্রাপ্ত হন।

**কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্**
**গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।**

**অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস**
**ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ।।৩৭**
**ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-**
**স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম**
**ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮**
**বায়ুযমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক**
**প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।**
**নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ**
**পুনশ্চ ভুয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯**
**নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে**
**নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।**
**অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্তং**
**সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।।৪০**

**তাৎপর্য্যঃ—** তখন তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপী অনন্ত গুণাদি দেবগণের ঈশ্বর হয়ে সমগ্র জগতের উপর অবস্থান করেন এবং তার সঙ্গে সমগ্র জগৎ একই সূত্রে গাঁথা থাকে। তাই এই সকল সাধক জগন্নিবাস পদবাচ্য। তাই এই অবস্থায় তিনি আদি কর্ত্তারূপী ব্রহ্মা এবং স্থিরপ্রাণরূপী সৎ মহাপ্রাণ। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ব্রহ্মেও তাঁরই প্রকাশ, তাই সকল জগৎ সমুদয় তাঁকে প্রণাম করে থাকে। আমাদের দেহস্থিত ৪৯ বায়ু তাঁর থেকে সৃষ্ট। তিনি হলেন সেই অনাদি পুরুষ যেহেতু তাঁকে জানলে সাধকের আর জানার কিছু বাকি থাকেনা, সেহেতু পরব্রহ্মরূপী সেই জ্ঞাতা হলেন পরমধাম স্বরূপ। তাই তাঁকে যদি সাধক আপন মনের সকল কিছু প্রদান করেন তা হলে সেই সকল কিছু তার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়ে সাধনায় স্থির হয়ে সাধনায় উন্নীত হতে বা উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হন, তাই তিনিই হলেন স্বয়ং বিষ্ণুপদ স্বরূপ। গুরুরূপী এই কূটস্থচৈতন্য আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন তাই তাঁর দ্বারাই প্রাণ,

অপান ইত্যাদিরূপ বায়ুর গতায়াত সম্ভব হচ্ছে। 'ওঁ'কাররূপী ক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে বার বার নমস্কারের মাধ্যমে ক্রিয়া যতই করা হবে ততই আনন্দ বাড়তে থাকবে। তাই তাঁর নিকট একান্ত সমর্পণ অবশ্যই দরকার। সেই সমর্পণ তুমি করতে পারলে তিনি যমরূপে তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন করে তোমাকে আপনার সঙ্গে জড়িয়ে নেবেন।

তাই সকল সাধকের উচিত তাঁকে সকলকিছু সমর্পণ করে তাঁর সম্মুখে নমস্কার, তাঁর পশ্চাতে নমস্কার, তাঁর সকল কিছুতে নমস্কার, — নমস্কারে নমস্কারে সকল দিক আলোড়িত করে সেই অনন্তবীর্য্যরূপ অসীম পরাক্রমশালী জোতির্ময় বীর্য্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এর মাধ্যমে তোমার সম্মুখ দেশের বায়ু যা বয়ে চলছে তা পশ্চাৎ অভিমুখে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার আত্মানন্দের রস পান করা সম্ভব হবে।

**সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং**
**হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।**
**অজানতা মহিমানং তবেদং**
**ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।৪১**
**যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি**
**বিহারশয্যাসনভোজনেষু।**
**একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং**
**তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধারণ মানুষগণ আত্মধর্মে দীক্ষা নেবার পর চঞ্চল প্রাণের হেতু আপন গুরুকে চিনতে পারে না যে তিনি কে? তারা সেই পরম পুরুষকে নিজেদের মতন সাধারণ হাত পা ওয়ালা মানুষ ভেবে সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখে থাকে, তাই তাঁকে কখনও মনের মধ্যে উচ্চ সিংহাসনে বসাতে পারে না। চঞ্চল মনের বশবর্তী হয়ে তাঁর সকল আদেশ উপদেশকে সঠিক ভাবে পালন করতে পারেনা। তাঁর কথা না শুনে নিজে যা ভাল বোঝে তাই করে চলে। সম্মুখে তাঁর অবস্থান দেখেও তাঁকে অবজ্ঞা করে, অগ্রাহ্য করে নিজের

কামনাকৃত বস্তুর জন্য সেইদিকে ধাবিত হয়। কখনও কখনও মনোমধ্য থেকে ক্রোধ ও বিচলতার দরুণ তাঁকে তিরস্কার পর্যন্ত করে থাকে এবং কখনও কখনও তাঁর আচার আচরণ ও কর্মের সমালোচনা করে তাঁকে পরিহাসের পাত্র বানায়।

উপরিউক্ত এই সকল কার্য্য পশুভাবাপন্ন সাধারণ মানুষের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। যে সকল সাধকের তাঁর উপর বিশ্বাসভাব জন্মায় এবং একান্ত ভক্তি, শ্রদ্ধার দ্বারা আপন চেষ্টার মাধ্যমে তাঁর আদেশ উপদেশ পালন করা সম্ভবপর হয়, তার উপরেই তাঁর কৃপা অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয় এবং তাকে আপন হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন, তখন সেই সাধক তাঁকে জানতে ও বুঝতে পারায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কারণ তিনি পূর্বে তাঁকে এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে না চিনতে পেরে কত অনাচার, অবিচার ও তিরস্কার করেছে এবং বর্তমানে করছে। তিনি হলেন ক্ষমাশীল, তিনি রুষ্ট হলে সেই সাধারণ মানুষরূপী জীবেদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তিনি ক্ষমাশীল বলে এই হাত পা ওয়ালা জানোয়ারের দল এখন পর্যন্ত হাঁটতে চলতে পারছে এবং কামনা বাসনারূপী কর্ম ও মৈথুনাদিতে মত্ত হয়ে রয়েছে।

সাধক যখন তাঁকে চিনতে পারেন তখন তাঁর নিকট সর্বদা এই প্রার্থনাই করেন — হে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর গুরুদেব তুমি হলে ক্ষমাশীল, তোমাকে হাজার অপমান, হাজারও তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অপবাদ দিয়েছি। কখনও কখনও পরিহাসের পাত্র করেছি, তোমার সকল কর্মের ভুল খুঁজেছি। তুমি পরম জ্ঞানী, আমাদের মত জানোয়ারের অধম মানুষগণ তোমাকে কত কষ্টই না দিয়েছি। তবুও তুমি আমাদের তাড়িয়ে দাও নি। সর্বদা বুকে টেনে রেখেছো। তোমার কার্য্যের নানারূপ সমালোচনা করেছি, কারণ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সেই কথা "যদ্যপি গুরু আমার শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি গুরু আমার নিত্যানন্দ রায়।"

তাই তুমি আমাদের ক্ষমা কর, আমরা তোমার ক্ষমার অযোগ্য জেনেও আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তুমি ক্ষমাশীল, তুমি আমাদের সকলের পিতা। তাই হে গুরুদেব, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, কবির কথায় বলতে

পারি — "তব চরণ ধরিতে দিওগো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে"।

**পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য**
**ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।**
**ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো**
**লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩**
**তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং**
**প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।**
**পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ**
**প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।।৪৪**

**তাৎপর্য্যঃ**— ( হে প্রভাবশালী তুলনারহিত, তুমি হলে সকল পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, মনুষ্য সকলের পিতা। তুমি আমাদের মত স্বার্থপর মানুষদের পিতা, তাই তুমি আমাদের পরম পূজ্য। প্রাণের সম্যক রূপে স্থিতি বৃদ্ধি করিয়ে তবেই তোমার প্রকৃত পূজা করা যায়, কারণ তুমি হলে প্রাণের প্রাণ, মহান প্রাণরূপী মহাত্মা বা পরমাত্মা। তাই তোমার নিকট এলে তোমার স্নেহ ভরা হাসি, মন ভোলান কথা এবং স্বহস্তের কোমল পরশ পেয়ে আমরা চির আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত হই। তাই তুমিই আমার আপনার, তোমার মত আপনার ত্রিজগতে আমার আর কেউ নেই। তাই হে দেবাদিদেব, আমার এই দণ্ডবৎ প্রণাম তুমি স্বীকার কর। (দণ্ডবৎ অর্থাৎ শরীরকে 'ওঁ'কাররূপী যোগক্রিয়ার দ্বারা লাঠির ন্যায় সিধে করে, মন স্থির করে প্রণাম করা)। তুমি প্রসন্ন হও প্রভু। তুমি পিতা হয়ে সখা হয়ে সর্বদা আমাদের সকল অপরাধ সহ্য করে সকলকে বুকে আঁকড়িয়ে জড়িয়ে রেখেছো। তাই তুমি আমাদেরই নাথ। স্বয়ং পরম ব্রহ্মরূপী লোকনাথ)

**অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা**
**ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।**
**তদেব মে দর্শয় দেব রূপং**

**প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫**

**কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত -**

**মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব**

**তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন**

**সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।।৪৬**

**ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং**

**রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।**

**তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং**

**যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।।৪৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরম গুরুদেবের এইরূপ সাধনায় অবতীর্ণ সাধক সহস্রারে পৌঁছাবার পর দেখতে পান তার এইরূপ। এর পূর্বে কারও পক্ষে দেখা সম্ভবপর নয়। দেহত্যাগের পর জীব যখন সেই পরমাত্মায় বিলীন হন তখনই তিনি তাঁর এই রূপ দেখতে পান। সর্বদা চঞ্চল মনে যুক্ত হয়ে পশু ভাবাপন্ন হয়ে থাকবার জন্য মনুষ্যগণ তাঁকে দেখতে পায় না। তাঁর এ রূপ একমাত্র জীবিত অবস্থায় সাধনায় সিদ্ধিলাভকারী সাধকের দ্বারাই দেখা সম্ভবপর হয়ে থাকে। (তিনিই আমাদের দেহের মধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মরূপে অবস্থান করছেন। প্রাণায়াম রূপ স্থিরবায়ুই হল শঙ্খ। দেহস্থিত ছয় চক্রই হল পদ্ম, ঐ পদ্মের উপরে প্রাণায়ামের দ্বারা 'ওঁ'কাররূপী গদাঘাত করতে পারলে চক্ররূপী গোলাকার পরমব্রহ্ম সাধকের দৃষ্ট হয়ে থাকে এবং মন তন্মধ্যে লীন করতে পারলে মস্তকে বায়ু ধারণ করে তাতে স্থির হতে পারলে সেই চক্র দ্বারা সাধকের মুণ্ড কাটা যায় এবং সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তাঁকে জানতে বা চিনতে সক্ষম হন)

পরম গুরুদেব প্রসন্নচিত্ত হয়ে সাধককে তেজোময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে তাকে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত করিয়ে থাকেন। তাই আত্মার

সঙ্গে মিলিতরূপ জীব শিবরূপে পরিগণিত হন।

**ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈ র্ন দানৈ —**
**র্ন চ ক্রিয়াভি র্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।**
**এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে**
**দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮**
**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো**
**দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্‌।**
**ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং**
**তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯**

তাৎপর্য্যঃ— শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করা সম্পন্ন হলে অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রাণের কার্য্য নিষ্পাদিত হলে তখন সাধক পরব্রহ্মের রূপ দেখতে পান যা কোনরূপ যজ্ঞ, তপস্যা বা বেদমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সম্ভব হয় না। আত্মকর্ম করে কর্মের অতীতাবস্থায় মনকে স্থিতিলাভ করিয়ে যখন সাধকের শিবভাব প্রাপ্ত হয় তখনই তাঁর দ্বারাই বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়। আত্মকর্ম করতে করতে বিশ্বরূপ দর্শন হবার পূর্বে এক অসীম আতঙ্কের জগতে সাধক অবস্থান করেন তখন তাকে এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর নিকট আকর্ষণ করতে থাকে। সেইসময় অনেক সাধক ভয় পেয়ে যায় এবং পুনরায় তা চেষ্টা করা বা প্রাণকর্মরূপী কার্য্য করা বন্ধ করে দেয়। ভয় ত্যাগ করে যে সকল সাধক প্রীত মনে সেই আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গমন করেন, সেইসকল ব্যক্তির দ্বারাই তাঁর রূপ দেখা সম্ভবপর হয় এর পর ঐ সাধকের গতায়াত কূটস্থের মধ্যেই হয়ে থাকে।

**ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা**
**স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।**
**আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং**
**ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০**
**দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।**
**ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১**

**সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।**
**দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২**

**তাৎপর্য্যঃ—** দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হলে তবেই ভগবানের বা ঈশ্বরের মহান রূপ দেখা সম্ভবপর হয়। যে সকল সাধক তার ঐ রূপ দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন পরম গুরুদেব তাদের আশ্বাসিত করে প্রসন্ন মূর্ত্তিরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে থাকেম।

আত্মাই হচ্ছে জীবের জীবন স্বরূপ, তার অভাবে সকলই লয়প্রাপ্ত হয়। তাই তার দর্শনে জীব চৈতন্যপ্রাপ্ত ও শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে সেই চৈতন্য প্রাপ্তিরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান করেন এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এই সকল সাধকগণ সদাসর্বদা তার সেই সৌম্য বিশ্বরূপ দর্শনে অর্থাৎ কূটস্থব্রহ্মরূপ তাঁর সেই বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। তাঁর এই অবর্ণনীয়রূপ দেখলে দেবগণরূপ সাধকগণ তাঁর সেই রূপেতে মগ্নচিত্ত হয়ে থাকতে চায়।

**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।**
**শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।৫৩**
**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।**
**জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।৫৪**
**মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।**
**নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাকে দেখতে গেলে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখতে গেলে সাধারণ লৌকিক কর্মরূপ তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা- আরাধনা, দান প্রভৃতি করে দেখতে পাওয়া যায় না। আমার প্রতি বা শ্রীগুরুর প্রতি অনন্য ভক্তির দ্বারা 'ওঁ'কার রূপী ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মধ্যানের সাধনা করে সেই ধ্যানে যিনি মনকে প্রবিষ্ট করিয়ে তাতে মগ্ন থাকতে পারেন সেই সকল সাধকের দ্বারা আমাকে বা পরমগুরুদেবকে বিশ্বরূপী আত্মা হিসাবে তাঁর প্রকাশ দেখা ও জানা সম্ভব হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি আমার কর্মানুষ্ঠানকারী, যার কাছে আমি অর্থাৎ পরমগুরু, পরমপুরুষ হিসাবে পরিচিত এবং ইন্দ্রিয়রহিত অবস্থা যার প্রাপ্ত হয়েছে এবং যিনি সর্বভূতে সমদর্শী ভাব প্রকাশ করেন তিনিই ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হন : তাঁর দ্বারাই পরম গুরুদেবকে চেনা বা জানা সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ আপনাতে আপনি লয় প্রাপ্ত হয়ে, আপনার রূপ দেখতে সমর্থ হন।

।। ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগ সমাপ্ত ।।

—ঃ ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—

যোগীবর শ্রী শ্রী শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

# দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

## ভক্তি-যোগ

**এবং সততাযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।**
**যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১**
**ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।**
**শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরম গুরুদেব যে কার্য্য তোমায় প্রদান করেছেন, সেই কার্য্য একাগ্রচিত্তে করতে পারলে আজ্ঞাচক্রের তেজময় কূটস্থে তোমার মন নিবদ্ধ হবে, তখন আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে রূপাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা স্থিরব্রহ্মের উপাসনা করতে হয়। এইরূপ সদাসর্বদা একাগ্র মনে বিভোর হয়ে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধার দ্বারা এই উপাসনা করে, সেই সকল ব্যক্তি জ্যোতির্ময় আত্মাতে মন একাগ্র করে সর্বদা যুক্ত থাকেন, এই সকল ব্যক্তি যুক্ততম যোগী পদবাচ্য।

**যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।**
**সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩**
**সংনিয়মেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।**
**তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্মের দ্বারা যারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে পারেন, তারা স্থিরব্রহ্মরূপ কূটস্থের উপাসনা করে থাকেন। আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করবার ফলে সাধকের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে এবং পঞ্চতত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। এর পর আত্মধ্যানের দ্বারা ওঁকাররূপী স্থির প্রাণক্রিয়ার মাধ্যমে সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মার উপাসনা করে সাধক তাঁকেই প্রাপ্ত হন, পরমব্রহ্মস্বরূপ কূটস্থের উপাসনা ব্যতিরেকে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি

কূটস্থের মধ্যে নিজের মনকে স্থির না করে তদূর্দ্ধে স্থিত স্থিরবায়ুর ক্রিয়া বা পরমাত্মজ্যোতির্ময়-ক্রিয়া উপাসনা করেন, তাঁদের ক্লেশপ্রাপ্তি ঘটে থাকে।

**ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।**
**অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫**
**যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।**
**অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬**
**তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।**
**ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিতচেতসাম্।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণকর্মের দ্বারা সবার আগে কূটস্থচৈতন্যরূপী আজ্ঞাচক্রে মনকে স্থির করতে হয়। সেখানে মনকে স্থির করিয়ে তারপর পরব্রহ্মরূপী জ্যোতির্ময় আত্মার উপাসনা তার ঊর্দ্ধে করলে সাধক সেই অব্যক্ত স্থানে সহজেই স্থিতিলাভ করতে পারে। কূটস্থের ঊর্দ্ধে অব্যক্ত স্থানে যদি কেউ তাঁর মনকে স্থির করতে চায়, তা হলে সেই তদূর্দ্ধ ধাপে পদক্ষেপ ঠিক নয়। এর ফলে সেই অব্যক্ত স্থানে সাধকের স্থিতিলাভ করতে বিলম্ব হয়ে থাকে এবং সাধকগণ বহু ক্লেশ ও দুঃখ পেয়ে থাকে।

তাই পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবের আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে প্রাণকর্ম করলে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি হেতু পরমগুরুতেই মন নিবদ্ধ করে রাখলে সেই সকল আত্মপরায়ণগণের দ্বারা উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করা সম্ভবপর হয়। এই উত্তম প্রাণকর্ম হবার জন্য তিনি সদাসর্বদা আত্মচিন্তারূপ ধ্যানমগ্ন থাকেন। তখন পরম পরাৎপর গুরুদেব সাধকের এই আন্তরিক ভালবাসা লক্ষ্য করে তাঁকে কর্মের মধ্যাবস্থা হতে কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়ে প্রাণের আগম-নিগমরূপ যাতায়াত বন্ধ করে তাঁকে উদ্ধার করে দেন। তখন আর সাধককে সংসাররূপী মধ্যাবস্থার বেড়াজালে আটকে হাবু-ডুবু খেতে হয় না। সকল সংসারবন্ধন তাঁর ঘুচে যায়, তখন কোন বাধা তাঁর সম্মুখে আর দাঁড়াতে পারে না। তখনই সাধক শ্রীগুরুদেবের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীগুরুতেই লীন হয়ে যান।

**ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।**
**নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।৮**
**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম।**
**অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯**
**অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।**
**মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমগুরুদেবের চরণে আপন মনকে স্থির কর। তবেই আত্মবিষয়ক বুদ্ধির মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পারবে। তাঁর কথা, উপদেশ, আদেশ সকল কিছুই মেনে চল। তবেই সাধক, তুমি তাঁর দ্বারা কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে পারবে এবং তাঁর দ্বারাই কূটস্থের উর্দ্ধে মনের স্থিতি ঘটিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই সাধক, সদ্‌গুরুর উপদেশ মতন যোগক্রিয়ায় রত থাক। এই উত্তমরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তোমার চিত্ত স্থির রাখতে তুমি সমর্থ হবে এবং আমার অর্থাৎ সদ্‌গুরুর ব্যাপকতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

তাই গুরুদেবের আদেশ-উপদেশ মতন যোগাভ্যাস করে চল আর যারা এই গুরুপ্রদত্ত আত্মক্রিয়া পাও নি, তারা অজপারূপ যে প্রাণ শ্বাস-প্রশ্বাসে সদাসর্বদা চলছে, সেই প্রতিটি শ্বাসকে ঈশ্বররূপে পরিকল্পনা করে গণনাকর, যাতে একটি শ্বাসও তাঁর নাম-স্মরণ ব্যতিরেকে বা বিনা লক্ষ্যে না যায়।

যোগাভ্যাসের দ্বারা তুমি সদ্‌গুরুর বিশেষ আত্মপ্রসন্নতার মাধ্যমে মোক্ষ প্রাপ্ত হতে সমর্থ হবে। যে সকল ব্যক্তির সদ্‌গুরু লাভ হয়নি তাদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অজপা স্মরণের ক্রিয়া করা ভাল। কারণ এতে চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং চঞ্চলতার প্রাদুর্ভাব অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। মোক্ষপ্রাপ্ত হতে গেলে সদ্‌গুরুকরণ একান্ত দরকার।

**অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।**
**সর্ব্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১**

**শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।**
**ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** যে সকল ব্যক্তির সদ্‌গুরু লাভ হয় নি বা আত্মক্রিয়াপ্রাপ্ত হয় নি, সেই সকল ব্যক্তি একমাত্র উপরোক্ত রূপ শ্বাসের কার্য্য করতে পারে। নচেৎ তা করা কখনই উচিৎ নয়।

কর্মের ফল কামনা না করেই সংযতচিত্তে সকল কার্য্য করে চল। তা থেকেই অর্থাৎ এই ত্যাগ থেকেই মনোমধ্য হতে কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ ঘটে, তাঁকে স্মরণে রেখে কর্ম করতে পারলে সাধকের সম্যকরূপ জয় হয়ে থাকে।

আত্মাকে জানবার জন্য আত্মকর্মরূপ অভ্যাসের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ করাই হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সেই জ্ঞান অর্জন করে উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর ধ্যান অর্থাৎ সদা চিন্তাকরারূপ ধ্যান করতে থাকলে "আমি কিছু নই, আমার কিছু নহে", এইরূপ ভাবে কর্মফলরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইচ্ছারহিত অবস্থাপ্রাপ্ত হলে সাধকের দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় শীঘ্রই শান্তি লাভ হয়ে থাকে। এই শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে সাধক আপন-বোধ ভুলে গিয়ে আত্মানন্দের জ্যোতি দর্শন করে তাঁতে মগ্ন চিত্ত হয়ে যান।

**অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।**
**নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩**
**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।**
**ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** যে সকল সাধক আত্মকর্মরূপী এই সাধনার দ্বারা সম্যকরূপে জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, যাঁদের দেহে অবস্থান কালেই আপন দেহস্থিত অহং জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে, তাঁরা সকলে সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করেন এবং সর্বদা ক্ষমাশীল ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি পদবাচ্য। আত্মজ্ঞান লাভে তাঁরা সতত সহিষ্ণুভাব সম্পন্ন এবং ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে সদাই তৃপ্ত। সেই সকল সাধক কর্মের অতীতাবস্থারূপ যোগে যুক্ত এবং তাঁদের চিত্ত সর্বদা আত্মাতে

থাকায় তদ্‌বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য অর্থাৎ মনস্থির করে সর্বদাই আত্মাকেই লক্ষ্য করছেন এবং কর্মের অতীতাবস্থায় মনের লয় করতে বা মনকে অর্পণ করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই সকল ব্যক্তি আত্মায় তন্ময় থেকে আপনি আপনার রূপ দেখে তাতে মগ্নচিত্ত হয়ে রয়েছেন। সেই অবস্থায় তিনি প্রকৃত সুখ, আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন। তাই ঐ সকল ব্যক্তির কাছে আত্মারূপী পরব্রহ্মই যে শ্রীগুরু তা বিদিত হচ্ছে। তাই ঐ সকল ব্যক্তি সেই আনন্দেই সর্বদা মনকে প্রবেশ করিয়ে রাখতে ভালবাসেন। তাই ঐ অবস্থাই তাঁদের প্রিয়।

**যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।**
**হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫**
**অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।**
**সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬**
**যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।**
**শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** উপরোক্ত ঐ আনন্দে যিনি মত্ত থাকেন, তিনি তিনিময় হয়ে অর্থাৎ পরমাত্মভাবে ভাবাতীত অবস্থা ধারণ করে সদা আত্মানন্দে তুষ্ট থাকেন। এর ফলে তিনি সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত। বাহ্যিক আনন্দ ও দুঃখে তিনি বিচলিত হন না। পরের ঐশ্বর্য্যের প্রতিও তাঁর কোন কাতরতা নেই। তিনি হলেন সদাজাগ্রত অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধরূপ মোহ-নিদ্রাকে জয় করে তিনি অনলস। দুই ভ্রূ'র ঊর্দ্ধে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে আত্মধ্যানে মগ্ন হবার জন্য তাঁর ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই। আবার কোন সঙ্কল্পও নেই, বিকল্পও নেই। তিনি আত্মাতে দৃঢ় ভালবাসাযুক্তরূপে আত্মানন্দের ভক্ত, তাই তিনি উদাসীন। বাহ্য আনন্দ, বাহ্য দুঃখ তাঁর কিছুই করতে পারে না। 'কোন কিছুই কিছু নয়, কেবল আত্মাই সকল কিছুর মূল' এইভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা আকাঙ্ক্ষা শূন্য।

ঈশ্বর যা দেন তাতেই তাঁরা তুষ্ট, অর্থাৎ পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ, ভাল-মন্দ এই সকলকে তিনি জয় করেছেন। তাই তিনি ইচ্ছার অতীতাবস্থায় অবস্থান করছেন। আত্মার সহিত দৃঢ় ভালবাসার যুক্ত বন্ধনে তিনি বাঁধা আছেন বলে

তাই তাঁর প্রিয়। সেই আনন্দেই তিনি মগ্ন থেকে সকল কার্য্য করছেন। কামনা-বাসনারূপী মন তাঁর বশে থাকার জন্য তাঁর সকল কর্ম আত্মানন্দে অবস্থান করেই হচ্ছে বা অনিচ্ছার ইচ্ছায় হচ্ছে। সেহেতু কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। তাই সকল কর্ম করেও তিনি তাদের সঙ্গে যুক্ত না হবার জন্য কোনরূপ কর্মফল সৃষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর দেহের মধ্যস্থিত যে কর্মফল পূর্বে বা পূর্বজন্মে সৃষ্টি হয়েছিল, সে সকল প্রারব্ধ কর্মফল খণ্ডন করবার জন্য তাঁকে কর্ম করতে হচ্ছে এবং মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবার পরও সেই প্রারব্ধ হেতু দেহ ভোগসকল গ্রহণ করতে হচ্ছে। যেমন নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

এক গভীর রাতে রামদাস কাঠিয়া বাবার এক শিষ্য হঠাৎ দেখতে পান তাঁর আপন গুরুদেব আশ্রমের সকল গরু ছাগলকে মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সকল গরু-ছাগলকে চরিয়ে পুনরায় গোয়ালের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আশ্রমস্থিত আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। শিষ্য এই সকল অবলোকন করে গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তার মত অনেক শিষ্যই এই আশ্রমে অবস্থান করছেন। তাদের দ্বারা তিনি তো এই কার্য্য করাতে পারতেন এবং প্রতি সকালে ঐ সকল প্রাণীগণকে মাঠে তো চরতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাহলে তিনি পুনরায় এই কার্য্য করছেন কেন? তাও আবার গভীর রাতে কেন?

এর উত্তরে রামদাস কাঠিয়াবাবা বলেছিলেন — "এই কার্য্যের মাধ্যমে আমি আমার দেহস্থিত প্রারব্ধ কর্মফল খণ্ডন করছি, তাই এই কার্য্য আমাকেই করতে হবে। অন্য সময় করলে আশ্রমের সকল শিষ্যগণ আমায় বাধা প্রদান করবে। সেইহেতু আমি সকল শিষ্যগণ নিদ্রিত হবার পর এই কার্য্য করে থাকি। তাই এই গভীর রাত বেছে নিয়েছি।"

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।**
**শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।১৮**
**তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।**
**অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯**

**'যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।**
**শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।।২০**

## ইতি ভক্তি যোগঃ।

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মজ্ঞ হবার পর সাধকের শত্রু, মিত্র, মান-অপমান ইত্যাদি বোধ জন্মায় না অর্থাৎ সম্মানপ্রাপ্ত হলে মনে আনন্দ, অপমান বা তিরস্কারপ্রাপ্ত হলে মনে রোষ বা ক্রোধ জন্মায় না। তিনি সুখ-দুঃখ সকল কিছু ভাবনার অতীত। সকল কিছুকেই তিনি সমজ্ঞান করেন। যখন তিনি আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন, তখন কথা বলতে বা কোনরূপ কার্য্য করতে ইচ্ছা হয় না। তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারত্যাগী, নিজ গৃহে থেকেও তিনি গৃহে আসক্তিহীন। যিনি আপন গৃহ, দেহের ঊর্দ্ধে আত্মনারায়ণের সঙ্গে বেঁধেছেন, সেই গৃহই তাঁর প্রিয়।

যারা বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও একান্তভক্তির দ্বারা অমৃতরূপ এই আত্মধর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন — সেই সকল ব্যক্তি আত্মপরায়ণ হয়ে পরমগুরুদেবের সঙ্গে একাত্ম হতে সমর্থ হন এবং পরমাত্মায় স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে পরমানন্দে মগ্ন হয়ে থাকেন। এই সকল ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি পরমগুরুদেবের অতীব প্রিয়।

তাই সাধক প্রাণকর্মে উপনীত হয়ে পরমগুরুদেবের আদেশ উপদেশ মেনে চল। তাঁকে বিশ্বাস কর। তিনি ব্যতিরেকে জগতের কেউ কখনও কোনদিন তোমায় আত্মানন্দের আনন্দ প্রদান করতে পারবে না। তিনিই হলেন তোমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধব এবং আপনজন। তাই তাঁকে অন্তর নিংড়ানো ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে দৃঢ় বন্ধনে তাঁর সঙ্গে আপনাকে বাঁধ। তবেই তুমি তাঁর দ্বারা এই অমৃত তত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হবে।

**।। ইতি ভক্তি-যোগ সমাপ্ত।।**

**—ঃ ইতি দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

## ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।**
**এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।।১**
**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**
**এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।।২**
**ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।**
**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম।।৩**
**তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদবিকারি যতশ্চ যৎ।**
**স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।।৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধক গুরূপদিষ্ট এই প্রাণ কর্ম করতে গেলে পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের আদেশ উপদেশ শুনে বিশেষ প্রকারে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে এই প্রাণকর্মে অবতীর্ণ হতে হয়।(ধর্মের পথ বা মুক্তির পথ হল এই প্রাণকর্ম। আপন দেহের মধ্যে যে অনন্ত ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে আছে তার সন্ধান করাই হল প্রকৃত প্রাণকর্মরূপী সাধনা করা, কারণ সকল দেহের মধ্যে দেহীরূপী আত্মা প্রাণরূপে বিরাজ করছে। তিনিই হলেন অন্তর্য্যামী পুরুষরূপী পরমগুরুদেব। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই দেহ ঘটের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই সকল প্রাণ কর্মীদের এই দেহই হল ক্ষেত্র। ওঁকার রূপী হলের দ্বারা প্রাণায়ামরূপী কর্ষণ কার্য্যের মাধ্যমে এই দেহকে কর্ষণ করলে যে জ্ঞান বা ফসল উৎপন্ন হয় তাই হল পরমাত্মতত্ত্ব। যিনি এই কর্ম করে অর্থাৎ দেহরূপী ক্ষেত্রকে প্রাণকর্মের দ্বারা কর্ষণ করে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন; সেই সকল ব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য)

তখন ঐ সকল ব্যক্তির হৃদয় ভেদ হয়ে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করে এবং তদ্‌উর্দ্ধে ব্রহ্মযোনির মধ্য দিয়ে প্রাণ প্রবেশ করিয়ে সহস্রারে আপন প্রাণকে

লয় প্রাপ্ত করিয়ে' তিনি অন্তর্যামী পুরুষরূপে পরিচিত হন।

এই আত্মজ্ঞান লাভই হল ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তির মুক্তির পথ। ইন্দ্রিয়াদির সকল আসক্তি এবং বিকার সমূহ এই ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রাণকর্মের দ্বারা এই সকল দেহস্থিত বিকার এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাধক যদি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, তখনই তার পক্ষে ঐ সকল বিকার ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে আনা সম্ভবপর হয়।

**ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্।**
**ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৫**
**মহাভূতান্যহঙ্কার বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।**
**ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৬**
**ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।**
**এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** সাধকগণ, মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্না মার্গের অন্তর্গত যে স্থির বায়ু রয়েছে তাই হল ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মসূত্র। এই বায়ুকে স্থির করতে পারলে স্থির বায়ুরূপ সেই ব্রহ্ম পদের সঙ্গে সাধকের সাক্ষাৎ সম্ভব হয় অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে মিলে সাধক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। এই জ্ঞান লাভ করলে সকল বেদ সমূহ সম্পর্কে সাধক বিদিত হতে পারেন এবং তাঁর মুখ থেকে তখন যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয় সেই সকল বাক্য পরব্রহ্মরূপী বেদ পদবাচ্য।

সাধারণ মানুষ সর্বদা কামনা-বাসনারূপী ইচ্ছার দাস হয়ে চলে, তাই তাদের আত্মজ্ঞান তত্ত্ব লাভ হয় না। সেইহেতু তাদের বারংবার দেহ ধারণ করে জন্ম-মৃত্যুরূপী এই বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকতে হয়।

আমাদের দেহস্থিত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম হল পঞ্চতত্ত্ব। মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহংকার হল প্রকৃতি, এই সকল আটগুণ একসাথে মিলিত হয়ে অষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি করেছে।

আমাদের দেহস্থিত দশ ইন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,

মুখ, হাত, পা, পায়ু, লিঙ্গ। পঞ্চগুণ হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং এক মন।

উপরিউক্ত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা মনের মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীরস্থ কাম, ধৈর্য্য, চেতনা ইত্যাদি বিকার যুক্ত অবস্থা চঞ্চল বা সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রকাশ লাভ করে। চঞ্চল প্রাণ উপরিউক্ত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ। এই সকল তত্ত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রাণকর্মের দ্বারা যদি সাধক আত্মানন্দে মিলতে পারেন তা হলে উপরিউক্ত ঐ সকল তত্ত্ব তার বশে আসে।

**অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।**
**আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৮**
**ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।**
**জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্।।৯**
**অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।**
**নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।১০**
**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।**
**বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।১১**
**অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।**
**এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** "গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম পরমগুরুদেবের আদেশ, উপদেশ মেনে করতে হয়। যে সকল সাধক এইরূপে পরম গুরুদেবের সকল আদেশ উপদেশ মেনে আত্মসেবারূপ প্রাণকর্ম করে পরব্রহ্মে স্থির হয়েছেন তাঁদের দ্বারা প্রকৃত গুরুসেবা করা হয়ে থাকে। আত্মাতে স্থির হলে সাধকের ভেতর বাইরে এক সরলভাব অনুভূত হয়। সতত তিনি ব্রহ্মে থেকে সকল কার্য করে থাকেন। এই ব্রহ্মে থাকার জন্য মনের মধ্যে অর্থাৎ তার ভেতরে ও বাইরে এক পবিত্র ভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন সাধক মনঃ সংযোগের দ্বারা অর্থাৎ মনের চঞ্চল অবস্থা রহিত হয়ে বীতরাগরূপ আসক্তি শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ইত্যাদি এই সকল বিষয়ে মনের মধ্যে কোনরূপ ভাবের উদয় হয়

না অর্থাৎ দুঃখরূপী কোনরূপ ভাবের প্রকাশ ঘটে না। অনন্য মনে সর্বদা আত্মধ্যানে আমি-হারা রূপে আত্মানন্দে বিভোর থেকে এক বিশেষ ভক্তিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং সদাসর্বদা আদিত্য হৃদয়ে অর্থাৎ অহং রহিত হয়ে আত্মনারায়ণের ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি স্থিররূপ নির্জন স্থানে অবস্থান করেন। ঐ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে যে মোক্ষ তার প্রাপ্ত হয় বা দর্শন হয় তাই প্রকৃত জ্ঞান আর তা যার হয় না সেই সকল বিদ্যা অজ্ঞান পদবাচ্য, অর্থাৎ আত্মানন্দে বিভোর থেকে তাঁকে তত্ত্বতঃ জানতে পারলে তবেই সাধকের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়।

**জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাংমৃতমশ্নুতে।**
**অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।।১৩**
**সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।**
**সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৪**
**সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।**
**অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ।।১৫**
**বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।**
**সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** উপরিউক্ত শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁকে তত্ত্বতঃ জানলে তবেই সাধকের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃতরূপে ঐ জ্ঞান লাভ করলে সাধক 'খ'য়ে বিরাজ করেন বা শূন্যে বিরাজ করেন।

শূন্য যেহেতু কোনগুণের সঙ্গে মিশতে পারে না, সেই শূন্যের সঙ্গে সকল সংখ্যক গুণ মিশে শূন্যেই রূপান্তরিত হয়, সেইহেতু তিনি কারও সঙ্গে যুক্ত নন অর্থাৎ কোনরূপ গুণাদিবিশিষ্ট পদার্থের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। পরব্রহ্মরূপী সেই শূন্যের সঙ্গে মিশে তিনি শূন্যই হয়ে গিয়েছেন, তাই তিনি ইন্দ্রিয়রহিত এবং সকল গুণরহিত। সকল গুণরহিত বলেই তিনি ত্রিগুণের অতীত স্থান ব্রহ্মলোকে অবস্থান করছেন।

তিনি জীব দেহের বাইরে চঞ্চল প্রাণ এবং ভেতরে স্থির প্রাণরূপে অবস্থান করছেন অর্থাৎ বাইরে চঞ্চল প্রাণ শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে এবং ভেতরে

স্থিরপ্রাণরূপী আত্মনারায়ণরূপে রয়েছেন। স্থাবর ও জঙ্গমরূপী প্রাণের মধ্যেও তাঁর প্রকাশ। ব্রহ্মের সকল অণু-পরমাণুতেই তিনি তখন মিশে আছেন এবং আত্মপরায়ণ বলে সর্ব ব্যাপক ব্রহ্মরূপে সর্বস্থানে সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করছেন।

**অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।**
**ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৭**
**জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।**
**জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমপুরুষরূপী এই আত্মনারায়ণ একমাত্র প্রাণরূপে সর্বজীবে অবস্থান করছেন অর্থাৎ তিনি অভিন্নরূপে সকল জীবের মধ্যে স্থিররূপে রয়েছেন। চঞ্চলরূপেও তাঁর অবস্থানের জন্য দেহস্থিত ভূতসকলের পালন বা পোষণ সম্ভবপর হচ্ছে।

তাঁর জ্যোতিই হল সূর্য্যসম, তাঁর প্রকাশে সকল কিছুই প্রকাশিত। সাধন, ভজন করে তাঁকে জানতে পারলে এবং তাঁর মধ্যে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারলে তিনি যে সকল জীবের পালনকর্ত্তা — সেই সম্পর্কে সাধক জানতে পারে। এছাড়া সাধকের মৃত্যুর সময় বা প্রলয়কালে প্রাণ যখন দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখন সেই প্রাণ তাঁর মুখগহ্বর স্বরূপ কূটস্থগহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই স্থানে যুক্ত হয়ে থাকে। তাই তিনি মৃত্যুকালে সংহারক অর্থাৎ তিনি পালক ও সংহারককর্তা।

আত্মজ্যোতিরূপ জ্ঞান যা একমাত্র জানবার বস্তু, তা সাধনদ্বারা লাভ হলে তাঁকে পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনি পরমগুরুদেবের সঙ্গে প্রাণসূত্ররূপ সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে তিনিও তিনিময় হয়ে যান।

**ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।**
**মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৯**

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।**
**বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মতত্ত্ব জেনে যিনি বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করেছেন, তিনিই প্রকৃত আত্মভক্ত এবং তাঁর দ্বারা ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় ইত্যাদি সম্পর্কে সকলকিছু জানা সম্ভব হয়ে থাকে। যে সকল সাধক এই সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাঁদের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্তি সম্ভব হয়ে থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের বিকার এবং সত্ত্বরজস্তম এই তিনগুণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি আটকে থাকে, সেই সকল ব্যক্তি প্রকৃতিজাত। এই প্রকৃতি ও পুরুষ দুই-ই এক অর্থাৎ আত্মা যখন গুণাতীত স্থানে থাকেন অর্থাৎ যখন দু'ভ্রূর ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন, তখন তিনি হন পুরুষ পদবাচ্য এবং যখন আত্মা দুই ভ্রূ'র নিম্নে গুণসকলের স্থানে এসে পড়েন তখন তিনি হন প্রকৃতি। এই উভয় বস্তুরই কোন আগাও নেই, গোড়াও নেই অর্থাৎ জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। তাই উভয়ই অনাদি।

আত্মা নিম্নে অবতরণ করে চঞ্চল প্রকৃতিরূপে পরিগণিত হয়ে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ তিনগুণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করে বিকার উৎপন্ন করে থাকে এবং প্রাণকর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে দেহের ঊর্দ্ধস্থানে অবস্থান করাতে পারলে ইন্দ্রিয়াতীত এবং গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে সাধক বিকারশূন্য হয়ে জন্মরহিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

**কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।**
**পুরুষ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২১**
**পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।**
**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মা দুই ভ্রূ'র নিম্নে এসে চঞ্চলপ্রাণরূপে অবস্থান করলে অষ্টধারূপে প্রকাশ পেয়ে অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অষ্টধারূপে প্রকাশিত হন। তখন ঐ স্থানে সকল কার্য্য ব্যক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যা চঞ্চলপ্রাণরূপী মনের দ্বারা

বোঝা সম্ভবপর হয়ে থাকে। সেই হেতু কারণ এবং কার্য্যের বিষয়সকলই এই প্রকৃতি থেকে নির্বাহ হচ্ছে।

দুই ভ্রূ'র উর্দ্ধে প্রকৃতি যেখানে লয়প্রাপ্ত হয়ে স্থির ব্রহ্মভাবরূপ কর্মের অতীতাবস্থা সৃষ্টি করেছেন, তা হল অব্যক্ত। সেই অবস্থায় প্রকৃতিরূপী আত্মা লয়প্রাপ্ত হয়ে পুরুষরূপে পরিণত হচ্ছেন। দুই ভ্রূ'র নিম্নে এসে যেহেতু জীবাত্মারূপে প্রকৃতি সৃষ্ট হন, সেহেতু জীব সুখ-দুঃখরূপী ভোগাদিতে আসক্তি-পূর্বক নিযুক্ত হয়ে প্রকৃতিজাত সকল গুণ ভোগ করে থাকে। তাই জীবাত্মারূপী পুরুষ বা প্রকৃতির অন্তর্গত সাধারণ মানুষ তিনগুণের সংসর্গে এসে মনের গণ্ডীতে জড়াতে থাকেন এবং বারম্বার জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভ্রূ'র উর্দ্ধে জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় রূপান্তরিত হন, তখন আসক্তি রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্য গুণাদি ভোগসকলের মধ্যে আর আত্মা আবদ্ধ হয়ে থাকে না। ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে, গুণের অতীতাবস্থা লাভ করে জন্মরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

**উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।**
**পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২৩**
**য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।**
**সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমাত্মারূপী পরমপুরুষ জীবাত্মারূপে প্রকৃতিস্থ হয়ে সুখ-দুঃখ এই সকল বিষয়ভোগ করে থাকেন। আত্মা জীবদশায় এই বিষয় ভোগকারী হলেও তাঁর একটি পরমাত্মরূপ আছে। সেইরূপে তিনি বিষয়াদির সঙ্গে যুক্ত নন। দেহস্থিত কামনা-বাসনা তাঁকে কোনরূপ আঘাত করতে পারে না। তিনি দেহের মস্তকের উপর অবস্থান করে প্রকৃতিরূপী জীবাত্মার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি নীরবে সকল কিছুই দেখছেন। এই জীবাত্মা পরমাত্মা থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর হুকুমেই সমস্ত জগৎ চালিত হয়ে থাকে। তিনি জগতের স্বামীরূপে এই দেহের মধ্যে অবস্থান করে ভোগের কর্ত্তারূপে জীবের ভরণপোষণ করছেন। এর ফলে জঠরাগ্নিরূপে তিনি নাভিতে থেকে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি এই সকল চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করাচ্ছেন। প্রাণরূপী সেই পরমাত্মাই

হল ঈশ্বরের অতীত অর্থাৎ মহেশ্বর।

তাঁর দ্বারাই ত্রিগুণের সকল রহস্য সম্পর্কে সাধক জেনে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ অবস্থায় গেলে বুঝতে পারা যায় অর্থাৎ পরমপুরুষকে জানলে বুঝতে পারা যায় যে সেই পরমপুরুষরূপী আত্মাই হচ্ছেন আমাদের সকল কিছুর সাক্ষীস্বরূপ ভরণ-পোষণের কর্ত্তা, ভোগেরও কর্ত্তা এবং অন্তর্য্যামিত্ব শক্তির উৎস।

উপরোক্ত এই সকল বিষয় যে সকল সাধকের জানা সম্ভবপর হয়, তাঁদের আর সদসদ্রূপ যোনীতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জন্মরহিত অবস্থারূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

**ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।**<br>
**অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।২৫**<br>
**অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।**<br>
**তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৬**<br>
**যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।**<br>
**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** যে সকল সাধকের দ্বারা আত্মক্রিয়ারূপী কূটস্থের ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হয়ে থাকে, সেই সকল ব্যক্তিগণের আত্মনারায়ণ দর্শন হয়ে থাকে। যে সকল ব্যক্তিগণ বা সাধকগণ প্রতি শ্বাসে-শ্বাসে অজপারূপ সংখ্যাকে স্মরণ করে আত্মস্থ হতে পারেন, তাঁদের দ্বারা আত্মনারায়ণের দর্শন করা সম্ভবপর হয়। ঈড়া-পিঙ্গলার গতিরূপ প্রাণকর্ম যা চলছে, সেই গতিরূপ প্রাণের বহির্মুখী গতিকে উল্টে অন্তর্মুখী করে যদি ঈড়া-পিঙ্গলার মিলনরূপ কার্য্য করা সম্ভব হয়, তা হলে সেই সকল সাধকের দ্বারা আত্মদর্শন হয়ে থাকে। পরমগুরুদেবের নিকট উপদেশ শুনে সেই আত্মকর্মের উপদেশের দ্বারা ধ্যানযোগরূপী প্রাণকর্ম যে সকল সাধকগণ করে থাকেন, তাঁদের দ্বারা সাধনকালে দর্শন-শ্রবণ এই সকল অবস্থা রোধ হয়ে 'আমি-হারা' ভাবরূপ

অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন এই সকল সাধক প্রাণরূপী গুরুদেবের আদেশানুসারে কর্ম করবার ফলে ঐ তন্ময় ভাবের মধ্যে প্রণবধ্বনি শুনতে থাকেন এবং তা শুনতে শুনতে স্থিরচিত্ত হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

স্থির ব্রহ্ম থেকেই স্থাবর জঙ্গমাদি উৎপন্ন হয়। সাধারণ মানুষ প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্য অহংজ্ঞানে স্থাবর-জঙ্গমাদি জগতে পৃথক অস্তিত্ব পরিলক্ষিত করেন। সাধকের যখন 'এক ব্রহ্ম-দ্বিতীয় নাস্তি' এই জ্ঞান প্রকাশ লাভ করে, তখন তিনি তাঁর রূপসকল সম্পর্কে এবং বিভূতিসকল সম্পর্কে জানতে পারেন।

**সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।**
**বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৮**
**সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।**
**ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং।।২৯**
**প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।**
**যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।।৩০**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে শূন্যধাতুরূপে অবস্থান করছেন। এই কারণে তিনি সর্বজীবে সমানভাবে রয়েছেন। জীবের বিনাশ হলেও সেইহেতু তাঁর বিনাশ হয় না। যিনি এইরূপ দেখে থাকেন, তিনিই সঠিক দেখে থাকেন। প্রাণের স্থিতিপ্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ আত্মক্রিয়ার দ্বারা প্রাণকে ঊর্দ্ধে স্থির করে যিনি স্থিতিপ্রাপ্ত হতে পেরেছেন, সেই সকল ব্যক্তিকে আর অধোদিকে পতিত হতে হয় না। প্রাণের চঞ্চলতা রহিত হয়ে ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ করে তিনি শ্রেষ্ঠগতি বা মুক্তি লাভ করেন।

প্রাণ সত্ত্বগুণে থাকলে সৎ, তমোগুণে থাকলে অসৎ, রজোগুণে থাকলে ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম করে থাকে। পঞ্চতত্ত্বের স্থানে এবং তিনগুণের স্থানে উপরোক্ত এই সকল কর্ম হয়ে থাকে। সাধক তত্ত্বাতীত এবং গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাঁকে এইরূপ কোন বন্ধনে আবদ্ধ হতে আর হয় না। সেইজন্য

তিনি অনাসক্তরূপ অকর্ত্তা। এই সকল দৃশ্য যে সকল ব্যক্তির দ্বারা দেখা সম্ভবপর হয়, সেই সকল ব্যক্তি সঠিক দেখে থাকেন।

**যথা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।**
**তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩১**
**অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।**
**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩২**

**তাৎপর্য্যঃ—** সকল জীবদেহই এক ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে গেঁথে রয়েছেন। ব্রহ্মে যাঁর স্থিতিলাভ হয়েছে, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান এবং সেই অবস্থায় তিনি অব্যক্ত ব্রহ্ম থেকে ভূতসকলের বিস্তার দর্শন করেন।

তিনি গুণের অতীত বলে নির্গুণ; এক ছাড়া অপর কিছু না থাকার জন্য তিনি অনাদি। কর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে তিনি অবস্থান করেন বলে দেহের মধ্যে অবস্থান করেও তিনি সকল কার্য্য নির্লিপ্ত ভাবে করে থাকেন। পদ্মপাতায় জল থাকলেও জল ও পদ্ম পাতা যেমন একের সঙ্গে অপরে যুক্ত হয় না, সেরূপ দেহে অবস্থান করেও দেহস্থিত ইন্দ্রিয় সকলের সঙ্গে তিনি লিপ্ত হন না।

**যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।**
**সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩৩**
**যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।**
**ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৪**
**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।**
**ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৫**

**ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ।।**

**তাৎপর্য্যঃ—** হে সাধক, গুরূপদিষ্ট এই প্রাণকর্ম করে কূটস্থ মধ্যস্থিত দুই ভ্রূ'র মধ্যে মন নিবদ্ধ করে শ্রীগুরু কর্ত্তৃক শরীরস্থ সকল ক্ষেত্রের সকল

বস্তুসমুদয় প্রকাশিত হয়ে শ্রীগুরুর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হতে পারেন, তখন তাঁর প্রাণের অন্তরস্থিত সকল তত্ত্ব সমূহ শ্রীগুরুদেবের পদতলে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁর দেহ শবদেহে পরিণত হয় অর্থাৎ পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করবার জন্য বায়ু তখন সাধকের মস্তকে অবস্থান করে। সেই অবস্থায় মস্তকের নিম্নে দেহের সকল অংশ শবে পরিণত হয়। তাকেই শবসাধনা বলা হয়। তখন সাধক ভাল-মন্দের মধ্যে অবস্থান করেও সেই সকল গুণদ্বারা লিপ্ত হন না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গুরূপদিষ্ট পথে প্রাণকর্মের দ্বারা শরীররূপী ক্ষেত্রকে ওঁ-কার রূপী স্মরণের দ্বারা কর্ষণ করতে পারলে শ্রীগুরু কর্ত্তৃক সাধক পঞ্চতত্ত্বের অতীতস্থানে মনের লয় করিয়ে আরও ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হয়ে কূটস্থের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মে মিলে পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

এরপর সাধক ক্রিয়ার পরাবস্থায় আপনাতে আপনি থেকে সকল কর্ম করেন। কিন্তু আসক্তিশূন্য বা ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্য বা মন না থাকার জন্য সকল কর্ম করেও তিনি কর্মের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় থাকেন না।

**।। ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

## গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

**পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।**
**যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১**
**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।**
**সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।।২**

**তাৎপর্য্যঃ—** সকল উত্তম জ্ঞানই দেহস্থিত কূটস্থগহ্বরের মধ্যে রয়েছে। উত্তম জ্ঞানই হল পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান। গুরূপদিষ্ট আত্মকর্ম্মের দ্বারা যে সকল সাধক পরমাত্মায় নিঃশেষরূপে স্থিত হয়ে উপরোক্ত জ্ঞানসকল লাভ করেন, সেই সকল সাধকগণ দেহবন্ধন ছিন্ন করে অমৃতলোকে অবস্থান করেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা সকলকিছু বস্তু জানার ফলে এবং মনকে আপন বশে রাখবার ফলে দেহের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বিষয়াদিতে কোনরকম আবদ্ধ হতে হয় না। দেহের ভেতরে পরম তত্ত্বের সঙ্গে মিশে 'তাঁকে বিদিত হওয়ারূপ বিজ্ঞান' সাধক প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তাঁর দ্বারা মোক্ষরূপ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

সেই 'পরম আমির' স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ার ফলে অর্থাৎ পরমাত্মায় নিঃশেষরূপে স্থিতিলাভ করে তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মন স্থিরব্রহ্মে অবস্থানের জন্য মনের মধ্যে কোনরূপ বিষয়ের সৃষ্টি হতে পারে না। এই কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মন অবস্থান করবার জন্য জন্ম-মৃত্যু সকলই তাঁর বশে এসে থাকে। সৃষ্টি না হবার জন্য তাঁর আর জন্ম হয়না। মৃত্যুরূপ এই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে সাধক চিরমৃত্যুর পথে বিরাজ করেন। তাই তিনি ঐ অবস্থায় সকল কর্ম করেও ভগবান চৈতন্যরূপী আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। শিশুর মতন চঞ্চল অবস্থাও যখন তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তখনও কিন্তু তিনি চৈতন্যরূপী আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। এই যুক্তাবস্থায় থাকেন বলে কোনরূপ ভাবই তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনা। এইভাবেই তিনি দেহত্যাগ করে পরে যদি অপর কোন দেহধারণও করেন, তা

হলেও তিনি সেই আনন্দময় চৈতন্যাবস্থাতেই লেগে থাকেন। কারণ তাঁর কাছে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপী এই জন্ম-মৃত্যু হল এক বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর বস্ত্র পরিধান করা। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি যেহেতু মোক্ষপ্রাপ্ত হন, সেহেতু তাঁর ইচ্ছামৃত্যু প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কারণ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি মৃত্যুকে দেখে, তাঁকে চিনে, তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁকে জয়লাভ করেছেন। সেহেতু তাঁর মৃত্যুভয় নেই। যাঁর মৃত্যুভয় নেই, তাঁকে কোনরূপ ভয়ই কাবু করতে পারে না। মৃত্যু বিজয়প্রাপ্ত হবার ফলে তিনি স্বইচ্ছায় আপন পুরাতন বস্ত্ররূপী দেহ পরিত্যাগ করতে পারেন।

**মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।**
**সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩**
**সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।**
**তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪**

**তাৎপর্য্যঃ**— কূটস্থের মধ্যে মন নিবদ্ধ করে সাধক যদি সেই কূটস্থ মধ্যে মন স্থির করতে পারেন, তা হলে কূটস্থের উর্দ্ধে সাধক একটি ত্রিকোণাকার ত্রিভূজ পরিলক্ষণ করেন। এই ত্রিভূজই হল যোনিস্বরূপ। এই যোনি কূটস্থের উর্দ্ধে ব্রহ্মস্থানে অবস্থান করছেন বলে এই যোনি ব্রহ্মযোনি পদবাচ্য। জীব অণুস্বরূপ বিন্দুরূপে অবস্থিত হয়ে এইস্থান হতে বিন্দুর বিস্তার রূপে অবয়ব বিশিষ্ট হন। প্রাণরূপী আত্মার এই ত্রিকোণাকার যন্ত্রই হল গর্ভাধানের স্থান — অর্থাৎ ঐ স্থান হতে চঞ্চলপ্রাণরূপ জীবের উৎপত্তি।

দেহধারণ করবার পর কামনা-বাসনা হেতু মনের মধ্যে যে সকল বিষয়চিন্তা উদ্ভূত হয় তা সকলই এক একটি যোনিস্বরূপ। এই যোনিই হল প্রকৃতি স্বরূপা। কর্ত্তারূপে পুরুষ সকল দেহেই বর্ত্তমান এবং সকল প্রকৃতি তাঁর সহিত যুক্ত হয়ে আছেন বলে জীবদেহে নানারূপ বিষয়সকলের উৎপত্তি হচ্ছে। আবার আপনাতে আপনি মন রাখবার জন্য প্রাণকর্মরূপী আত্মক্রিয়ার দ্বারা যিনি আত্মজ্ঞ হতে সচেষ্ট হন, তখন আপন মনকে এই সকল বীজস্বরূপ বিন্দু হতে মুক্ত করে পরমশূন্যে মনকে লয় করতে পারেন। তার ফলে জীব মোক্ষপ্রাপ্ত

হ্ন। তাই মহাব্রহ্মবৎ যে যোনি কূটস্থউর্দ্ধে অবস্থান করছেন, তা হ্ল জগতের মাতৃস্থানীয়া।

**সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।**
**নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫**
**তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।**
**সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬**

**তাৎপর্য্যঃ**—(এই ব্রহ্মযোনি রূপই হ্ল জগতের মাতৃস্থানীয়া। ইনিই হ্লেন আদ্যাশক্তিরূপা প্রাণশক্তি। আমাদের দেহস্থিত সকল গুণ এই প্রাণশক্তিরূপা আদ্যাশক্তি হতে উৎপন্ন। চঞ্চলপ্রাণরূপী মানুষ ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপী তম-রজ ও সত্ত্বগুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে অজপারূপে বায়ুর বহির্গমনের মাধ্যমে আপন আয়ু ক্ষয় করে থাকে। মায়া, মমতা ও মোহদ্বারা তাদের এই চোখ বাঁধা থাকবার জন্য তারা পরমাত্মারূপী এই পরমপুরুষের অবস্থান দেহমধ্যে অনুভব করতে পারেন না। আমি-আমার বোধের জন্য সুখ-দুঃখরূপী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে বলে মেঘে ঢাকা তারার ন্যায় আপন দেহস্থিত পরমাত্মাকে কামনা-বাসনারূপী মেঘের দ্বারা ঢেকে রাখে।)

তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের দ্বারা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সুখের প্রকাশ পায় অর্থাৎ এই সত্ত্বগুণাবস্থায় সাধারণ মানুষ পৌঁছালে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হবার চেষ্টা করে। বাহ্যিক আসক্তিরূপী বন্ধন থাকবার জন্য তাঁদের মনের মধ্যে উদ্ভূত ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশা আশাই থেকেই যায় — বাস্তবায়িত হয় না। তিনগুণের মধ্যে যদি দুইগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তম এই তিনগুণের মধ্যে যদি রজ ও তম এই দুইগুণরহিত অবস্থা সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়, তা হলে সত্ত্বগুণে অবস্থান করে তারা শরীরের মধ্যস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়াসকল সম্পর্কে জানতে পারে। ঐ জ্ঞানের মধ্যে গুরুপ্রদত্ত আত্মক্রিয়ারূপ যোগকৌশলের দ্বারা যদি সে প্রবেশ করতে পারে, তা হলে সেই জ্ঞানের দ্বারা আসক্ত হয়ে আত্মসম্বন্ধীয় বিষয় সম্পর্কে বোধ করতে পারে এবং দেহীরূপ আত্মাকে জানতেও

পারে।

কিন্তু দেহীরূপ বস্তুকে জানতে গেলে সত্ত্বগুণরহিত ভাবও মনের মধ্যে প্রকাশ হতে হবে। এই রহিতভাব মনের মধ্যে প্রকাশিত হলে তবেই দেহরূপ বস্তুকে জানতে সক্ষম হবে। গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে সেই আসক্তি হেতু ঐ জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। আসল বস্তুরূপে গুণের অতীত পরব্রহ্মস্বরূপ দেহীকে সাধক জানতে পারবে না। গুণের মধ্যে থাকলে সুখের আসক্তি দ্বারা সুখভোগ এবং জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা জ্ঞানসঙ্গ করতে থাকে। গুণ থেকে আপন প্রাণকে গুরুপ্রদত্ত কর্মদ্বারা মুক্ত করতে পারলে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন পরব্রহ্মস্বরূপ নিরঞ্জনকে জানা সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়।

**রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।**
**তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭**
**তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।**
**প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮**
**সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মাণি ভারত।**
**জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯**
**রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।**
**রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** কামনা-বাসনারূপী মোহতৃষ্ণার মধ্যে যখন মানুষ অবস্থান করেন বা রজগুণের মধ্যে যখন মানুষ অবস্থান করেন, তখন আসক্তিরূপ কর্মের দ্বারা লালসার জন্ম হয়। ঐ লালসা পূরণের জন্য জীব ফলাকাঙ্ক্ষা করে থাকে। সেহেতু পরমাত্মার সঙ্গে দেহরূপী আত্মার মধ্যে এক পর্দার সৃষ্টি হয়। তাই দেহস্থিত সেই পরম আত্মা জীবের দ্বারা জানা সম্ভবপর হয়না। তমোগুণরূপী নানারূপ অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ভ্রান্তিতে জীব নিমজ্জিত হয়। এর ফলে জীব আলস্য ও প্রমাদের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে।

ঈড়ায় যখন শ্বাসের গতি হয়, তখন তমোগুণের উদয় হয়। পিঙ্গলায় যখন শ্বাসের গতি হয়  তখন রজোগুণের উদয় হয় এবং সুষুম্নায় যখন শ্বাস থাকে তখন সত্ত্বগুণের উদয় হয়। ঈড়া ছেড়ে পিঙ্গলায় যখন শ্বাস যায় — তখন কিছু সময়ের জন্য সুষুম্নায় অবস্থান করে। আবার পিঙ্গলা ছেড়ে শ্বাস যখন ঈড়ায় যায় — তখন কিছু সময়ের জন্য শ্বাস সুষুম্নায় অবস্থান করে। ঈড়া ছেড়েছে কিন্তু পিঙ্গলায় প্রবেশ করে নি আবার পিঙ্গলা ছেড়েছে কিন্তু ঈড়ায় প্রবেশ করে নি — এই  মত অবস্থায় যে এই প্রকার সন্ধি হয় সেই সন্ধিক্ষণে শ্বাস সুষুম্নায় অবস্থান করে। তখন জীবদেহের মধ্যে এক সুখের অনুভব হয়। তাই হল সত্ত্বগুণের অবস্থা।

চঞ্চলপ্রাণের বশবর্ত্তী হয়ে জীব সকল কর্ম করে বলে সত্ত্বগুণরূপী ঐ স্থিরবায়ুকে জীবের দ্বারা অনুভব করা সম্ভবপর হয়না। প্রাণকর্মের দ্বারা সুষুম্না নাড়ীতে শ্বাসের গতি বৃদ্ধি করতে পারলে, জীব ঐ সুখাবস্থা অনুভব করতেপারে। সুষুম্না নাড়ীতে ক্রমাগত ভাবে শ্বাসের গতি স্থির করতে করতে কোন এক সময় প্রাণরূপী শ্বাস ঐ স্থানে আটকে যায়, ঐ অবস্থায় বসে "ওঁ"কার রূপী প্রাণকর্মের দ্বারা জীব স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হতে পারলে বা ঐ স্থানে মনকে স্থির করতে  পারলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং গুরূপদিষ্ট এই প্রাণকর্মের দ্বারা গুণসকল রহিত হয়ে জীব সাধকরূপে পরিগণিত হয়ে ঊর্দ্ধে গমন করতে সক্ষম হন।

যে সকল জীবের দ্বারা উপরোক্ত ভাবে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না, তারা রজঃ ও তমঃগুণের বশবর্ত্তী হয়ে সেই শৃঙ্খলেই আবদ্ধ হয়ে বা বন্দী হয়ে থাকে।

**সর্ব্বদ্বারেষু দেহঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।**
**জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১**
**লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মনামশমঃ স্পৃহা।**
**রজোস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২**
**অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।**
**তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমাদের দেহস্থিত সকল ইন্দ্রিয়তেই আত্মার প্রকাশ, কারণ এই ইন্দ্রিয়সকলও তাঁর থেকেই সৃষ্ট। প্রাণকর্মের দ্বারা যখন তন্ময় ভাবের সৃষ্টি হয়, তখন শরীরের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীপথে স্থির গতিরূপ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। সেইসময় আত্মময়ভাবে ভাবিত হয়ে থাকবার জন্য সর্বদেহেই এবং দেহস্থিত সকল ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে পরিপূর্ণবৎ সেই আত্মার অবস্থান সাধক উপলব্ধি করতে পারে।

সাধারণ মানুষ সর্বদা নানাবিধ আকাঙ্ক্ষারূপ বিষয় ইচ্ছা করে কর্ম্ম আরম্ভ করে। সেহেতু মনের মধ্যে সর্বদা বিষয়মদের লালসা জন্মে থাকে। রজঃগুণের মধ্যে এবং তমঃগুণের মধ্যে চঞ্চলপ্রাণরূপী মানুষগণ অবস্থান করছে বলে মনের মধ্যে ইচ্ছা, লালসা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকল এক কুয়াশার সৃষ্টি করছে। এই কুয়াশার সৃষ্টি করছে বলে ভগবান আত্মনারায়ণের প্রকাশ তারা দেখতে পাচ্ছে না। উপরোক্ত ঐ সকল ইচ্ছা ও লালসার বশবর্ত্তী হয়ে সংসারজালে বদ্ধ হয়ে সর্বদা অশান্তি ভোগ করে।

এই সকল মনোভাব নিয়ে যদি সাধক প্রাণকর্ম্মে অবতীর্ণ হন এবং তার থেকে অর্থাৎ সংসাররূপী মায়াজাল থেকে যদি বেরিয়ে আসতে না পারেন তা হলে তাদের দ্বারা প্রাণকর্ম হয় না। প্রাণকর্ম করছি অথচ মনের মধ্যে নানারূপ বিষয়চিন্তা ও লোভ নিত্যনতুন বাড়িয়ে চলেছি — এরূপ ভাব হলে প্রাণকর্ম বা পরমাত্মরূপী গুরুদেবের আদেশ উপদেশ কিছুই মানা ঐ প্রাণকর্মীর দ্বারা সম্ভবপর হয় না। কেবলমাত্র ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্রই হয়। প্রাণকর্ম করে মুখে "শান্তি পাচ্ছিনা, শান্তি পাচ্ছিনা" বলে মনের মধ্যে বিষয়চিন্তা অধিক জাগরিত করে অশান্তি বৃদ্ধি করে চলছি।

এই সকল মানুষদের কোন কর্ত্তব্য বলে কিছু থাকে না। কোন্ কাজ করলে উপকার হবে তা তারা দেখে না। সর্বদা তারা মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত। আপন স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য তারা নানারকম মিথ্যার পথ আশ্রয় করে চলে। মনের মধ্যে আচার না থাকার জন্য বিচার করবার ক্ষমতা এই সকল মানুষদের থাকে না। এই সকল মানুষদের শ্বাসের গতির প্রতি কোন লক্ষ্য নেই। মনের

গতি অনুযায়ী যা ইচ্ছা বা কামনা দানা বাঁধবে সেই দিকেই এরা ধাবমান হয়ে পড়ে এবং সকল কাজ করে তার থেকে ফলের প্রত্যাশা করে। এ ছাড়া কম কাজ করে কি করে অধিক ফল লাভ করা যায় সেদিকে সর্বদা মনোনিয়োগ করে। এই সকল ব্যক্তি তিনগুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সকল কার্য্য করে বলে কর্মফল সৃষ্টি করে এবং এই কর্মফল সৃষ্টির জন্য সেই নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সর্বদা জন্মমৃত্যুর এই বদ্ধদশায় পড়ে থাকে। তার থেকে মুক্ত হতে পারে না।

যে সকল ব্যক্তি এই মায়াবন্ধন থেকে শ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছেন, সেইসকল ব্যক্তির শ্বাসে চঞ্চলতা থাকে না। তাঁরা আপন প্রাণকে স্থির করেছেন বলে শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানে এবং সমগ্র জগতের যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারেন। এই সকল ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট উপায়ে শ্বাসের কর্ম করে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। মনের মধ্যে প্রাণকর্মের প্রতি এবং বিশেষ করে সদ্‌গুরুর প্রতি যদি একান্ত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি ইত্যাদি থাকে তা হলে শরীরের মধ্য হতে সৃষ্ট হয় সংস্কাররূপী আচার। সেই আচার থেকেই সকল কার্য্য করবার পূর্বে সাধকের মধ্যে আসে সেই কার্য্যের প্রতি বিচার। এইভাবে গুরূপদিষ্ট পথে আপনাকে গড়ে সাধক শ্রীগুরুদেবের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন বা তিনগুণরহিত অবস্থারূপী গুণাতীত অবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তখন সকল বন্ধন, সকল আবদ্ধতা হতে সাধক চিরমুক্তির পথে এবং চিরশান্তির পথে অবস্থান করেন।

**যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।**
**তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪**
**রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।**
**তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫**
**কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।**
**রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্ব শ্লোকোক্তরূপে যদি কেউ আত্মক্রিয়া প্রাপ্ত হন এবং গুরূপদিষ্ট পথে চলতে পারেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা একান্তরূপে

ভালবাসতে পারেন তা হলে তাঁর দেহের মধ্যে উপস্থিতিতে সকল আত্মকর্মরূপী প্রাণকর্ম সঠিকরূপে হয়ে থাকে, সেই সকল ব্যক্তি পূর্বশ্লোকোক্ত উপায়ে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বা মৃত্যু বিজয় করে ইচ্ছা মৃত্যুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

যে সকল সাধক সত্ত্বগুণের মধ্যে অবস্থান করেন কিন্তু গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছুতে পারেন নি, সেই সকল সাধক দেহান্তের সময় যদি পরব্রহ্ম স্বরূপ পরম গুরুদেবকে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে লক্ষ্য ও স্মরণ করে চলেন তা হলে পরজন্মে এসে তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন।

যে সকল ব্যক্তি সত্ত্বগুণে অবস্থান করছেন কিন্তু দেহান্তের সময় মন বিশেষরূপে স্থির প্রাপ্ত হয়নি, শ্রীগুরুদেবের পদে মন স্থিরপ্রাপ্ত না হওয়ার জন্য সেই সকল সাধক আবার জন্মগ্রহণ করেন।

যে সকল সাধক রজঃ বা তমঃগুণের মধ্যে অবস্থান করে এবং দেহান্তের সময় অধিক করে যদি বিষয় চিন্তায় মত্ত থাকে তা হলে ঐ সকলব্যক্তির দ্বারা মনুষ্য জন্ম প্রাপ্তি হয়না। তখন তারা সংসাররূপী অজ্ঞানতার মধ্যে আবদ্ধ হবার জন্য পশু যোনি প্রাপ্ত হয়।

তাই সাধনায় অবতীর্ণ হতে গেলে প্রাণকর্মরূপী কার্য করলেই চলবে না, শ্রীগুরুদেবের আদেশ উপদেশ ও তাঁর উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি থাকা সেই সকল প্রাণকর্মীর একান্ত দরকার। তা না হলে সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোন প্রাণকর্মী বা সাধকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। গুরূপদিষ্ট এই প্রাণকর্ম করে গুরুদেবের আদেশ উপদেশ মেনে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা যদি কোন সাধক সত্ত্বগুণের ঊর্দ্ধে অবস্থান করতে পারেন তা হলে শ্রীগুরু কর্তৃক ঊর্দ্ধলোকে অবস্থান করে তাঁরা উত্তমগতি প্রাপ্ত হন। আত্মকর্মরূপ সৎকর্মের দ্বারাই প্রাণের বৃদ্ধি হয়ে নির্মল জ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হলে এর দ্বারা মন থেকে সকল ময়লা ধৌত হয়ে মনকে নির্মল এবং স্বচ্ছ করে তোলে। সেই মনে তখন কোন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, লালসা অবস্থান করতে পারেনা। এর ফলে তাকে আর কর্মের মধ্যে আবদ্ধ হতে হয় না। অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকল কর্ম সৃষ্টি হয় বলে

কর্মফল সৃষ্টি হয়না। রজোগুণ ও তমোগুণের বশবর্তী হয়ে যে সকল ব্যক্তি কর্মের সঙ্গে আবদ্ধ, সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেই সকল ব্যক্তি অজ্ঞান মনের বৃদ্ধির দ্বারা সর্বদা অশান্তি ভোগ করে থাকেন এবং পদে পদে আঘাত প্রাপ্ত হন।

**সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।**
**প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।।১৭**
**ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।**
**জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮**
**নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।**
**গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।।১৯**
**গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।**
**জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মকর্মরূপী সৎ কর্মের দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। তাই জীবন-মরণরূপী এই শৃঙ্খল থেকে চির মুক্তির পথে অগ্রসর হতে গেলে অবশ্যই সদগুরুপ্রদত্ত প্রাণ কর্ম করতে হবে। তমোগুণ ও রজোগুণের দ্বারাই মনুষ্যদেহের জ্ঞানশূন্য ভাবের হেতু অজ্ঞানরূপ লোভ, ইচ্ছা, কামনা,বাসনা, মায়া, মোহ ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করে।

প্রাণ কর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে মস্তকে ধারণ করতে পারলে উত্তম জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়ে থাকে।এর ফলে চঞ্চল প্রাণ না থাকার জন্য সাধককে আর মধ্যাবস্থার মধ্যে পড়ে জঘন্যতম প্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না, তখন আত্মার স্বরূপও প্রাপ্ত হন, বা জীবভাবরূপী মানুষ শিবভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন সেহেতু যে কোনরূপ গুণ ও ইন্দ্রিয়সকল তাঁর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থায় থাকে। প্রাণরূপী আত্মার স্থিতি করে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ পদে অধিষ্ঠিত হন।

সাধারণ মানুষ গুণ সকলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সকল কর্ম করে থাকেন

বলে সর্বদা প্রবৃত্তিরূপী পশুভাবে সকল কর্ম পালন করেন, এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মোহপাশে বদ্ধ হন। এই অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য শরীরের মধ্যে অজ্ঞানতা হেতু এক মত্ততা ভাবের সৃষ্টি হয়। সেই ভাবের বশবর্তী হয়ে সকল কর্ম করে থাকেন এবং আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য একে অপরের অনিষ্ট করতেও পিছুপা হন না। এইভাবেই এক প্রাণের দ্বারা অপর প্রাণ নিজ স্বার্থরূপী কার্য চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে ধ্বংস করেও থাকেন। সেহেতু এই সকল মনুষ্যগণ পশুপদবাচ্য।

**কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।**
**কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।।২১**
**প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।**
**ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২**
**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।**
**গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩**

**তাৎপর্য্যঃ—** জগৎ সংসারে যা কিছু উদ্ভব হচ্ছে বা উৎপন্ন হচ্ছে তার মূল কারণ হল আত্মা। আত্মাই চঞ্চল প্রাণ কর্ত্তৃক এই দেহ ঘটে আবিষ্ট হন এবং এই জীবদেহ ধারণ করে তিনগুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সকল কর্ম করে থাকেন। এই আত্মার সঙ্গে স্থির ভাবে জীব যুক্ত হতে পারলে যে ভাবাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ আপন প্রাণকে পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়ে স্থির করতে পারলে জীব শিবে রূপান্তরিত হন। সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে জীবভাবরূপী আত্মা তিনগুণ রহিত হয়ে শিবময় রূপী আত্মায় বা গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন। আত্মায় স্থিতি করতে পারলে তবেই পরমাত্মা সম্পর্কে সাধকের জানা সম্ভব হয়।

গুরূপদিষ্ট যোগক্রিয়া যে সকল ব্যক্তি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করে তাদের দ্বারা এই সকল গুণাদি কর্ম থেকে আপন মনকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনা বা জ্ঞানকে ঊর্দ্ধদেশে চালনা করা সম্ভবপর হয়। এর ফলে এই সত্ত্বগুণের কার্যদ্বারা তিনি ধীরে ধীরে সকল আসক্তি থেকে মুক্ত হন.এবং মোহ দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে

আরও উর্দ্ধে আপন প্রাণকে স্থাপন করতে সম্ভব হন, সেই সকল ব্যক্তি ত্রিগুণরূপী কার্য থেকে মনকে লিপ্ত না করিয়ে মুক্ত হয়ে থাকেন। এর ফলে তাদের দেহমধ্যে লালসা, আকাঙক্ষা, কোন বস্তু উপভোগ করবার ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ পায়না। সেহেতু সকল কর্ম করে তিনি অবিচল থাকেন, এইসকল ব্যক্তি পরমাত্মার সঙ্গে স্থিতিলাভ করতে সমর্থ হন বলে, সকলগুণের অতীত অবস্থায় অবস্থান করেন বলে, তিনি গুণাতীত পদবাচ্য।

শরীরস্থ উর্দ্ধস্থানরূপ ব্রহ্মমার্গে যিনি মনকে অবস্থান করাতে পেরেছেন সেইরূপ ব্যক্তি সুখ, দুঃখ কোনকিছুতেই বিচলিত হন না। উপরে অর্থাৎ মস্তকে প্রাণকে পরব্রহ্মে মিলিয়ে ইচ্ছামৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্য তিনি শরীরের মধ্যে অবস্থান করে যা কিছু ঘটছে সকলকিছু উদাসীনভাবে অবলোকন করে তার সাক্ষীরূপে অবস্থান করছেন।

**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।**
**তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪**
**মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।**
**সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** ("আপনাতে আপনি থাক, মন, যেও নাকো কারও ঘরে। যা চাবে তা বসে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।") আত্মস্থ হতে পারলে অর্থাৎ আত্মায় গুণের অবস্থিতি করাতে পারলে তখন মনের মধ্যে এক শান্তির ভাব উৎপন্ন হয়, তখন সুখ, দুঃখ, মান, অপমান সকলই সাধকের কাছে সমজ্ঞান মনে হয়। প্রিয়-অপ্রিয় কোন ভেদ তখন তার কাছে থাকে না। সকলই মিলে মিশে এক ব্রহ্মরূপের সৃষ্টি করে, তাই একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তিএই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাপ্ত হন।

সেহেতু যা কিছু হবার হচ্ছে যা কিছু হবার হবেই আর কর্মক্ষেত্রে যা করবার তা করতেই হবে। সেই কাজ ফুরালে তার দেহ অবসান প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তিনি তখন চির সমাধির জগতে প্রবেশ করেন। সংকল্প, বিকল্প ও ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ত্রিগুণের অতীত সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।

**মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।**
**স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬**
**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।**
**শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম যে সব ব্যক্তিবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকেন, তাদের দ্বারাই প্রকৃত গুরুসেবা হয়। সেই সেবার দ্বারা ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। প্রাণরূপী আত্মা বৃহৎ প্রসার লাভ করে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তির যোগ্য হন। 'আমি'রূপী পরব্রহ্ম হল সেই অব্যক্ত মহান ভাব এবং এক বিশেষ স্থিতির অবস্থা।

তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান। সাধনার দ্বারা প্রাণের স্থিতি লাভ করে মৃত্যুরূপ কালভয়কে সম্পূর্ণরূপে জেনে, তাকে দেখে,তাতে মিশে যে বিজয়রূপী জয় সাধক সাধন করেছেন তা নিজ করায়ত্ত করাই হল প্রকৃত অমরপদ লাভের অবস্থা। ধর্ম হল যা দ্বারা সর্ব জীবের পোষণ হয়ে থাকে। প্রাণের দ্বারা যেহেতু সর্বজীবের পোষণ সাধিত হয়ে থাকে সেহেতু প্রাণই হল সর্বজীবের ধর্মস্বরূপ। পরমানন্দকে প্রাপ্ত হলে আমি হারা এক ভাবরূপ বিশেষ সুখের অবস্থা সাধক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই সুখ ও শান্তির মধ্যে আপন মনকে নিমগ্ন করে সে সকল কর্ম করে চলে। তাই হল সত্যকারের আপনাতে আপনি বা পরব্রহ্মের সঙ্গে মিশে নিজে পরব্রহ্ম হয়ে যাওয়ায় আপন দেহের মধ্যে অবস্থান করে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ সকল অবলোকন করতে পারা। এর মাধ্যমে তার আর জানার কিছু বাকী থাকে না বলে সকল কিছুই ঐ স্থির অবস্থায় থেকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছেন।

**।। ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগঃ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

যোগাচার্য্য শ্রী শ্রী আদ্যনাথ রায়

## পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

### পুরুষোত্তমযোগ

**ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।**
**ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১**
**অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা**
**গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।**
**অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি**
**কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২**

তাৎপর্য্যঃ—(আমাদের দেহসকলকে উদ্ভিদরূপী অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে কল্পনা করা হচ্ছে। কারণ অশ্বত্থ কথার অর্থ হল অস্থায়ী। আমাদের দেহও সেরূপ অস্থায়ী কারণ আমরা কালকে চিনি না, কাল কি হবে তা সম্পর্কেও আমরা বলতে পারিনা। কাল আমাদের দেহটাও থাকবে কিনা তা পর্যন্ত বলতে পারিনা। সেহেতু যা আজ আছে হয়ত কাল তা নাও থাকতে পারে, সেহেতু এই দেহ হল অস্থায়ী। মানব দেহের মধ্যে ভগবান আত্মনারায়ণ সদা সর্বদা অবস্থান করছেন এবং এই আত্মনারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরাপ্রকৃতি রূপী রাধা ব্রহ্মযোনি স্থানে যুক্ত হয়ে আছেন বলে বীজ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রতিটি মানবদেহ সেই বীজ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে আপন হাত পা বিশিষ্ট শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দেহ অবয়বটি সৃষ্ট হয়েছে, সুতরাং মস্তকই হল অর্থাৎ সহস্রার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত হল পরমাত্মতত্ত্বরূপী আমাদের এই দেহের মূল এবং সেই আজ্ঞাচক্র থেকে দেহের নিম্ন দেশ হল শাখা প্রশাখারূপী প্রকৃতির অধীন। ঐ মূল থেকে অর্থাৎ পরমাত্মরূপী ঐ আত্মা থেকে সমগ্র জীবদেহ চালিত হচ্ছে)

দেহস্থিত সত্ত্ব, রজঃ গুণাদি হল দেহ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই সকল গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে প্রাণীগণ মনের মধ্যে ইচ্ছার পোষণ করে থাকে, সেই ইচ্ছার দাসত্ব করে আপন কর্মফল সৃষ্টি করে এবং তা

ভোগ করার উদ্দেশ্যে জীবদেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যদিয়ে প্রাণবায়ুরূপী খাদ্যের দ্বারা দেহের গুণ সকল কামনা-বাসনারূপী খাদ্য তৈরী করে দেহের মধ্যে চালনা করে থাকে। কর্মসূত্রে আবদ্ধ হতে হয় সেই সকল কার্য যে সকল দেহের দ্বারা হয়ে থাকে সেই সকল দেহ আজ্ঞাচক্রের নিম্নদিকে অবস্থান করে। আর যে সকল কর্ম সূত্র দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করা যায় সেই সকল কর্ম যে দেহের দ্বারা পালন করা সম্ভব হয়ে থাকে সেই সকল দেহমধ্যস্থিত প্রাণ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে অবস্থান করে।

তাই আজ্ঞাচক্রের নিম্নে কর্মবন্ধনরূপী চঞ্চল প্রাণ এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে কর্মবন্ধনসকল ও গুণাদিরহিত স্থির প্রাণ অবস্থান করছে।

**ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে**
**নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।**
**অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-**
**মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।৩**
**ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং**
**যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।**
**তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে**
**যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪**
**নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা**
**অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।**
**দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ -**
**র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** দেহ ধারণ করে জীবরূপী মনুষ্যগণ তিনগুণাদি ইন্দ্রিয় সকল ইত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অবস্থান করে চঞ্চল প্রাণের মধ্যে আটকে থাকে। তাদের উৎপত্তি কোথা থেকে, এবং কোথায়ইবা তারা লয়প্রাপ্ত

হবেন, ও কতদিনই বা বাঁচবেন বা দেহধারণ করে থাকবেন, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুই অবগত নন। জানবার ইচ্ছা পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে করেনা, কারণ কামনা বাসনারূপী বিষয়বস্তুসমূহ নিয়ে তাঁরা এতই ব্যস্ত থাকেন যে তা ভাববার পর্যন্ত সময় পান না। আজ যে বস্তুর পেছনে সে ছুটে মরছে কাল এই দেহ না থাকলে কি হবে, সে কথাও তারা মাঝে মাঝে ভুলে যায়। কামনা বাসনারূপী বিষয়টি তার চাই-ই-চাই। এই লালসায় মত্ত হয়ে জীবদেহ আগুপিছু কোনরূপ ভাবনা চিন্তা না করে ছুটতে থাকে, সেহেতু পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু তবুও তার মনের ছোটার কোন ক্লান্তি নেই। সেই অবস্থা পেরিয়ে গেলে আবার ছুটতেই থাকে। তাই এইরূপ মনের দ্বারা সৃষ্ট মনুষ্যগণের আত্মতত্ত্ব লাভ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি হতে হলে, ঈশ্বরের চিন্তা, কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে অবশ্যই করতে হবে। পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং গুরুদেব জীব দশা থেকে মনুষ্যগণকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ধরায় অবতরণ করেন। সাধারণ মানুষের হাজার অপমান, অপবাদ, তিরস্কার সহ্য করে ক্ষমাশীল হয়ে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে আপন বক্ষে টেনে নেন। তাঁর সন্তানের কি করে আত্মিক উন্নতি হয় সর্বদা সেদিকেই লক্ষ্য রেখে চলেন। কিন্তু চঞ্চল প্রাণরূপী মনুষ্যগণ সদাসর্বদা বিষয় চিন্তায় মগ্ন থাকবার জন্য আত্মিক উন্নতির চাইতে আর্থিক উন্নতিতে অধিক শ্রম দিয়ে থাকে। সেহেতু তারা বন্ধন দশার মধ্যে শুধু জড়াতে থাকে। পরমারাধ্য গুরুদেব তার একটি জট খুলে দিলে সে অপর আর একটি জট তৈরী করে ফেলে। সেহেতু তাদের দ্বারা সদ্‌গুরুলাভ হবার পরও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতা না থাকার জন্য তারা প্রাণকর্মে উন্নতি করতে পারে না। যে অবস্থায় পড়েছিল সেই অবস্থাতেই পড়ে থাকে। আবার অলসতার হেতু আপন কর্ম বা আত্মকর্ম করতে হাজার গ্যাফিলতি দেখায় এবং হামবড়া ভাব প্রকাশ করে নিজেকে খুব বড় বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু খালি কলসি শুধু ঠং ঠং করেই মাত্র। তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করে না।

জীবনের সারমর্ম বুঝতে গেলে অবশ্যই গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম করতে

হবে। এর জন্য চাই আত্মসঙ্গরূপ প্রাণকর্মরূপী অস্ত্রের দ্বারা মূল থেকে ইন্দ্রিয় সঙ্গ উচ্ছেদ করে সমগ্র গাছটিকে অর্থাৎ দেহরূপী হাত পা ওয়ালা ইন্দ্রিয়ের দাসকে শেষ করা। বাড়ীতে কোন আগাছা হলে তা যাতে পুনরায় না হয় তারজন্য সেই আগাছাগুলিতে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিই। সেরূপ ইন্দ্রিয় সকল ত্যাগ করতে হলে বায়ুর গতিকে উল্টো করে গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াকৌশলরূপী যোগ সাধনের দ্বারা অশ্বত্থরূপী দেহের মূল ছেদন করতে পারলে অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি ভেদ করে অরূপময় আদিপুরুষের সঙ্গে মিলতে পারলেই ইন্দ্রিয়সকল দেহমধ্যে বিকল হয়ে আপন বশে অর্থাৎ সাধকের বশে এসে থাকে। এর ফলে মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, লালসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া অনির্বচনীয় সুখের ও শান্তির অবস্থায় তখন সাধক অবস্থান করেন। এই হল প্রকৃত জীবন রহস্য। এই রহস্য জানতে হলে তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুরূপী প্রাণক্রিয়া করতে হবে এবং কূটস্থ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করে জ্ঞানলাভ করতে হবে। এর পর আপন মনকে পরমাত্মায় লয় ঘটিয়ে চির-শান্তি প্রাপ্ত হতে হবে।

**ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।**
**যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬**
**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।**
**মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরব্রহ্মরূপী স্থির পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হলে সাধককে আর পুনরাবর্তনরূপ জন্ম মৃত্যুর আবর্তনে পড়তে হয়না। ভবরোগরূপী এই বন্ধন চিরকালের জন্য নিপতিত হয়ে যায়। পরব্রহ্মের সঙ্গে সাধক মিলিত হলে এক আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে বিরাজ করেন। সেখানে সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, বায়ু নেই, অগ্নি নেই তবুও হাজার হাজার— সূর্য্যের জ্যোতি মিলিত হয়ে একপরম জ্যোতির্ময় স্থান সৃষ্টি হয়েছে— সেই জ্যোতির সাগরে সাধক স্নান করতে পারলে অর্থাৎ প্রাণকর্মের দ্বারা সেই জ্যোতির গহ্বরে প্রবেশ করতে পারলে সাধকের সকল পাপ দূরীভূত হয়ে বা ক্ষয় হয়ে যায়। তখন সাধক এক পুণ্যবান মহাত্মা

রূপে জগতে পরিচিত হন।

এই ব্রহ্মই অণুরূপী বীজ রূপে সকল জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে সৃষ্টিতত্ত্বরূপ এই জীবলোককে পরিচালনা করছেন। পঞ্চতত্ত্ব ও মন, বুদ্ধি, অহংকার এই আট প্রকৃতির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সেই পরব্রহ্ম থেকে চ্যুত হয়ে ইহলোকের মধ্যে সংসার রূপী বন্দী দশায় কর্মফল খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে সে পুনরাগমন করে। এই আট প্রকৃতির আকর্ষণ হেতু এজন্মে সে যা কর্মফল সৃষ্টি করে পরবর্তী জন্মে আবার তা ভোগ করবার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে বারংবার আপন ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে গমনাগমন চলতেই থাকে।

**শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।**
**গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮**
**শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।**
**অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯**
**উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।**
**বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তিজ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** ভোগ লালসারূপী কর্মের দ্বারা চঞ্চল প্রাণরূপী মনুষ্যগণ আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য বারংবার নরদেহ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। একদেহ পরিত্যাগ করে অপর দেহ ধারণ করবার জন্য দেহান্তের সময় আত্মা যখন পুরাণ দেহ ছেড়ে অন্যদেহে প্রবেশ করে তখন পুরাণ দেহের কর্মফলের সঙ্গে যুক্ত সেই জীবের প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয় সকল ঐ আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে অর্থাৎ জীবদেহের দেহান্তের পরও তার ইন্দ্রিয় সকল ও প্রকৃতি সকল তার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে এবং নূতন অবয়ব ধারণ করলে সেই সকল ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি পুনরায় নূতন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে আবার আপন কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই মন যাঁর নেই তাঁর দ্বারা কোন ভোগই হয় না। তাই পরমাত্মার সঙ্গে যিনি আপন মনকে লয় করাতে পেরেছেন, তিনি ভোগের

অবসান হেতু ভোগাতীত পদে চির স্থিতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বা দেহীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি যেহেতু স্বয়ং দেহী পদবাচ্য, সেহেতু তাঁর মন কখনও বিষয় সকল ভোগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এই সকল রহস্য যিনি যোগী তিনি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং পরমারাধ্য গুরুই হলেন সেই যোগী পদবাচ্য। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দ্বারা এই সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া কখনই সম্ভব নয় কারণ তারা স্থির বুদ্ধি বা যুক্তবুদ্ধিশালী নন।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত থাকবার জন্য পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট কেবল কথাই শুনে থাকে মাত্র, কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। আত্মজ্ঞানরূপ জ্ঞানচক্ষু যাঁদের প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁরাই আত্মজ্ঞানরূপী দেহীকে বা পরমগুরুদেবকে দেখতে পান এবং তাঁর রূপসকল সম্পর্কে বিশেষরূপে জানতে পারেন। তাই মনের অধীন হয়ে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে তাঁর রূপ দেখা, শোনা, তাঁর বাণী শোনা বা ওঁকে অনুভব করা যায় না।

**যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।**
**যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১**
**যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।**
**যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** প্রাণের চঞ্চল গতিকেপ্রাণ কর্মের দ্বারা স্থির করে যারা সদাসর্বদা স্থির চিত্তরূপ সংযত চিত্ত হয়ে থাকেন তাঁরাই যোগী পদবাচ্য।

আত্মকর্মের দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মরহস্যরূপ পরমাত্মার রূপ সমুদয় তাঁর এই দেহের মধ্যে থেকে দর্শন করেছেন। এই সকল ব্যক্তিগণের দ্বারাই আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষরূপে জানা সম্ভব হয়। ভূরি ভূরি পাঠ্যপুস্তক পড়লে, শাস্ত্রাদি স্তোত্র উচ্চারণ করলেই আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানতে হলে সদ্গুরুর নিকট থেকে আত্মবিদ্যার অভ্যাস করে সংযত চিত্ত হওয়া দরকার। তখন আর কোনরূপ পাঠ্য পুস্তকাদি, শাস্ত্র ও

বেদ সমূহ অধ্যয়ন করবার প্রয়োজন হয় না। সকল জ্ঞান বিদিত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে অবস্থান করে তত্ত্বাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দেহীরূপী পরমাত্মাকে আপন দেহের মধ্যে দেখতে পান।

কূটস্থ গহ্বরের মধ্যে মনঃ সংযোগ করতে পারলে আত্মনারায়ণের স্বরূপ সাধকের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সমগ্র বিষয় সমূহ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। সূর্য্যের মত তেজঃরূপ জ্যোতিঃ নিয়ে এই দেহের মধ্যে তিনি অবস্থান করছেন, তাঁরই আলোকচ্ছটায় সালোকসংশ্লেষরূপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের পোষণ হয়ে থাকে অর্থাৎ দেহ মধ্যস্থিত সকল ইন্দ্রিয়, নাড়ী, গুণাদিতত্ত্ব সমূহ, আপন কামনা-বাসনা-মোহ-মায়ারূপী খাদ্য তৈরী করে ইচ্ছা, লালসা, মন ইত্যাদি পোষণ করে থাকে। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকলে সূর্য্যের অবর্তমানে যেমন অন্ধকারের সৃষ্টি হয় তেমনি তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে জীব ডুবে থাকে, সূর্য্য অস্ত গেলেও পৃথিবী থেকে প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যাস্ত হয়না। সেরূপ অজ্ঞানীর দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত না হবার জন্য তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার দর্শন হয়ে থাকে। যে সকল ব্যক্তির দ্বারা এই সকল বন্ধন খণ্ডন করা সম্ভব হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে সূর্য্য সম সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে আপনাকে যাঁরা আহুতি দিতে পেরেছেন, তাঁদের দ্বারা সেই আসল জ্যোতিঃরূপ আত্মজ্যোতির দর্শন সর্বদা হয়ে থাকে এবং এই সকল যোগীগণের তেজ তাঁরই তেজরূপে প্রকাশিত হয়।

**গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।**
**পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩**
**অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।**
**প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।।১৪**

**তাৎপর্য্যঃ—**(প্রাণরূপী আত্মা আমাদের দেহস্থিত মাধ্যাকর্ষণ রূপে নাভিদেশে অবস্থান করছেন। এর মাধ্যমেই শরীরের মধ্যে বিশেষ তেজের সঞ্চার ঘটছে। কারণ এই নাভিস্থ জঠরাগ্নির স্থান থেকে প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধে গমন এবং

অপান বায়ুর নিম্নে গমন এইরূপ শ্বাসকার্য চলছে।

এছাড়া এই অংশে তেজরূপী এই অগ্নি অবস্থান করবার জন্য পরিপাক হচ্ছে। অর্থাৎ চর্ব্ব্য ঃ— যা চিবিয়ে খাওয়া হয়। চূষ্য ঃ— যা চুষে খাওয়া হয়। লেহ্য ঃ— যা চেটে চেটে খাওয়া হয়। পেয় ঃ— যা পান করা হয়। এই চতুর্বিধ অন্ন এই অগ্নিরূপী তেজ থেকে পরিপাক হয়ে থাকে এবং শরীরের মধ্যে পুষ্টি সাধন হয়। এই তেজস্তত্ত্ব কোন বস্তুর দ্বারা দগ্ধ হয় না সেহেতু মৃত দেহের দাহ কার্য সমাপন হবার পরও এই নাভি পোড়ে না। একে অবশেষে জলমধ্যে বিসর্জন দিতে হয়।

নাভি যেহেতু তেজস্তত্ত্ব স্বরূপ তাই প্রাণ অপানের গমনাগমনের মাধ্যমে সেই তেজ দেহের মধ্যে চালিত হয়ে সমগ্র দেহ গরম হয়ে থাকে। এই গরম হয়ে থাকবার জন্য দেহস্থিত সকল কর্ম সঠিকভাবে সাধিত হয়। এই নাভি মধ্যস্থ বায়ু চলাচল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন নাভিশ্বাস উঠে জীবদেহ মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং দেহত্যাগ হবার পর জঠরাগ্নির অভাবে দেহ শীতল হয়ে পড়ে।

**সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো**
**মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।**
**বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো**
**বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।১৫**
**দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।**
**ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মাই হল বেদ স্বরূপ। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকল বেদ সমূহ জানা সাধকের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানা অর্থাৎ আপনার দ্বারা আপনাকে জানা। এই জানা সাধকের দ্বারা সম্ভব হলে এক পলকের মধ্যে সকল বস্তুর বিষয় সম্পর্কে সাধক জানতে পারে। একে জানার পর আর কোন জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। আত্মাকে জানলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত সকল কিছু সাধকের জানা সম্ভব হয়ে থাকে। ত্রিকালজ্ঞ হবার

জন্য তিন কাল সম্পর্কে সাধক জানতে পারে। এর মাধ্যমে সাধক অর্ন্তযামিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়।

মস্তকের উপরে স্থির প্রাণরূপী পরব্রহ্ম অবস্থান করছেন। এর ফলে তাঁরই শক্তি সাধারণ মনুষ্যদেহের মধ্যে স্মৃতিশক্তিরূপী কার্য সাধন করে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সকলের মাধ্যম দিয়ে যে জ্ঞান সাধক আহরণ করেন তাও বা সেই জ্ঞানের প্রকাশও, সেই পরমাত্মার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আত্মতত্ত্ব জানতে পারলে সাধকের আর চিন্তা করে স্মৃতি উদ্ধার করা বা জ্ঞানের প্রকাশ ঘটানো ইত্যাদি করতে হয় না। আত্মাকে জানলে সকল কিছু জানার অন্ত হয়ে যায়, তাই তিনি বেত্তাস্বরূপ। কূটস্থ চৈতন্যরূপী স্থির প্রাণের এই পরম তত্ত্ব জানার ফলে সাধক জানতে পারেন এই পরমাত্মার কোন বিনাশ নেই। তিনি আদি, অনাদি এবং অনন্ত কাল ধরে সকল প্রাণী মাত্রকে একই সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। তাঁর কোন ক্ষয় নেই। তিনিই হলেন একমাত্র অক্ষর পুরুষ তিনি ব্যতিরেকে জগতের সব কিছুই ক্ষয় হচ্ছে। তাই চঞ্চল ভাবের প্রকাশ যাঁর বা যাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল ভাব বিশিষ্ট জীব ক্ষর পুরুষ পদবাচ্য।

**উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।**
**যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭**
**যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।**
**অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** দেহস্থিত প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ুর গমনাগমনের মাধ্যমে বা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে আগম নিগম প্রক্রিয়া চলছে তার মধ্য দিয়ে আমাদের দেহস্থিত অজপা বা আয়ু প্রতিনিয়ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। গুরূপদিষ্ট আত্মকর্মের দ্বারা আগম-নিগমরূপ এই প্রক্রিয়া উল্টো পথে চালনা করতে পারলে অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলার মাধ্যমে বায়ু যা বাইরে বেড়িয়ে যাচ্ছে তাকে অন্তর্মুখী করে বা সুষুম্নানাড়ী পথে চালনা করে কূটস্থচৈতন্যরূপী স্থির প্রাণের সঙ্গে মিলিত

করে, কূটস্থের অতীত প্রাণের বৃহৎ মহাপ্রাণ স্বরূপ পরমাত্মভাবের অবস্থায় ক্রিয়াযোগের দ্বারা অবস্থান করাতে পারলে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রারের স্থানে মনের স্থিতি হয়ে রূপাতীত নিরঞ্জন পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় আগম নিগম রূপী কোন কার্য হয় না। এই পরমাত্ম দর্শনে মনের লয় যিনি করতে পেরেছেন তিনি পরমাত্মারূপী আত্মনারায়ণ সম্পর্কে জানতে পেরে নিজেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

আগম-নিগমরূপ চঞ্চল প্রাণের মধ্যে বায়ু রূপে অজপা রয়েছে বলে তা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এই অজপাই হল ক্ষর পুরুষ পদবাচ্য। এই অজপাকে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করাতে পারলে এবং কূটস্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ক্ষরের অতীত স্থানে অবস্থান করিয়ে অক্ষররূপী স্থির আত্মাকে দর্শন করে আরও ঊর্দ্ধে সহস্রারের স্থানে মনকে লয় করিয়ে সকল কর্মের অতীত অবস্থা যখন সাধক প্রাপ্ত হন তখন তিনি পুরুযোত্তম্ পদবাচ্য এবং সেই অবস্থায় তিনি পরমাত্মার যে রূপ পরিদর্শন করেন সে সকলই পরমাত্ম পুরুষোত্তমের রূপ। এই অব্যক্ত অবস্থায় যারা উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করে আপন মনকে লয় করাতে পারেন তাঁরা সম্যক প্রকারে জ্ঞান অর্জন গুরুদেবের কৃপায় করতে সমর্থ হন এবং সকল গুহ্য তত্ত্বাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে পুরুযোত্তমের সঙ্গে মিশে আপনি পুরুযোত্তম হয়ে যান।

**যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।**
**স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।১৯**
**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।**
**এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** জীব দেহের দেহোপরে যিনি শয়ন করে আছেন, তিনিই হলেন প্রাণরূপী আত্মাতীত; ক্ষরের অতীত আবার অক্ষর অপেক্ষা উত্তম পদবাচ্য। আত্মার সঙ্গে আত্মা মিলিয়ে পরমাত্মার রূপ প্রকাশিত হয়েছে। ইনিই হলেন উত্তম পুরুষরূপী পুরুযোত্তম। প্রাণ কর্মের দ্বারা পরম রূপের তত্ত্ব যাঁর পক্ষে

জানা সম্ভব হয়.তিনি সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে সকল দেহে তাঁরই রূপ, তা দেখতে পান এবং তিনি সর্বপ্রকারে, সর্বাবস্থায় তাঁরই ভজনা করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তির কোন পাপ নেই। এরা নিষ্কলুষ নির্মল পবিত্র স্বরূপ। আত্মকর্মের দ্বারা নিজবোধগম্য রূপ এই পরম গুহ্যতত্ত্ব যে সকল ক্রিয়াযোগীর দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় সেই সকল যোগীগণ সম্যক জ্ঞানীরূপে কৃতকৃত্য হন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্য স্ত্রী পুরুষের কোন ভেদ নেই। সকল শ্রেণীর পুরুষ এবং সকল শ্রেণীর নারী মাত্রই গুরূপদিষ্ট সাধন ক্রিয়া করে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন।

**।। ইতি পুরুষোত্তম যোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

## দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ।

**অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।**
**দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।।১**
**অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।**
**দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।।২**
**তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।**
**ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩**

তাৎপর্য্যঃ— মনুষ্য দেহ ধারণ করে সাধারণ মনের বা প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মনুষ্যগণ কেবল মাত্র আপন চিন্তায় বা দেহস্থিত চিন্তায় মগ্ন হয়ে দেহজাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে সকল কাজ করে থাকে। চঞ্চল মনের বশবর্তী বলে ঐ চঞ্চলতাহেতু আপন দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ-দুঃখ, ক্রোধ, অহংকার, লালসা ও কামনা-বাসনার মধ্যে অবস্থান করে সকল কর্ম করে চলে, আত্মনারায়ণ স্বরূপ পরম গুরুদেবের রূপসকল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। সেই কারণে মৃত্যুরূপী সেই কঠিন অবস্থাকে সর্বদা ভয় করে চলে। তাই এই মৃত্যু ভয়ের জন্য তারা সাধনা পর্যন্ত ত্যাগ করে এবং ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষণিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়। চিরশান্তি ও চিরআনন্দের স্থানে তাই তাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হয়না।

গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্মের দ্বারাই একমাত্র এই পবিত্রতা লাভ করা যায়। এছাড়া অপর আর কোন উপায় নেই। প্রাণকর্মরূপী যোগকৌশলের দ্বারা আপন মনকে এই দেহস্থিত উচ্চ স্থানে যেখানে পরমাত্মার প্রকাশ, সেই স্থানে অবস্থান করাতে পারলে মনের চঞ্চলতার অবসান করানো সাধকের দ্বারা সম্ভবপর হয়ে থাকে। (তাই হে মনুষ্যরূপী জীব, তোমরা আপন দেহস্থিত কর্মসকল, যা

ইন্দ্রিয়রূপী রিপুগণের দাসত্ব দ্বারা করে থাক, তা পরিত্যাগ কর। আর কতকাল ধরে এই দাসত্ব করবে? তোমাদের কি এর হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে ইচ্ছা হয় না? সারা জীবন তো অনেক দাসত্ব করলে, একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখতো এর দ্বারা তুমি কি প্রাপ্ত হয়েছ? এর দাসত্ব করবার জন্য কত আঘাত পেয়েছ? তোমার জরাজীর্ণ দেহ আরও জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই দেহই যদি না থাকে তাহলে কর্ম করবে কি করে? ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে যা তুমি সঞ্চয় করেছ তা কি তোমার পরম শান্তি ও আনন্দ প্রদান করতে পারবে? পারবে তোমায় চির বন্ধনমুক্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে?

তাই হে মনুষ্যরূপী জীব, চঞ্চলতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে কেন জ্বালিয়ে শেষ করছো? এখনও সময় আছে, সদ্‌গুরুর সন্ধান করে তাঁর উপদিষ্ট পথে চলে দেখ তুমি সত্যিকারের সুখ শান্তি পাও কি না! জীবন, যা আজ আছে কাল হয়তো থাকবে না। তাহলে কার জন্য তোমার এ কর্ম করা? তোমার পরিবার? সেও তো তোমার দেহ যখন থাকবে না তখন তোমায় ভুলে যাবে। আর তুমি যতক্ষণ তাদের দিয়ে যেতে পারবে, ততক্ষণ তারা তোমায় আদর আপ্যায়ন করবে। আর না দিতে পারলেই তোমার মত বদমাইশ লোক আর কেউ নয়। তখন তোমায় এই তারাই, তোমার আপন রক্তের সম্পর্করূপী আপনজনেরা তাচ্ছিল্যরূপী লাথি মারবে।

তাই মনুষ্যরূপী জীব ওঠো, আপন মেরুদণ্ড সোজা করে বসো এবং গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম করে নিজেকে শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ কর। তিনিই তোমায় এই মায়ারূপী বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবেন। তিনি ছাড়া জগতে অপর কেউ তোমার বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

প্রাণকর্মের দ্বারা নিজের মনকে পরব্রহ্মে লয় করতে পারলে সকল বন্ধন তোমার ঘুচে যাবে। এরফলে তোমার দেহস্থিত ক্রোধ, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অভিমান, রাগ, লালসা ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে যাবে। তখন তুমি আপন অঙ্গুলি হেলনের দ্বারা এদের চালনা করতে সমর্থ হবে। এতদিন তুমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে এসেছ, এই প্রাণকর্মের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হলে তখন এই ইন্দ্রিয়রা তোমার

দাসত্ব করবে। মৃত্যু বিজয়রূপ এই পরমপদ লাভ হলে তবেই এই অবস্থা তোমার প্রাপ্ত হয়ে থাকে, মৃত্যুই মনুষ্যগণের ভয়ের প্রধান কারণ। মৃত্যুকে জেনে, তাকে চিনে নিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। তখন সে দৈবভাবাতীত রূপরাজ্যে বসবাস করার জন্য তাঁর যে জ্ঞান প্রাপ্তি হবে সেই জ্ঞান দ্বারা তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল বিষয় সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন। এরফলে আসুরিক ভাবে ভাবিত মন ও দৈবী ভাবে ভাবিত মনের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সকল অবস্থান করছেন তা বুঝতে পারবেন, কারণ সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হবার জন্য তিনি অন্তর্যামিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন। তাই পরমপদ প্রাপ্তিই হল মনুষ্য জন্ম গ্রহণের প্রকৃত সার্থকতা।

**দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।**
**অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪**
**দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।**
**মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পান্ডব।।৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে অবস্থান করে তাঁর কর্তৃক যে প্রাণকর্ম মনুষ্যরূপী জীবের প্রাপ্তি হয়ে থাকে সেই প্রাণকর্ম আন্তরিকতার সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। আপন বিষয়াদি চিন্তায় যেমন তুমি মত্ত থাক, সেরূপ প্রাণকর্মরূপী আত্মচিন্তায় যদি তুমি সর্বদা যুক্ত থাক তাহলে সকল কর্ম শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। অনেক সময় শ্রীগুরুদ্বারা তিরস্কার ও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হলে প্রাণকর্মীগণ আপন মনের মধ্যে নানারূপ রাগ, অভিমান, দ্বেষ ইত্যাদি পোষণ করে থাকেন, যা কখনই উচিত নয়। শ্রীগুরুর কাছে এই লাঞ্ছনা ও তিরস্কার সর্বদা জানবে তোমার পুরস্কার স্বরূপ। কারণ তিনিই হলেন পরব্রহ্ম। তাঁর কাছে সাধারণ জীবের কোন মান নেই, অপমান নেই, ভয় নেই, লজ্জা নেই। কারণ তিনি এমনই একজন পুরুষ যার কাছে নির্দ্বিধায়, বিনা বাধায় মনের সকল কথা, এমনকি সকল নির্লজ্জ কথাও বলা হয়ে থাকে বা বলা যায়, কারণ তিনি এমনই একজন ব্যক্তি যিনি শুধু জীবের ভাল কি করে হয়, কিকরলে তাঁর আত্মিক উন্নতি হয় সেদিকেই সর্বদা দৃষ্টি রেখে চলেন। তাই নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে সকল কথা ব্যক্ত করা যায়।

এবং তিনি সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য তিরস্কার, লাঞ্ছনা যা সাধককে দিয়ে থাকেন, এই লাঞ্ছনা তিরস্কার হেতু সাধকের মনের মধ্যে যদি রাগ, দ্বেষ, অভিমান ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তা হলে সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ সাধক আত্মক্রিয়ায় যতটুকু উন্নতি করতে পারেন, ততটুকু শ্রী গুরুদেবের কৃপায় হয়ে থাকে। মনুষ্যরূপী চঞ্চল জীবের দ্বারা এই কর্মকরা শ্রীগুরু ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়। তাই মনকে সংযমতার দ্বারা বাঁধতে হবে। অহেতুক ক্রোধ, রাগ, অভিমান ইত্যাদি বস্তু শ্রীগুরুর উপর প্রয়োগ করা কখনই উচিত নয়। সর্বদা মনে রাখবে তিনি স্থির প্রাণ, তিনি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। অধিক শীতলতার দরুণ পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক সরোবর বরফে পরিণত হয়, তিনি সেই সরোবর রূপী বরফ স্বরূপ। তাঁর দিকে রাগ, অভিমান রূপী একটি ছোট নুড়ি পাথর ছুড়লে তা ছিটকে বেরিয়ে যায়। তারমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনা; তাই যদি তুমি রাগ, অভিমান, দ্বেষ দেখাও, তবুও তিনি স্থির থাকেন। এসব দেখিয়েও তাঁকে টলানো যায় না। এইরূপ ভাবে যদি তুমি চলতে থাক তাহলে ভবিষ্যতে তুমি এমন চরম আঘাত পাবে যার দরুণ তুমি আর কোমর সিধা করে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর কৃপা হলে তুমি রজঃ-তমঃরূপী বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে। ভয়, দুঃখ, শোক ইত্যাদির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হবে এবং দেবী সম্পদ দ্বারা তুমি জয়লাভ করতে পারবে এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হতে সমর্থ হবে।

তাঁকে ভরসা করে বিশ্বাস করে তাঁকে সবকিছু অর্পণ করে তুমি যদি পথ চলতে পার তাহলে তুমি পঙ্গু হলেও পর্বত শিখরে অবস্থান করতে পারবে।

তাই আন্তরিক ভাবরূপ ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এই সকল দয়াহীন আসুরিক সম্পদের অধীশ্বর না হয়ে তাঁকেই একমাত্র সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে জ্ঞান করে তাঁর দাসত্ব কর। তাহলে অর্থাৎ সেই দাসত্ব সঠিকরূপে করতে পারলে তিনি তোমায় কোলে তুলে নেবেন। তিনি তোমার মুখ থেকে একবার পিতা বলে ডাকটি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, সেই ডাক শুনতে পেলে তিনি তোমাকে আপন বক্ষে স্থান দিয়ে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে

ধরবেন। তিনি ব্যতীত এই জগৎ সংসারে তোমার আপনজন, তোমার বন্ধু, তোমার প্রিয়তম আর কেউ নেই।

**দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।**
**দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬**
**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।**
**ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** ইহলোকের প্রাণীগণ বা মনুষ্যগণ অসুররূপী ও দৈবীরূপী এই দুই ভাবের মধ্যে অবস্থান করেন, অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্ব-রজোগুণের প্রভাব বিস্তার করে, তাদের মধ্যে এই অসুরভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ দেহ চিন্তায় তারা মগ্ন থাকে।

যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের ভাব বিস্তারলাভ করে তাদের মধ্যে দৈবী ভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ তাঁরা ঈশ্বর চিন্তায় বা আত্মচিন্তায় অবস্থান করেন। এই অসুর প্রকৃতিরা (প্রবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে রত থাকে। নিবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল রহিত অবস্থায় থাকা) এই সকল বিষয় সমূহ জানতে পারে না। কারণ রজো ও তমগুণের মধ্যে তারা বসবাস করে বা ঈড়া, পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে তাদের শ্বাস গতায়াত করে। এই ঈড়া-পিঙ্গলার অবস্থা ছেড়ে যখন সুষুম্নামার্গে শ্বাস প্রবেশ করে তখন সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়ে মনুষ্যগণ দৈবী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, তখন তারা ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বকে অনিত্য বলে মনে করে। ঈড়া, পিঙ্গলার মধ্যে অবস্থান করবার জন্য যারা প্রবৃত্তির মধ্যে আটকে থাকে তাদের মধ্যে কোন শুচিতা পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত পবিত্রতা প্রকৃত নিয়ম কি, তা তারা জানে না। তাই জগতের মধ্যে অনিত্যরূপী সকল মিথ্যাকেই তারা সত্য বলে মনে করে, সেইহেতু তারা আত্মকর্মরূপী নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে চায় না।

**অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।**
**অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কাম হৈতুকম্।।৮**

**এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্প বুদ্ধয়ঃ।**
**প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।৯**
**কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।**
**মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌ গ্রাহান্‌ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।১০**

**তাৎপর্য্যঃ—** অসুর ভাবাপন্ন হয়ে থাকার জন্য সাধারণ মনুষ্যগণ পরব্রহ্মের মূল কারণ স্বরূপ সত্যতাকে অস্বীকার করে এবং বেদ ও পুরাণাদির অস্তিত্বকে মানতে চায়না। ঈশ্বর বলে যে কোন বস্তু আছে বা ধর্মের যে কোন ব্যবস্থা আছে তা তারা অলীক কথা বলে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রী পুরুষের অবয়ব কাম জনিত মৈথুন কার্য করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে তৎব্যতীত অপর কিছু নয় তা বিশ্বাস করে চলে। এইরূপে অল্পবুদ্ধি পোষণ করে সাধারণ মনুষ্যগণ চলে বলে কর্মফল বন্ধনে বদ্ধ হয়ে বারংবার দেহ ধারণ করে চলে এবং সংসারে যাতায়াতরূপী আবর্তনের মধ্যে আবর্ত্তিতই হতে থাকে। প্রাণকর্ম না করার জন্য বিকৃতমস্তিষ্করূপী এই সকল মানুষ শুধু দেহের ক্ষয়ই সাধন করে থাকে। আর এভাবে ক্ষয় করতে চায় বলেই তারা বারংবার দেহ ধারণ করে জগৎ সংসারে উদ্ভূত হয়। কাম রিপুর দ্বারা অসীম কামনায় মনের মধ্যে নানারূপ আশা শুধু পোষণ করে, পুরণ করা তাদের দ্বারা আর সম্ভব হয়না। অভিমান ও গর্বে আবিষ্ট হয়ে দেবতার আরাধনা করে মহানিধি প্রাপ্ত হব এইরূপ দুরাশা করে অশুচিবৎ অকার্যে ব্রতী হয়। অশুচিবৎ অকার্যে ব্রতী হবার জন্য প্রকৃত কার্যরূপী শুচিতা বা পবিত্রতা তাদের দ্বারা প্রাপ্ত হয় না। চরকির মত কেবলমাত্র আবর্তন তাদের দ্বারা সাধিত হয় এবং দুর্দমনীয় কামনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শুধু মাত্র লম্ফঝম্ফই হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। এই সকল ব্যক্তি প্রকৃত বাঁদর পদবাচ্য।

**চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।**
**কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ।১১**
**আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।**
**ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২**

**ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।**
**ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩**
**অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।**
**ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।।১৪**
**আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কো ঽন্যো ঽস্তি সদৃশো ময়া।**
**যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫**
**অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।**
**প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।।১৬**

**তাৎপর্য্যঃ**— পূর্ব শ্লোকোক্ত এই সকল কামান্ধ ব্যক্তিগণ কামনার বশবর্তী হয়ে কামভোগের উদ্দেশ্যে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে যাতে অধিক অর্থ উপার্জন করে সঞ্চয় করা যায় তার দিকে বিশেষরূপে সচেষ্ট হন। তারা এই কাম ভোগরূপী আশা পূরণের জন্য ছল, বল ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে এবং এই ভাবে ছল, বল ও কৌশলের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করতেও পিছুপা হয় না। মদ, গাঁজা ইত্যাদি সেবন করে আপন জীবন-যৌবনকে উপভোগ করে। সত্যই কি তাদের পক্ষে তা উপভোগ করা যায়? দিনে দিনে এই সকল নেশাখোরেরা আপন জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাল অমোঘ, তাই এই জীবন-যৌবন ধরে রাখা যায় না। ইন্দ্রিয়সেবী কামভোগে আসক্ত এই সকল ব্যক্তিদের দ্বারা গুণ্ডামি, লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই সকলের দ্বারা তারা নিজের কামরূপী উদর পরিপূর্ণ করার দিকে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে থাকে। কামনারূপী এই কাম থেকেই ক্রোধের জন্ম হয়, সেহেতু অর্থ সংগ্রহের জন্য অপরের জীবন ধ্বংস করতে বা কাউকে খুন করতে পর্যন্ত পিছুপা হয়না। সর্বদা এই সকল চিন্তাকে আশ্রয় করে চলে। আজ আমার কত লাভ হল, ওকে মারলে কত লাভ হবে, আরও টাকা কি করে পাব. এই সকল চিন্তায় ভাবিত হয়ে থাকে, সেহেতু বর্তমান যুগের মানুষগণ এই আসুরিক ভাবে অধিক ভাবিত হওয়ার জন্য এবং অপরের পয়সা মেরে সহজে বড়লোক হওয়ার জন্য খুন খারাপি, লুঠতরাজ, চুরি ডাকাতি বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও

বাড়বে। কারণ তাদের মন ভ্রান্তিরূপ মোহ জালে আবদ্ধ। সেহেতু আমিই ঈশ্বর, আমিই বলবান, আমিই সিদ্ধ এই সকল বলে নিজের গর্বে অহংকারের এক ফলাও প্রতিমা তৈরী করে। এই সকল ব্যক্তি কামভোগের দ্বারা আসক্ত হবার জন্য নানারূপ নখ দন্ত বিস্তার করে বিশেষ বাহাদুরি দেখিয়ে থাকে। এই সকল জীবের ফল ভবিষ্যতে চরমরূপে আঘাত হানবে এবং অজ্ঞানতারূপ নরকে পড়ে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে। সেই যন্ত্রণাময় দুঃখের হাত থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। একাই সেই দুঃখের ভাগী হয়ে ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নরকে অবস্থান করবে।

**আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।**
**যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্।।১৭**
**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।**
**মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বি ষন্তোঽভ্যসুয়কাঃ।।১৮**
**তানহং দ্বিসতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।**
**ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯**
**আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।।**
**মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** আসুরিক ভাবাপন্ন এই সকল ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, দর্প, আসুরিক বল, অহংকার ইত্যাদি অবলম্বন করে আমি কর্ত্তা, আমিই পণ্ডিত এইরূপ ভাবে গর্বিত হয়ে অপর সকলকে কষ্ট দিয়ে থাকে এবং অপরের কাছ থেকে হরণ করা অর্থ নিয়ে সে বিশেষ ধনবান, এই প্রকার দম্ভ সহকারে অপর সকল ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে থাকে এবং সাধুদিগকে নানারূপ দোষারোপ করে। সাধুরা যে পথে চলতে বলেন এরা সর্বদা তার উল্টো পথে চলে। এই সকল ব্যক্তিদের মন সর্বদা পশুভাবে লিপ্ত হয়ে থাকে। এর ফলে তারা সেই অধঃদেশে পড়ে থাকে, এবং মৃত্যুর পর পশুযোনি প্রাপ্ত হয় এবং জন্ম জন্মান্তর ধরে পশুযোনিতেই অবস্থান করে অর্থাৎ যতবারই জন্মগ্রহণ করে ততবারই পশু যোনি প্রাপ্ত হয়, এই সকল অধম জীবেরাই শুধুমাত্র জন্ম জন্মান্তর ধরে

পশুযোনি প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যযোনি এরা আর প্রাপ্ত হয় না। প্রাণকর্ম পেয়ে যদি কেউ প্রাণকর্ম ত্যাগ করে উপরিউক্ত ভাব পোষণ করে, তাহলে তাদেরও একই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র সদগুরু লাভ হয়ে থাকে বলে এদের দ্বারা জন্ম জন্মান্তর ধরে পশুযোনি প্রাপ্ত হবার পর হয়ত কোন এক সময় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হলেও হতে পারে। কিন্তু সে সকল মনুষ্যগণ জন্মগত বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী শ্রেণীর যোনি প্রাপ্ত হতে পারে, বা মনুষ্য যোনি ধারণ করে মাতৃগর্ভেই অথবা ভূমিষ্ঠ হবার পর দেহান্তর হয়ে থাকে।

**ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।**
**কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১**
**এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।**
**আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটিই হল সাধকের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রাণ বায়ু ৪৯ আখ্যা ধারণ করে এই দেহকে চালাচ্ছেন। দেহের মধ্যে অশান্তিকর এই তিনগুণ অধিক হলে সাধকের দ্বারা আর প্রাণকর্ম হয় না, তখন সাধক প্রাণকর্ম ভ্রষ্ট হয়ে নরকের পথে গমন করে। এই সকল ব্যক্তির দ্বারা স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বরূপ গুরুদেব লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে থাকেন এবং তারা লাঞ্ছনা ও অপমান করে গুরুগৃহ এবং গুরুদেবকে পরিত্যাগ করে। সেই সকল ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সদ্‌গুরুর দর্শন হয় বটে কিন্তু তা মৃত্যুগামী মানুষ কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবে তাঁকে দেখতে পায়। বিশ্বাস মনের মধ্যে না থাকার জন্য বা তাঁকে ত্যাগ করার জন্য সেই সকল ব্যক্তিও পরজন্মে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

সদ্‌গুরু প্রদর্শিত প্রাণকর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে জন্মের পূর্বে যে স্থানে যুক্ত হয়েছিলাম, সেই স্থানে যুক্ত করে রাখতে পারলে ইন্দ্রিয়সকল, রিপুত্রয় ইত্যাদির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর হয় এবং এই সকল দেহস্থিত শত্রুদিগের সঙ্গে প্রাণকর্মরূপী যুদ্ধ করে জয়লাভ করা যায়। এই কাম বা কামনাই হল সকল কামনার উৎস। এই কামনা হতে ক্রোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তখন মনুষ্যগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে এই ক্রোধহেতু

আপন দেহকে আপনিই নাশ করে থাকে বা আত্মহত্যা করে থাকে। তাই কাম, ক্রোধ ও হিংসার দ্বারা লোভের জন্ম হয়। সেই লোভ পূরণে কোনরূপ আশাহত হলে মনুষ্যগণ উপরিউক্ত রূপ আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করে।

প্রাণকর্মরূপ প্রাণের সন্তোষের দ্বারা কামনা, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি রহিত ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিন রিপুত্রয় জীবকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে ফেলে। তাই এই রিপুত্রয় আত্মজ্ঞান প্রকাশ নাশক। তাই প্রাণকর্ম করে গুরূপদিষ্ট পথে চলতে গেলে অবশ্যই এই তিন রিপুকে দমন করতে হবে।

সংসারই হল আমাদের কাছে বিশেষ নরক স্বরূপ। কারণ এর দ্বারা মনুষ্যগণ অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে, কারণ সংসাররূপী অরণ্যের মধ্যে পড়ে মোহ-মায়ায় যুক্ত হয়ে এই রিপুত্রয় হতে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। তাই কর্ম করে তাঁর সাথে যুক্ত হবার রাস্তা একমাত্র সদ্‌গুরুই বলতে পারেন এবং তা হল প্রাণকর্ম।

উপরিউক্ত রিপুত্রয়কে দমন করে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ রূপে মুক্ত হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে বা মঙ্গলরূপ প্রাণকর্ম করতে সমর্থ হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হন। কর্মের দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে বিচরণ করেন)

**যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।**
**ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩**
**তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।**
**জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** শাস্ত্ররূপী গ্রন্থপাঠ করে শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে সঠিক মীমাংসা মহা পণ্ডিতগণও করতে পারেনা। তাই গ্রন্থ পাঠ করে কোন বিষয়ের মীমাংসা হয় না। সেহেতু বর্তমান মনুষ্যগণ আপন ইচ্ছা মত সকল বিধি, বা বিধান নির্মাণ করে তাঁর মতের অনুকূলে কার্য্য করিয়ে থাকেন।

শাস্ত্রের মধ্য হতেতার বিধান সমূহ উদ্ধার করতে হলে শাস্ত্রের সারাংশটুকু নেওয়া উচিৎ। বড় বড় পণ্ডিতের দ্বারা শাস্ত্রবিধির সকল সারাংশ প্রকাশ করা হয় না বা তারা করতে পারেন না বা জানেন না। সঠিক শাস্ত্রের সারাংশ যিনি প্রকৃত রূপে কর্মে সিদ্ধ হয়েছেন বা সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই সকল যোগী ব্যক্তির দ্বারাই এই সকল শাস্ত্রের সারাংশ করা সম্ভব, কারণ সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হবার জন্য তিনি বেদ শাস্ত্রাদি গুলে খেয়েছেন। তাই সদ্গুরুরূপী যোগী ব্যক্তিরাই এই শাস্ত্রের সারাংশ সম্পর্কে বলতে পারেন।

এই অবস্থা প্রাপ্ত না হলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই গুরুবাক্য পালন না করে আপন ইচ্ছা মত কার্য করলে প্রাণকর্মী যোগভ্রষ্ট রূপ বা ভ্রষ্ট প্রাণকর্মী রূপে পরিগণিত হয়ে পূর্বশ্লোকোক্তরূপে নরকে গমন করে। তাই সদ্গুরুই হচ্ছেন একমাত্র পণ্ডিত, জ্ঞানী ও যোগী পদবাচ্য।

।। ইতি দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ সমাপ্ত ।।

—ঃ ইতি ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

## শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

যে শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্যযজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকা রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যে যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪

তাৎপর্য্যঃ— পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত যে সকল ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে গ্রাহ্য করেন না কিন্তু আপন ইচ্ছানুযায়ী পূজা করেন, সেই সকল ব্যক্তির মনের ভাব অনুসারে তার দেহস্থিত শ্রদ্ধা দেখানো হয়ে থাকে। (আত্মভাব থেকে জাত যে শ্রদ্ধা সাধক প্রকাশ করে সেই শ্রদ্ধাই হল প্রকৃত শ্রদ্ধা কারণ মন তখন সত্ত্বগুণে থাকে, তাই এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধারূপে পরিগণিত হয়) সেইরূপে যে সকল ব্যক্তির মন রজঃ ও তমঃগুণে থাকে সেই সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধা যথাক্রমে রাজসিক শ্রদ্ধা ও তামসিক শ্রদ্ধা রূপে পরিগণিত হয়, অর্থাৎ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হল প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্ম করতে করতে সাধকের প্রাণবায়ু যখন সুষুম্না মার্গে চালিত হয়ে সাধককে একাগ্রচিত্ত করে তোলে তখন তাঁর বহিঃশ্বাস ছোট হতে হতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন সকল পূজাদি এই সাধকের দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে করা সম্ভবপর হয়। এই সম্পূর্ণ একাগ্র হয়ে নিরোধমুখী হয়ে প্রাণায়ামরূপী পরম আন্তরিকতার সঙ্গে যখন সাধকের পূজা করা সম্ভব হয়, তখনই ঈশ্বরের প্রতি বা পরম গুরুদেবের প্রতি সঠিকরূপে শ্রদ্ধা জানান সম্ভবপর হয়ে থাকে। এইরূপ শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী বলা হয়। আত্মকর্মে

তন্ময় না হলে এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধকের দ্বারা জানা সম্ভবপর নয়।

আবার যে সকল ব্যক্তি, 'আমাকে দেখলে সবাই অভিবাদন করবে, সম্মান করবে, উত্তম ভোজন দেবে, এবং বহু সকল দান সামগ্রীর তালিকা তৈরী করে সেই সকল বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা করেন, সেই সকল পূজা তামসিক পূজা অর্থাৎ বিনা সাধনায় কতগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করে আপন নাম কেনার উদ্দেশ্যে পূজা করা, এর ফলে তাদের শ্রদ্ধা ঈশ্বরের চেয়ে কাম্যবস্তুর প্রতি অধিক হয়ে থাকে, তাই ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ চঞ্চলতার জন্য স্থায়ী ফললাভ করা সম্ভব হয়না। এই সকল ব্যক্তি যে শ্রদ্ধার দ্বারা পূজা করে থাকে সেই শ্রদ্ধাকে রাজসী বলা হয়।

আবার কেউ কেউ অপরের সর্বনাশ করার জন্য, বড় ধরনের কোন ফল লাভ করার আশায় মনের মধ্যে নানারকম ঐ ফল প্রাপ্ত হবার জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পূজা অর্চনা করেন; সেই সকল পূজা অপরের অনিষ্ট করার জন্য বা কোন বড় ফল লাভের জন্য বা বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই সকল কামনা থেকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য তারা ভগবানের পূজা অর্চনা করে। এই সকল শ্রদ্ধা তমগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে করে থাকে, তাই এই সকল শ্রদ্ধাকে তামসী বলা হয়ে থাকে।

সদ্‌গুরুর কাছ থেকে আত্মকর্মরূপ যোগক্রিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে করতে পারলে সঠিকরূপে শ্রদ্ধা, ভক্তি সাধকের দ্বারা ঈশ্বররূপী গুরুদেবের নিকট প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

ভালের সঙ্গে রত হয়ে কূটস্থচৈতন্যে আপন প্রাণকে স্থির করে যে সকল সাধক চলতে পারেন, তাদের সংস্কার সেরূপ উচ্চস্থানে অবস্থান করে। তাই যেসকল ব্যক্তি পূর্বজন্মাকৃত কর্মের সংস্কার নিয়ে যে যে ভাবে অবস্থান করেন, তার দ্বারা তার এই দেহস্থিত সংস্কার থেকে সেইরূপ শ্রদ্ধা অনুযায়ী পুরুষোত্তম গুরুদেবের নিকট দেখানো সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ"। এর ফলে গুরুদেবরূপী স্থির দর্পণে তুমি যে রকম আপন রূপ বা ভাব দেখাবে, তুমিও সেইরূপ রূপ বা ভাব তার কাছ থেকে

পাবে।

প্রকৃত দেবগণের আরাধনা হল আমাদের দেহস্থিত ৪৯ বায়ুর আরাধনা, অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বায়ুর প্রাণকর্মরূপী উপাসনাই হল প্রকৃত দেব আরাধনা। আত্মকর্মে সিদ্ধ হয়ে সাধনোচিত ধামে বা তত্ত্বাতীত পদে সাধক সিদ্ধিলাভ করতে পারলে তবেই প্রকৃত ধনরূপী আত্মধন লাভ করা যায়। সাধারণ মনুষ্যগণ মূর্ত্তি গড়ে যে সকল দেব দেবীর পূজা করে তা সুরের পূজা বলে পরিগণিত হয় না। তা সকলই অসুর পূজা পদবাচ্য। প্রকৃত তত্ত্বত তাঁকে না জানার জন্য টাকা পয়সা ইত্যাদি ধন কামনায় এই সকল অসুররূপী জড়েরা পূজা করে থাকে। আবার ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি বুজরুকিরূপ পূজাও করে থাকে। এতে প্রাণের চঞ্চলতা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

**অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরংতপস্তে যে তপো জনাঃ।**
**দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫**
**কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।**
**মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাসুরনিশ্চয়ান।।৬**
**আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।**
**যজ্ঞসপ্তস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭**
**আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।**
**রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।৮**
**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।**
**আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯**
**যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।।**
**উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ**—(দম্ভ, অহংকার, কামনা, বাসনা ইত্যাদির হেতু যে সকল ব্যক্তি আপন অভিলাষ পূরণের জন্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি দেবতার নিকট প্রদর্শন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেউ কেউ আবার নির্জ্জলা উপবাস করে বা সাধারণ উপবাস করে আপন দেহকে ক্লেশ দিয়ে ঈশ্বরের পূজা অর্চনা করে।

শাস্ত্রে এইরূপ বিধি কোথাও উল্লেখ নেই। পরমাত্মরূপী আত্মনারায়ণ স্বয়ং এইদেহে বিরাজ করছেন তাই আপন দেহস্থিত আধারকে ক্লেশ দেওয়ার অর্থই হল আপন গুরুদেবকে ক্লেশ দেওয়া। দেহস্থিত রিপুত্রয় এবং বায়ুসকল তাই আপন কার্য্য খাদ্যাভাবে বিশেষরূপে না করতে পারার জন্য নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই যা কিছু তাঁর হতে সৃষ্ট, সেই সকল কিছুর মধ্যে তাঁরই উপস্থিতি, তাই উপবাস করে ঈশ্বর সাধনা বা প্রাণের সাধনা কখনই করা সম্ভব নয়। উপবাস কথার অর্থ হল উপরে বা কূটস্থে, বাস কথার অর্থ হল অবস্থান করা বা ঐ অঞ্চলে স্থির থাকা। তাই যে সকল সাধক আপন দেহস্থিত কূটস্থে প্রাণকে স্থির করতে সমর্থ হয়েছেন, তাদের দ্বারাই সঠিক উপবাস করা হয়ে থাকে।

খাদ্য গ্রহণ/ত্যাগ করে উপবাস শাস্ত্র সম্মত বিধি নয়। খাদ্য গ্রহণ করে আপন আত্মাকে পরিতৃপ্ত করলে তবে আত্মক্রিয়ারূপ কর্মের দ্বারা বায়ুকে স্থিতিপ্রাপ্ত করিয়ে সাধনা করা সাধকের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। মনুষ্যগণের মধ্যে তিন প্রকারের ভাবের দ্বারা খাদ্যগ্রহণের রুচি হয়ে থাকে (১) সাত্ত্বিক আহার (২) রাজসিক আহার (৩) তামসিক আহার।

(১) **সাত্ত্বিক আহার ঃ—** সাত্ত্বিক আহার হল যোগীগণের ভোক্ষ্য। যেমন ভাত, ডাল, ঝোল, তেতো, কাঁচাকলা, পেঁপে (পাকা ও কাঁচা) দুধ, ঘি, মাখন, ক্ষীর, পায়েস, ফল, মধু ইত্যাদি।

(২) **রাজসিক আহার ঃ—** খুব কড়া করে যে সকল দ্রব্য রন্ধন করা হয়। অধিক ঝাল, অধিক টক, তেলে ভাজা, ঘিয়ে ভাজা দ্রব্য, অত্যধিক নুন, গরম গরম দ্রব্য ইত্যাদি সকল আহার রাজসিকগণের ভোক্ষ্য।

(৩) **তামসিক আহার ঃ—** পান্তা ভাত, বাসিরুটি, বাসি তরকারি, বহুক্ষণের কাটা ফল, অপরের পাতের খাবার, সকল প্রকার ভোজ্য দ্রব্য, মদ, মাংস ইত্যাদি তামসিকগণের ভোক্ষ্য।

**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।**
**যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১**
**অভিসন্ধ্যায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।**

**. ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২**
**বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।**
**শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩**

**তাৎপর্য্যঃ**— ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে প্রাণযজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মায় মন সমর্পণ করতে পারলে সকল শাস্ত্র সম্পর্কে এবং সকল বিধি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সাধকের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। সঠিক উপায়ে বিধিসম্মত ভাবে গুরূপদিষ্ট পথে একান্তভাবে প্রত্যহ কর্ম করতে হবে। একদিন করলাম আর অপরদিন বাদ দিলাম, এইরূপ ভাবে কার্য্য করলে প্রাণকর্মরূপী কাজে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। প্রত্যহ একই ভাবে কার্য্য করতে হয়। আজ পূজা করে এই দর্শন হয়েছে, কাল পূজা করে ঐ দর্শন হয়েছে, এইরূপ কার্য্য করলে মনের মধ্যে নানারূপ অহংভাব প্রকাশ হয়ে থাকে, যার দ্বারা এই সকল কার্য্য সিদ্ধ হচ্ছে সেই পরমগুরুদেবের সম্মুখে দেমাকরূপী এই সকল বাক্য প্রয়োগ করে কেবল বাহাদুরি দেখানোই সম্ভব হয়। তখন তার ঐ সকল কর্ম বারোয়ারি পূজার মত হয়ে যায় এবং তার ঐ যজ্ঞ বা কর্ম রাজসিক কর্ম বা যজ্ঞ বলে পরিগণিত হয়।

সাধারণ পুরোহিতরূপী ব্রাহ্মণগণ আপন কামনা-বাসনা জনিত চাল, ডাল, কলা, মূলো, কাপড়, গামছা ইত্যাদি পাবার উদ্দেশ্যে বিশাল পূজার তালিকা প্রস্তুত করে সাধারণ মনুষ্যদিগের নিকট প্রেরণ করে। তাদের দ্বারা ঐ সকল ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিয়ে দেবতার মূর্ত্তির সামনে জোরে জোরে নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজার ভাঁড়ামি দেখায় এবং পূজা হয়ে গেলে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা ও কামনাকৃত ঐ সকল বস্তু বগলদাবা করে চম্পট দেন। নির্দিষ্ট শ্রেণীর পৈতেধারী পুরোহিত পদবাচ্য ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ সকল পূজা অর্চনা হয়ে থাকে। এটা প্রকৃত পূজা অর্চনার বিধি নয়। শাস্ত্রে যে বিধি দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা অর্চনা হয়ে থাকে। সেই সকল ব্রাহ্মণ হল যাদের ব্রহ্মপদ লাভ হয়েছে— কোন পৈতেধারী পুরোহিতের কথা বলা হয় নি।

ঐ সকল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণরাই প্রকৃত পুরোহিত পদবাচ্য। পুরোহিত কথার অর্থ হল, যার দ্বারা সকল কার্য্যের পৌরহিত্য করা সম্ভব হয়। একমাত্র

পরম সদ্‌গুরুদেবই সকল বিষয় সমূহের জ্ঞান অর্জন করে পরমাত্মারূপী পরমকর্ত্তার সঙ্গে মিলে পরম কর্ত্তারূপে অবস্থান করছেন। তাই তাঁর দ্বারাই সকল কার্য্যের পৌরহিত্য করা সম্ভবপর হয়। প্রাণকর্মের মাধ্যমে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিই হল সাধকের প্রকৃত দক্ষিণা। হাতে গোনা টাকা পয়সা প্রকৃত দক্ষিণা পদবাচ্য নয়। পরম গুরুদেব চান জীবের ইন্দ্রিয় দমন করে ইচ্ছা, আসক্তি ইত্যাদির নাশ করে সাধককে সঠিক পথ দেখিয়ে সাধনায় উত্তীর্ণ করাতে। তাই তাঁর দ্বারাই পূজা অর্চনা হয়ে থাকে।

সেই জন্যই পরমগুরুদেবরূপী আত্মনারায়ণ বলেছেন "**যে করে আমার আশ (আত্মক্রিয়া) তার করি আমি সর্বনাশ (ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, আসক্তি ইত্যাদির নাশ) তবু ও যে না ছাড়ে আমার আশ, তার আমি দাসানুদাস (পরম গুরুদেবের সঙ্গে মিলে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে তাতেই মিশে যান)**"।

**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।**
**ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্চতে।।১৪**
**অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।**
**স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে।।১৫**
**মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।**
**ভাবস্যং শুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।।১৬**
**শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।।**
**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** আজ্ঞাচক্রের স্থানই হল 'শূন্যধাতু ভবেৎ প্রাণঃ।" এই আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করতে পারলে বহির্লক্ষ্যে আর দৃষ্টি যায় না। তখন অন্তর্লক্ষ্যে কূটস্থচৈতন্যরূপী আত্মনারায়ণকে পরিদর্শন করে বহির্লক্ষ্যের সকল প্রতিমাকে তন্মধ্যেই সাধক দর্শন করে থাকেন, অর্থাৎ বহির্লক্ষ্যে যে সকল রূপক প্রতিমা দেখা যায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে সাধক সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তাই স্থির অন্তর্লক্ষ্যরূপী প্রাণরূপ কূটস্থে যাঁর জ্ঞান হয়েছে সেই সকল ব্যক্তি প্রতিমা পূজায় আবদ্ধ হন না। অন্তর্লক্ষ্যে যাঁর ভেতর বাইরে শুদ্ধ হয়েছে, সেইরূপ

যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকাররূপ অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ এইরূপ দর্শন করিয়ে থাকেন, সেইরূপ গুরুর কাছে গিয়ে আত্মধর্ম পালনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মতত্ত্বরূপ জ্ঞান অর্জন করে তত্ত্বজ্ঞানী পদবাচ্য হন। এর ফলে তাঁর শুচি, অশুচি এই সকল বোধ দূরীভূত হয়ে যায়। মন-প্রাণ এক হয়ে গিয়ে ভেতর-বাইরে এইরূপ ভেদ আর থাকে না। সদাই ব্রহ্মে বিচরণ করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। এই সকল ব্যক্তি সদা সর্বদা সত্যপ্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রীতিপদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনাই হল প্রকৃত বেদাভ্যাস এবং তাঁর মুখনিঃসৃত এই সকল হিতকর বাক্য হল বচন স্বরূপ। ভগবান আত্মনারায়ণরূপী গুরুদেব যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন তাকে সেই অবস্থায় তুষ্ট করা প্রতি সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। মনকে সর্বদা সরল বা স্থির রাখলে মনের সংযম ভাব এসে থাকে। মনের চঞ্চল ভাবকে সংশোধন করে স্থিরভাবে পরিণত করাই হল মানসিক তপস্যা।

শারীরিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা এবং বাক্যময় তপস্যা— এই তিন প্রকারের তপস্যাই শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ফলাকাঙ্ক্ষা এবং কামনাশূন্য হয়ে আত্মাতে অবস্থান করে করতে হবে। কণ্ঠের নিচে যখন প্রাণ থাকবে তাকে আত্মক্রিয়ারূপী প্রাণকর্মের দ্বারা ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করবার উদ্দেশ্যে যে তপস্যা করা হয় তাই হল শারীরিক তপস্যা। কণ্ঠের ঊর্দ্ধে প্রাণ অবস্থান করলে তখন জীবদেহের শরীর শবদেহে পরিণত হয়, আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে গুরুমুখী প্রাণক্রিয়ার দ্বারা প্রাণকে পরমপদে লীন করাই হল মানসিক তপস্যা। এতে মন সর্বদা গুরুমুখী চিন্তায় মত্ত হয়ে থাকে। পরম গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করে তদুদ্দেশ্যে সাধকগণ যখন শ্রদ্ধা সহকারে আত্মকর্মে ব্রতী হন এবং সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তা বাক্যময় তপস্যা। এই সকল তপস্যা নিষ্কাম ভাবে হয়ে থাকে, তাই এই ত্রিবিধ তপস্যাকে গুরুমুখী বিদ্যারূপী প্রাণক্রিয়া বা সাত্ত্বিক তপস্যা বলে।

**সৎকারমানপুজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।**
**ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮**
**মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।**
**পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।।১৯**

**দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিনে।**
**দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০**

**তাৎপর্য্যঃ—** দম্ভ, অহংকার ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে আপন সম্মান কেনার জন্য যে লোক দেখানো তপস্যা করে থাকে, তা রাজসিক তপস্যা বলে বিবেচিত হয়। কামনা-বাসনা হেতু পরের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে যে সকল তপস্যা হয়ে থাকে, তা তামসিক তপস্যা বলে পরিগণিত হয়। কর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে শ্রীগুরুর পদতলে অর্পণ করিয়ে যে সকল ব্যক্তির দ্বারা সৎকর্ম করা হয়ে থাকে এবং কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, সেই সকল তপস্যা সম্পূর্ণ গুরুমুখী তপস্যা। এই তপস্যা করে যাঁরা আত্মতত্ব বিদিত হতে পারেন তারা সাত্ত্বিক তপস্যা করেন।

কাউকে কোন বস্তু দান করলে (কামনা, বাসনা জর্জ্জরিত চিত্তে) তা অহংকারের প্রকাশ হয়ে থাকে, সেই সকল দান প্রকৃত দান পদবাচ্য নয়। পরমগুরুদেবের নিকট হতে শিষ্য সদ্‌গুরু সমীপে যে অমূল্য রতন প্রাপ্ত হয়ে থাকে, শিষ্যের সদ্‌গুরুর দ্বারাই সেই প্রাণকর্মরূপী অমূল্য রতনই হল পরমগুরুদেবের প্রকৃত দান। এই দান প্রাপ্ত হতে জীবের দুর্গতি হয় না। উপদেশ দানের মাধ্যমে দুর্গতির নাশ হয়ে থাকে। উপদেশ কথার অর্থ হল — উপ অর্থাৎ উপরে বা সমীপে, দেশ অর্থে স্থান। গুরুদেবের দ্বারা সেইস্থান সাধারণ জীবদ্বারা যখন প্রাপ্ত হয় তাই উপদেশ স্বরূপ। এই দানই হল প্রকৃত সাত্ত্বিক দান।

**যত্তু পত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।**
**দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১**
**অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।**
**অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২**
**ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।**
**ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩**
**তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।**
**প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদীনাম্।।২৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** সদগুরু দ্বারা যে প্রাণকর্ম দান হয়ে থাকে, তাই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান পদবাচ্য। অপর সকল দান ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা হেতু হয়ে থাকে বলে রাজসিক ও তামসিক দান পদবাচ্য, অর্থাৎ মনক্ষুণ্ণ অবস্থা হেতু বা দান করতে অনিচ্ছা, কিন্তু তবুও দান করতে হচ্ছে। এইরূপ দান রাজসিক দান পদবাচ্য।

আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়ার জন্য স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে অপাত্রে যে সকল দান হয়ে থাকে, অর্থাৎ যাকে দান করবে সে সেই দান নেওয়ার যোগ্য নয়, সেই দান তামসিক দান পদবাচ্য। পরমার্থ দর্শন করে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা হয়ে থাকে। যিনি এই ব্রহ্মতত্ত্ব জেনেছেন, তিনি সত্ত্বগুণ প্রধান বা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, ব্রহ্মতত্ত্বরূপ অবস্থাতে আপন প্রাণকে আহুতি দিয়ে বা লয় করিয়ে যে প্রাণকর্মরূপ যজ্ঞ করা হয়ে থাকে, তাই "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রের সারমর্ম। 'ওঁ' অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহই হচ্ছে, 'ওঁ' স্বরূপ, আজ্ঞাচক্রে প্রাণকর্মের দ্বারা বায়ুকে স্থির করতে পারলে সূক্ষ্ম শরীর দর্শন হয়ে থাকে। ঐ সূক্ষ্মদেহই হচ্ছে 'ওঁ'কার স্বরূপ, কূটস্থচৈতন্যরূপী জ্যোতির্ময়মণ্ডলের রূপই হচ্ছে 'তৎ' স্বরূপ। কূটস্থ গহ্বরে মনের লীনের অবস্থা হল 'সৎ' স্বরূপ, অর্থাৎ কূটস্থ গহ্বরের মধ্যে যে পরমাত্মরূপ রূপাতীত ব্রহ্ম নিরঞ্জন রয়েছেন, তিনিই 'সৎ' স্বরূপ। যজ্ঞের দ্বারা যে "ওঁ তৎ সৎ" এই তিনমন্ত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে, তা প্রাণকর্মরূপী সাধনা করলে তবেই এর মানে সাধকের বোধগম্য হয়; তার দ্বারাই সকল বেদ সমূহ জানা হয়ে থাকে।

মন্ত্র উচ্চারণ করে যে সকল যজ্ঞ করা হয়ে থাকে, তা প্রকৃত যজ্ঞ পদবাচ্য নয়। গুরু বক্ত্রগম্য 'ওঁ'কার ক্রিয়ার দ্বারা আপন দেহের মধ্যে বায়ু সকলকে পরব্রহ্মে আহুতি দিয়ে আজ্ঞাচক্ররূপ তপঃলোকে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে কূটস্থ গহ্বরে মনকে প্রবেশ করিয়ে তাতে লয় করাতে পারলে প্রকৃত যজ্ঞ হয়ে থাকে। এই যজ্ঞদ্বারা যিনি ব্রহ্মকে জানতে পারেন, তিনিই একমাত্র ব্রহ্মবাদী পদবাচ্য হন। তাঁর দ্বারাই সকল দেহে যজ্ঞ সম্পাদন করান সম্ভব হয়।

**তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।**
**দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫**

**সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।**
**প্রশস্তে কর্ম্মাণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬**
**যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।**
**কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭**
**অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।**
**অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাণকর্ম করে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলে সাধককে আর অসৎরূপী কামনা-বাসনা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় না। মন সর্ব্বদা তখন সদ্‌গুরুর চিন্তায় আত্মভাব লাভ করে ভাবাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই স্থানে সকল কর্ম করেও কোন কর্মের সঙ্গে তাকে যুক্ত হতে হয় না, কারণ সেই সকল কর্ম অনিচ্ছার ইচ্ছায় হয়ে থাকে। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে অমূল্য রত্ন স্বরূপ প্রাণকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সাধক উপরিউক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই তাঁর দ্বারা সকল বেদ সমূহ এবং জগৎ সংসারে যা কিছু আছে, সেই সকল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ রূপে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে তাঁর নিকট হতে সকল দান সাত্ত্বিক দান রূপে পরিগণিত হয়। হিংসা, ইচ্ছা, লোভ, কামনা, বাসনা ইত্যাদি রহিত হয়ে উচ্চ স্থানে অবস্থান করার জন্য কোনরূপ বিষয়চিন্তা তাঁর মধ্যে দানা বাঁধে না। তাই প্রাণকর্মরূপী যজ্ঞ তাঁর দ্বারা সঠিক উপায়ে পালন হয়ে থাকে।

(আত্মজ্ঞান লাভ হবার জন্য তাঁর ভেতরে বিচার বিবেচনা জাগরিত হয়। এর মাধ্যমে তাঁর সকল কর্ম মঙ্গলময়ের কর্ম বলে আত্মব্রহ্মে সমর্পিত হয় এবং তাঁর দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে সকল কর্ম করা হয়ে থাকে বলে ক্রিয়ার অতীতাবস্থায় স্থিতি তাঁর প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন তাঁর সকল কার্যই সৎ কর্ম বলে পরিগণিত হয়।)

**।। ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ সমাপ্ত ।।**

**—ঃ ইতি সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

# অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

## মোক্ষযোগ

সন্নাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ।। ১
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্নাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ।।৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানিচ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬

তাৎপর্য্যঃ— প্রাণকর্মরূপী যজ্ঞে উন্নতি করতে হলে প্রতি সাধক সাধিকাকে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে। একমাত্র ত্যাগের মাধ্যমে এই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে এবং ত্যাগের দ্বারা বিধিপূর্বক ক্রিয়াদি করা সম্ভবপর হয়। যে সকল ব্যক্তি ইচ্ছা, আসক্তি হেতু ফলাকাঙ্খায় যুক্ত থাকে, সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা ত্যাগ হয় না। আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ পূর্বক কর্ম করাই প্রত্যেক সাধক সাধিকার উচিৎ। হাত-পা বিশিষ্ট এই দেহের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালন যতক্ষণ পর্যন্ত চলবে, মনে মনে ইন্দ্রিয়কার্য্য ত্যাগ করলেও সঠিকভাবে ইন্দ্রিয়কার্য্য ত্যাগ করা হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা কর্ত্তৃক কার্য্য করতে থাকে। ফলে প্রকৃত ত্যাগ সম্ভব হয় না। যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে কর্মের অতীতাবস্থায় আপন প্রাণকে লয় করাতে পেরেছেনে, তাঁদের এই আত্মজ্ঞানের দ্বারায় সকল

তত্ত্বের মীমাংসা আপনা-আপনি হয়ে যায়, সেইহেতু এইসকল ব্যক্তি মীমাংসক পদবাচ্য। তাঁদের দ্বারায় সমস্ত কর্মই বিধিপূর্বক হয়ে থাকে, কারণ তাঁরা প্রাণকর্মরূপী তপঃ সাধনের মাধ্যমে আপন প্রাণকে প্রাণে আহুতি দিয়ে তপলোকরূপী আজ্ঞাচক্রে মন রেখে সকল কার্য্য করে চলেন। তাই কামনা-বাসনা থাকতে কেবল হাত-পা বিশিষ্টের কার্যত্যাগ করলেই হয় না, এই কর্মটি করব — ঐ কর্মটি করব না, এরূপ ইচ্ছার ভাব প্রকাশ হওয়ার জন্য প্রকৃত ত্যাগ হয় না।

প্রাণকর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে, যাঁর কর্মের অতীতাবস্থায় লয় করান সম্ভব হয়েছে, সেই সকল পুরুষের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে থাকে, কারণ তাঁরা ইন্দ্রিয়রহিত ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই সকল পুরুষ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুরুষ, তারা আপন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইচ্ছাকে গুলে খেয়েছেন। তাই তাঁরা মীমাংসক রূপে পরিগণিত হয়েছেন। ইচ্ছারহিত অবস্থাপ্রাপ্ত হবার জন্য এবং সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকার জন্য তাঁদের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগ সম্ভবপর হয়।

সকল কর্মের বাসনা বা ইচ্ছা না রেখে ও ফলাকাঙ্ক্ষারূপ আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে না রেখে যে সকল ব্যক্তি ত্যাগ করেন — সেই সকল ব্যক্তির ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে।

ত্যাগ হল তিন প্রকারের। যথা — সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামসিক ত্যাগ।

১। সাত্ত্বিক ত্যাগ — ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে এবং ইন্দ্রিয়রহিত হয়ে যে সকল ব্যক্তি ত্যাগ করেন, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ পদবাচ্য। এই ত্যাগ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।

২। রাজসিক ত্যাগ — 'এটা করব — এটা করব না' এইরূপ ইচ্ছা রেখে যে সকল ত্যাগ হয়, সেই সকল ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ।

৩। তামসিক ত্যাগ— 'আমার অমুক মনস্কামনা সিদ্ধ হবে'! এরূপ

বর্ত্তমান ইচ্ছারূপ আসক্তির দ্বারা যে ত্যাগ এবং কোন কর্ম করে পরে সেই কর্ম থেকে ফল পাব! এরূপ ইচ্ছা রেখে যে ত্যাগ করা হয় — সেই ত্যাগ তামসিক ত্যাগ পদবাচ্য।

তাই প্রত্যেক সাধক-সাধিকাকে আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ পূর্বক কর্ম করা উচিত! এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়।

**নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।**
**মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।৭**
**দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।**
**স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮**
**কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।**
**সঙ্গং ত্যক্তা ফলংচৈঞ্চব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯**
**ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।**
**ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০**

**তাৎপর্য্যঃ**— প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করে যিনি স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন সংশয়শূন্য এবং ঈশ্বরের সত্ত্বা প্রত্যক্ষ করে মনের মধ্যে যার সকল সংশয় ঘুচে গিয়েছে— এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসশীল ব্যক্তির দ্বারা সকল ইচ্ছা ত্যাগ করে ত্যাগী হওয়া সম্ভবপর হয়। এই সকল ব্যক্তিরাই প্রকৃত ত্যাগী পদবাচ্য। কারণ সুখ-দুঃখ কোন অবস্থাতেই এদের মন বিচলিত হয় না। এরাই সাত্ত্বিক ত্যাগী। এদের ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ পদবাচ্য।

আবার অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে ইচ্ছার দাস হয়ে সাধারণ মনুষ্যগণ নিজের স্ত্রী-পুত্রকে খেতে না দিতে পেরে সংসার পরিত্যাগ করে, গেরুয়া বসন ধারণ করে অন্যত্র গিয়ে সন্ন্যাসী সেজে বসে। এরা প্রকৃত সন্ন্যাসীও নয়, ত্যাগীও নয়। কারণ তারা আপন স্ত্রী-পুত্রকে খেতে না দিতে পারার জন্য আর্থিক সঙ্কটের হেতু ভয়ে এই অবস্থা ধারণ করেছে। তাই এই সকল ব্যক্তির ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ পদবাচ্য। কারণ এরা মনের মধ্যে সর্বদা ইচ্ছা নিয়ে চলে।

আবার কোন কোন ব্যক্তি বনে-বাদারে বা আশ্রমে গিয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে মৌনিবাবা সেজে বসে। অর্থাৎ বলবার প্রবল ইচ্ছা আছে — কিন্তু মৌনিভাব দেখান। চোখ বন্ধ করে ভাঁড়ামি করে। সেই সকল ভন্ড ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃত উপায়ে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। কারণ তারা ইচ্ছার দাস হয়ে চলে। তাই এই সকল ব্যক্তির ত্যাগ তামসিক ত্যাগ পদবাচ্য।

ইন্দ্রিয়সঙ্গ করে তার সঙ্গে যুক্ত না থেকে বা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে যদি এই আত্মসঙ্গে থেকে সকল কর্ম করা হয়, তবে আর কর্মে বদ্ধ হতে হয় না। কর্মে বদ্ধ না হবার জন্য ত্যাগও হয়ে থাকে।

**ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।**
**যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১**
**অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।**
**ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২**

**তাৎপর্য্যঃ—** ভাল কাজ করে ভাল, মন্দ কাজ করে মন্দ, ভাল-মন্দ কাজ করে মিশ্রফল — এই তিন প্রকারের ফল সকাম ব্যক্তিদের ভোগ করতে হয়। ইহজন্মের ফল সকল পরজন্মে এবং পূর্বজন্মের ফল সকল ইহজন্মে ভোগ করতে হয়। আত্মকর্মের দ্বারা যিনি প্রকৃত ত্যাগী পদবাচ্য হয়েছেন, তাঁর কর্মের সঙ্কল্পরূপ ইচ্ছা থাকে না। কর্মের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইচ্ছাকে তিনি ত্যাগ করেছেন। এই উভয় ইচ্ছাকে যিনি ত্যাগ করেছেন, তাঁকে ইহকাল ও পরকালে কোন ফলভোগ করতে হয় না। তাই ইচ্ছা থাকলেই কর্মফল সৃষ্ট হয়। ইষ্টজনক ইচ্ছাই হল ভাল কর্ম এবং তার ফল ভাল হয়ে থাকে। অনিষ্টজনক ইচ্ছায় করা কর্মফল মন্দ হয় : তাই সন্ন্যাসী বলে, যে তাঁর ইচ্ছা ত্যাগ হয়েছে বা সে প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়েছে — তা বলা যায় না। সন্ন্যাসীগণ বর্ত্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করলেও ভবিষ্যতে মুক্তির ইচ্ছা ত্যাগ না করে চলেন। তাই যতক্ষণ ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ কর্মফলের ভোগও আছে। কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করতে পারলে প্রকৃতরূপে ইচ্ছা ত্যাগ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে কোন সঙ্কল্প না থাকার জন্য

ইচ্ছা থাকে না। সেইহেতু কর্মফলও সৃষ্টি হয় না। তাই সঠিক প্রাণকর্মে যদি উন্নতি করতে চাও, তা হলে কর্ম করে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। বাহ্যিক ত্যাগ করলে অর্থাৎ মুখে ত্যাগ করব বললে ত্যাগ করা হয় না, মনে মনে ইচ্ছার কাজ চলতে থাকে। তার ফলে প্রকৃত ত্যাগ হয় না।

**পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।**
**সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।।১৩**
**অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্।**
**বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪**
**শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।**
**ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫**

**তাৎপর্য্যঃ**—(কর্ম করবার ইচ্ছা প্রধানতঃ জেগে থাকে পাঁচ ভাবে—১। শরীর ২। অহংভাব ৩। ইন্দ্রিয় ৪। প্রাণ-অপান বায়ু সকল ৫। দৈব।

শরীরের দ্বারা অহংভাবের বশবর্ত্তী হয়ে দেহ মধ্যস্থিত চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের প্রাণ-অপান বায়ু সকলের দ্বারা দৈব সংযোগ হেতু কর্ম সম্পন্ন হয়। জীবের যাবতীয় বিষয়সমূহ আজ্ঞাচক্রস্থিত স্থান থেকে জন্মগ্রহণ করার পর তা দ্রুত বা তড়িৎবেগে নিম্নে ধাবিত হয়। এর ফলে মানুষ শরীরের দ্বারা ভাল ও মন্দ কর্ম করে। আবার বাক্যের দ্বারাও সত্য, মিথ্যা, রূঢ়, মিষ্ট বাক্য বলে। সদ্ বিষয়ে এবং অসদ্ বিষয়েও মনের মধ্যে নানান মন্তব্য প্রকাশ করে। তার মাধ্যমে শরীরের দ্বারা ও মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা নানারূপ কর্ম সম্পন্ন হয়। কর্মফল সৃষ্ট হবার কারণে এই মনুষ্যগণ নানা ভোগ-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে)

**তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।**
**পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।।১৬**
**যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।**
**হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭**

**জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।**
**করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।।১৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** আত্মকর্ম যারা না করে, তাদের দ্বারা কর্মফল সৃষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে পারা সম্ভব হয় না। ঐ সকল ব্যক্তিরা শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৈবসংযোগে দেহাভিমানী হয়ে দুর্মতির মধ্যে আবদ্ধ হয় এবং নিজেকে কর্ত্তা ভেবে সকল কর্ম করে। আত্মাতে অহংজ্ঞান আরোপ করে তারা, 'আমি ভাল-মন্দর ফলভাগী নহি', 'আমি কিছু করি না, সবই তাঁরই ইচ্ছা' — এইভাবে মুখে এক কথা ও মনে এক কথা পোষণ করে থাকে এবং কর্মফল হেতু ভোগ বাসনায় লিপ্ত হয়ে থাকে।

কর্মের অতীতাবস্থায় থেকে যাঁরা স্থিরবুদ্ধির দ্বারা 'আমি কর্ত্তা নই' এইরূপ ভাব পোষণ করেন — তাঁদের অহংভাব দেহ থেকে কর্পুরের ন্যায় উবে যায়। তখন তাঁরা আর কিছুতেই লিপ্ত হন না। ব্রহ্মের নেশাতে উন্মত্ত থেকে কিছু করেও তাঁদের দ্বারা কিছু করা হয় না।

কূটস্থ ব্রহ্মই হচ্ছে জ্ঞানস্বরূপ। ক্রিয়া করে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। ব্রহ্মস্বরূপ বস্তুকে ক্রিয়া করে জানা যায়। সুতরাং যিনি জানবেন তাঁকে এই প্রাণকর্মের দ্বারাই জানতে হবে। প্রাণকর্মের দ্বারাই তিনকর্ম অর্থাৎ করণ, কর্ম ও কর্ত্তা এই বিষয়ে কূটস্থ ব্রহ্মে গিয়ে জানা সম্ভব হয়। করণ-অর্থাৎ কর্ম করা, কর্ম—অর্থাৎ প্রাণকর্ম এবং কর্ত্তা— অর্থাৎ যাঁর দ্বারা সকল কর্ম হচ্ছে। কূটস্থ ব্রহ্মই হচ্ছে প্রকৃত কর্ত্তা পদবাচ্য। ব্রহ্মের অতীতাবস্থায় এই সকল কর্মরহিত হয়ে যায়। তখন সাধক অতীতাবস্থার অতীতাবস্থায় বিচরণ করে সকল কর্মত্যাগ করতে সক্ষম হন।

**জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।**
**প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯**
**সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।**
**অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২০**

**পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান পৃথগ্‌বিধান্।**
**বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১**
**যত্তুকৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।**
**অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২**

**তাৎপর্য্যঃ—** জীবদেহে বা মনুষ্যদেহে যে জ্ঞান অর্জিত থাকে, তার গুণানুসারে কর্ম ও কর্ত্তাসকল সৃষ্টি হয়। যেমন তিন প্রকারের জ্ঞান রয়েছে — ১। সাত্ত্বিক জ্ঞান ২। রাজসিক জ্ঞান ৩। তামসিক জ্ঞান।

কর্মের গুণানুসারে জীবের তিনপ্রকারের কর্ম রয়েছে — ১। সাত্ত্বিক কর্ম ২। রাজসিক কর্ম ৩। তামসিক কর্ম।

সেইরূপ কর্ত্তার গুণানুসারে তিনপ্রকারের কর্ত্তা রয়েছে — ১। সাত্ত্বিক কর্ত্তা ২। রাজসিক কর্ত্তা ৩। তামসিক কর্ত্তা।

বর্ত্তমানে জ্ঞানের গুণানুসারে যে তিনপ্রকারের ভাব রয়েছে তা আলোচনা করছি।

১। সাত্ত্বিক জ্ঞান — প্রাণকর্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থান করতে পারলে সাধকের যে জ্ঞানের উদয় হয়, তার প্রভাবে সকল জীবেই তিনি ব্রহ্মরূপী সত্ত্বা দেখতে পান। তাঁদের চক্ষে ভূতসকল পৃথক হয়ে প্রাণই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, তা দৃষ্ট হয়। যে জ্ঞানের মাধ্যমে এইরূপ ভাব দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে।

২। রাজসিক জ্ঞান — যে জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর মধ্যে যে স্বয়ং ব্রহ্ম রয়েছেন তা বিদিত হয় না, সকলই ভিন্ন-ভিন্ন এই ধারণা হয়ে থাকে। জগৎসংসার ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা গ্রোথিত, তা যে জ্ঞানের দ্বারা জানা সম্ভব হয় না, সেই জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান বলে।

৩। তামসিক জ্ঞান — যে জ্ঞান দেহীকে ছেড়ে শুধু দেহের মধ্যে আবদ্ধ, ভগবান আত্মনারায়ণরূপী পরমগুরুদেব যে রূপের কথা বলেছিলেন—

সেইরূপকে যে সকল ব্যক্তি তুচ্ছজ্ঞান করে থাকে এবং প্রতিমাই ঈশ্বরের একমাত্র রূপ— এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সেই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা হয়।

**নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।**
**অফলপ্রেপ্সু না কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩**
**যত্তুকামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।**
**ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।।২৪**
**অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম।**
**মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তাসমুচ্যতে।।২৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** এবার তিনপ্রকারের কর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। সাত্ত্বিক কর্ম — যে কর্ম করলে আসক্তি শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কর্ম করে কোনরূপ কামনা-বাসনা রূপী ইচ্ছা উদ্ভূত হয় না এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ভাবে করা হয়ে থাকে, সেই সকল কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বা প্রাণকর্ম বলা হয়।

২। রাজসিক কর্ম — ইচ্ছা ও ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়ে অহংকারের দ্বারা যে সকল অলস কর্ম করা হয়, সেই সকল কর্মকে রাজসিক কর্ম বলা হয়।

৩। তামসিক কর্ম — যে সকল কর্ম করলে হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং মোহ'র বশে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় যা শুধু বাহ্যারম্বর, যার কর্ত্তৃক শুধু মাত্র বুদ্ধির নাশ হয়ে থাকে, সেই সকল কর্ম তামসিক কর্ম। এই সকল কর্মে আসক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা মদ্যপান ও খুনখারাপি ইত্যাদি হয়ে থাকে।

**মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।**
**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬**
**রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহত্তচিঃ।**
**হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।২৭**

**অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।**
**বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।।২৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** এখন তিনপ্রকারের কর্ত্তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। সাত্ত্বিক কর্ত্তা — (যাঁর দ্বারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা সম্ভব হয়েছে, তিনি সকল আসক্তি রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত। তাঁর কোন অহং অভিমান নেই এবং তিনি সর্বদাই স্থিরতারূপ ধৈর্য্যযুক্ত, উদ্যমশীল এবং উৎসাহযুক্ত হন। তাঁদের মনের অবস্থা সর্বদা একই প্রকার থাকে। মনের কোন বিরুদ্ধ ভাব বা বিচলতার সৃষ্টি হয় না। এই সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিক কর্ত্তা পদবাচ্য।

২। রাজসিক কর্ত্তা — যে সকল ব্যক্তি ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত, অলস, লোভী, হিংসাযুক্ত, তাদের দ্বারা সকলকে সমানভাবে দেখা বা সব দেহেই প্রাণরূপী আত্মার অবস্থান — তা দেখা সম্ভব হয় না, সেই সকল ব্যক্তি রাজসিক কর্ত্তারূপে পরিচিত। তারা সর্বদা বিষয়সুখে ধাবমান, তাই কোনকিছু লাভে আনন্দ এবং লোকসানে দুঃখ পেয়ে থাকে।

৩। তামসিক কর্ত্তা — যে সকল ব্যক্তি আত্মভাবে না থেকে সর্বদা ইন্দ্রিয়াসক্ত, ঠগ-জোচ্চুরীরূপ কার্য্যে সর্বদা যুক্ত এবং আলস্যেই সর্বদা ডুবে থাকে — সেই সকল ব্যক্তি তামসিক কর্ত্তারূপে পরিচয় লাভ করে।)

**বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।**
**প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯**
**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।**
**বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০**
**যয়া ধর্ম্মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।**
**অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১**
**অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।**
**সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্বোল্লিখিত শ্লোকগুলিতে যেভাবে জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত্তার বিভাগ হয়েছে, সেইরূপ গুণভেদে তিনপ্রকারে বুদ্ধি, ধৃতি বা ধারণার ভাগ হয়ে থাকে। বুদ্ধিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। — ১। সাত্ত্বিক বুদ্ধি ২। রাজসিক বুদ্ধি ৩। তামসিক বুদ্ধি। তেমনই ধারণাকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়। — ১। সাত্ত্বিক ধারণা ২। রাজসিক ধারণা ৩। তামসিক ধারণা।

এখন তিনপ্রকারের বুদ্ধি সকল নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। সাত্ত্বিক বুদ্ধি — সাধক আত্মকর্মরূপ ক্রিয়ার দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থায় আপন প্রাণকে স্থিতিলাভ করালে সে যুক্তবুদ্ধিশালী হয়ে থাকে। এর ফলে সেই অবস্থায় প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধন অবস্থা, মুক্তাবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর জানা সম্ভব হয়ে থাকে। যে বুদ্ধির দ্বারা এই সকল অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়, তাকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে। উপরোক্ত অবস্থাগুলির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ—

প্রবৃত্তি — ইচ্ছা বা আসক্তিদ্বারা কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা হেতু তার সঙ্গে রত থাকা।

নিবৃত্তি — ইচ্ছারহিত অবস্থার দ্বারা বা আসক্তিশূন্য অবস্থার দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষামুক্ত হয়ে যে কর্ম হয়ে থাকে, তাই হল নিবৃত্তি।

অকার্য্য — যে সকল কার্য্যের দ্বারা জীবের ক্ষয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাকে অকার্য বলে।

কার্য্য — যে কর্মের দ্বারা জীবের রক্ষা হওয়া সম্ভবপর হয় অর্থাৎ জীবের ক্ষয়রোধ কবা সম্ভব হয়, সেই কার্য্যকে প্রকৃত কার্য্য বা আত্মক্রিয়া বলে।

ভয় — ধর্মপথে প্রবেশ করতে যে আতঙ্কে সকলে ভীত হয়ে থাকে, তা হল মৃত্যু। কারণ মৃত্যু আতঙ্কই হল প্রতিটি মানুষের একমাত্র আতঙ্ক। তা থেকেই সকল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণকর্মের দ্বারা মৃত্যুকে চেনা ও জানা যায়। তাই সাধকগণ প্রাণকর্ম করতে আসলে মৃত্যুভয়ের কারণে পিছিয়ে যায় বা ভীত হয়ে পড়ে। এই আতঙ্কই হল প্রকৃত ভয় পদবাচ্য।

অভয় — সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বা সাধন সমরে জয়ী হয়ে কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করে মৃত্যুভয়কে এড়ানো সম্ভবপর হয়ে থাকে। ঐ অবস্থা হল প্রকৃত অভয় পদবাচ্য।

বন্ধনাবস্থা — কামনা-বাসনারূপী মোহজালে আবদ্ধ হয়ে জীব সর্বদা কর্ম করে চলে। এর ফলে কর্মফলের সৃষ্টি হয়। সেহেতু জীবকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসাররূপী বেড়াজালে বারম্বার যাওয়া-আসা করতে হয়। এটাই হল প্রকৃত বন্ধনাবস্থা।

মুক্তাবস্থা — প্রাণকর্মের দ্বারা আপন মনকে পরমাত্মায় লয় করে পরমপদ প্রাপ্তির দ্বারা সাধক উপরোক্ত বন্ধনাবস্থা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থাই প্রকৃত মুক্তাবস্থা।

২। রাজসিক বুদ্ধি — যে সকল অকর্মরূপী বা অধর্মরূপী বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য্য, অকার্য্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারা যায় না, যা সর্বদা ইন্দ্রিয়জাতকর্মে রত থাকে এবং সেই চিন্তাতেই ডুবে থাকে, সেই সকল বুদ্ধি রাজসিক বুদ্ধি পদবাচ্য।

৩। তামসিক বুদ্ধি — যে সকল বুদ্ধির দ্বারা অধর্মকে ধর্ম এবং বিষাদযোগের ন্যায় 'ইন্দ্রিয় দমন পাপকার্য্য' — এই সকল উল্টো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সকল বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ধর্মের বিপরীত ভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই তামসিক বুদ্ধিতে আচ্ছাদিত।

**ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।**
**যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩**
**যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।**
**প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪**
**যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।**
**ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** এবার তিন প্রকারের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। সাত্ত্বিক ধারণা —(গুরূপদিষ্ট উপায়ে তাঁর আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে একান্ত মনযোগ সহকারে প্রাণকর্ম দ্বারা ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়াম করলে যে প্রকৃত ধারণা হয়, ঐ ধারণাকে সাত্ত্বিক ধৃতি বলে। এই ধারণারূপ ধৃতির দ্বারা মনের স্থিরাবস্থা বিনা অবলম্বনে হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিনা অবলোকনে দৃষ্টি স্থির এবং বিনা অবরোধে বায়ু স্থির হয়ে থাকে। সাধকের যখন এরূপ ভাব হয়, তখনই প্রকৃত ধারণার অবস্থা আসে।

২। রাজসিক ধারণা — কর্ম করে ফলের প্রত্যাশারূপ অর্থ এবং কর্মফলের কামনারূপ কাম, এই সকল ধারণা যে সকল ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মধ্যে হয়ে থাকে, সেই সকল ব্যক্তির ধারণা রাজসিক ধারণা হিসাবে পরিগণিত হয়।

৩। তামসিক ধারণা — যে সকল ব্যক্তি সর্বদা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, অহংকার, মৈথুন ইত্যাদির মধ্যে অবস্থান করে চলে এবং এই সকলকে জয় করার কোনরূপ ধারণা যাদের নেই; সেই উল্টো ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যে সকল ব্যক্তি কর্ম করে, সেই সকল ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে।)

**সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।**
**অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।।৩৬**
**যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।**
**তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭**
**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।**
**পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮**
**যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।**
**নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।৩৯**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্ব শ্লোকোক্ত উপায়ে কর্মের দ্বারা যে সুখ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাও তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন — ১। সাত্ত্বিক সুখ ২। রাজসিক সুখ ৩। তামসিক সুখ।

১। সাত্ত্বিক সুখ — গুরূপদিষ্ট উপায়ে যোগাভ্যাস করলে তাঁর দ্বারায় পরমানন্দ লাভ হয়ে থাকে। তখন দুঃখের শেষ হয়ে অনির্বচনীয় সুখ সাধকের প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়া রপ্ত হবার সময় তোমার ক্রিয়া করতে প্রথম প্রথম ভাল লাগে, কিন্তু পরে একঘেয়ে এবং বিষতুল্য মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস যদি শ্রীগুরুর প্রতি তুমি রেখে চল, তা হলে সেই অমৃততুল্য অবস্থা বা পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া তোমার দ্বারা সম্ভব হবে। কারণ তিনি বলেছেন "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যিত"। তাই প্রাণকর্ম শুরু করার পূর্বে বিষতুল্য অবস্তা প্রাপ্ত হলেও শ্রীগুরুর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস রেখে, তাঁর সকল কথা শুনে সাধক আত্মকর্ম করতে পারলে কর্মের অতীতাবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হয়ে, অনির্বচনীয় সুখাবস্থা বা পরমাত্মতত্ত্বে আপন মন লয়প্রাপ্ত হয়ে সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই-ই প্রকৃত আত্মপ্রসাদ স্বরূপ। এর ফলে যে অনির্বচনীয় সুখ সাধকের প্রাপ্ত হয়, তাই সাত্ত্বিক সুখ পদবাচ্য। এই অবস্থায় বায়ু ঈড়া, পিঙ্গলার গতি ছেড়ে সুষুম্নায় স্থিতি লাভ করে।

২। রাজসিক সুখ — ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হয়ে, বিষয় আসক্তিরূপ ইচ্ছা হেতু ব্যক্তি সকলের মধ্যে যে সুখ লাভ হয়ে থাকে, সেই সকল সুখ রাজসিক সুখ পদবাচ্য। এই সুখের দ্বারা প্রথমে আনন্দপ্রাপ্তি হয়ে থাকলেও ভবিষ্যতে এর ফল বিষময়।

৩। তামসিক সুখ — নিদ্রা, অলসতা, মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নেশা- ভাঙ ইত্যাদিরূপী প্রমত্ততার মাধ্যমে যে সুখের উদয় হয়, তা আগাগোড়াই চিত্তে এক মোহকর অবস্থার সৃষ্টি করে রাখে। সেই অবস্থার মাধ্যমে যে সুখ অনুভব করা হয়, সেই সুখ তামসিক সুখ বলে পরিচিত হয়।

**ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।**
**সত্ত্বং প্রকৃতির্জৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈ।।৪০**
**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।**
**কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১**

**শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।**
**জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।।৪২**

**তাৎপর্য্যঃ—**( সমগ্র জগৎ প্রকৃতিস্থ তিনগুণের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বা ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। জগতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এই তিনগুণ ছাড়া। তবে একথা সঠিক যে তিনগুণ সকলের মধ্যেই আছে কিন্তু গুণেতে সকলে আবদ্ধ নয়। কারণ কেউ কেউ গুণে থাকে, কেউ আবার গুণে থাকেন না। অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপী ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি আপন দেহস্থিত চঞ্চল প্রকৃতিকে স্থির করে গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সকল ব্যক্তি গুণের মধ্যে আবদ্ধ নন। যে সকল ব্যক্তির এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় নি, সেই সকল ব্যক্তি চঞ্চল প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গুণেতেই অবস্থান করছে।)

এই গুণ অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন —

১। ব্রাহ্মণ— যিনি সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন, তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ।

২। ক্ষত্রিয় — যিনি সত্ত্ব ও রজঃগুণের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি হলেন ক্ষত্রিয়।

৩। বৈশ্য — যিনি রজঃ ও তমঃগুণের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি হলেন বৈশ্য।

৪। শূদ্র — যিনি তমঃগুণের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনিই হলেন শূদ্র।

(পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি যে যে গুণের অধিকারী হন, পরবর্ত্তী জন্মে তাদের কর্মও সেই সেই রূপে বিভক্ত হয়। সদ্‌গুরুর উপদেশ মত সাধনমার্গে আপন প্রাণকে ব্রতী করতে পারলে তাঁর গুণসকল পরিবর্ত্তিত হতে পারে। যেমন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালে পৈতেধারী হলেও সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নয়। সদ্‌গুরু লাভের দ্বারা আত্মকর্ম করে আপন প্রাণকে ঊর্দ্ধস্থানে

অবস্থান করাতে পারলে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করতে পারলে তমঃগুণরূপী শূদ্র সত্ত্বগুণপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ হতে পারে। যেমন দস্যু রত্নাকর তমগুণে অবস্থান করে শূদ্র পদবাচ্য ছিলেন, এরপর পরমপদ লাভ করে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। আবার বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও সেরূপই প্রাণকর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে স্থির করে পরমপদপ্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণরূপে বা মুনিরূপে পরিচয় লাভ করেন।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে অর্থাৎ যে বংশে সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে, সেই বংশে সুকৃতিবশে যদি কারও জন্ম হয়, তা হলে সে ঘরে বসে সদ্‌গুরু লাভ করতে পারে এবং বিশেষরূপে প্রাণকর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন।

পরমাত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া রূপ জ্ঞান হল প্রকৃত বিজ্ঞান পদবাচ্য। ক্রিয়ার পরাবস্থায় মনের সাম্যভাব হয়ে যে সকল ব্রাহ্মণদের সকলকে সমানভাবে দেখার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তিনিই আপন দেহস্থিত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে দমন করে প্রাণরূপ কূটস্থ-ব্রহ্মাতে অবস্থান করেন। এর ফলে সর্ব বিষয়ে তিনি নিরস্ত থাকার অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং তাঁর স্বভাবজাত যা কর্ম তা আপনা আপনিই হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়রহিত অবস্থা হওয়াব জন্য কর্মের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত হতে হয় না। তাই এই সকল ব্রাহ্মণের ভেতরে ও বাইরে সর্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

**শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।**
**দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।।৪৩**
**কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।**
**পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪**

**তাৎপর্য্যঃ—** দেহস্থিত আসুরিক ভাবকে দমন করার উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধনরূপ সমরে অবতীর্ণ হন তারাই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। সেই সকল ব্যক্তির মনের মধ্যে সর্বদা সাধনযুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হয়ে আপন দক্ষতা বা জেদের সঙ্গে সাধনা করার যে ভাব মনের মধ্যে এসে থাকে, তাই হল প্রকৃত ক্ষত্রিয় ভাব। এই সকল ব্যক্তি আত্মকর্মেও ক্ষমতাশীল।

আমাদের দেহস্থিত ক্ষেত্রই হল প্রকৃত কৃষিক্ষেত্র। বৈশ্যদিগের কার্য্য হল কৃষিকার্য করা, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, ইত্যাদি আপন প্রাণকর্মের দ্বারা সদগুরুর আদেশ-উপদেশ মেনে প্রাণকর্মরূপ কর্ষণ ক্রিয়া করলে এই দেহক্ষেত্র মধ্যস্থিত প্রাণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রাণকর্মরূপ কর্ষণ ক্রিয়াই হল প্রকৃত কৃষিকার্য্য। দেহমধ্যস্থ এই কৃষিকর্ম স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে লাভ করার জন্য বা সেই সোনার ফসল লাভ করার জন্য করা হয়ে থাকে। তাই সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন "মনরে কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

এই কৃষিকার্য্য চার প্রকারের ব্যক্তি করে থাকে। ১। আর্তব্যক্তি বা ভবরোগে কাতর ব্যক্তি ২। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বা আত্মতত্ব জিজ্ঞাসা যাদের মধ্যে রয়েছে সেই সকল ব্যক্তি ৩। অর্থার্থী ব্যক্তি বা দৈব, সম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তি বা প্রাণকর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে যিনি যুক্তবুদ্ধিশালী। এই চার প্রকারের লোক তাঁর ভজনা করে। সেহেতু এরা বৈশ্য পদবাচ্য।

বৈশ্যগণ আবার গোচারনা করে থাকে। 'গো' কথার অর্থ হল জিভ। প্রাণকর্মের দ্বারা জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করে, অনন্ত-অবস্থায় প্রাণের ঐ স্থিতিরূপ অবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য, চন্দ্র ও সূর্য্যনাড়ী দিয়ে যে বায়ু গমনাগমন করছে সেই পথের মুখে একে রাখা। তাই হল প্রকৃত গোচারণ পদবাচ্য।

বাণিজ্যও এই বৈশ্যদ্বারা হয়ে থাকে। প্রাণকর্মরূপী কর্ম আরম্ভের সময় প্রত্যেক প্রাণকর্মীর কিছু না কিছু কামনা থাকে এবং সেই ফলাকাঙ্ক্ষায় যুক্ত হয়ে প্রাণকর্ম করে। ফলাকাঙ্ক্ষায় যুক্ত হয়ে কর্ম করাই হল প্রকৃত বাণিজ্য পদবাচ্য। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী যে যেভাবে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সেই ভাবানুযায়ী তারা এই জন্মে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

শূদ্র এই চার বর্ণের মধ্যে চতুর্থ বর্ণ। কথিত আছে, শূদ্রগণ এই তিনবর্ণের লোকেদের সেবা করে থাকে। সাধক প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপী আচার্য্যের নিকট হতে আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রাণকর্মরূপী যে গায়ত্রী দীক্ষা পান, তাঁর

থেকে আপন আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে, তিনি সেই কর্ম করে প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণদিগের সেবা করে থাকেন। কারণ উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করাই হলো প্রকৃত গুরুসেবা আর পরমগুরুদেবই হলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। আর প্রাণকর্মই হল প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কাজ বা সেবা। এর ফলে তিন বর্ণের লোকেদেরই সেবা শূদ্রদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

**স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।**
**স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫**
**যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতাণাং যেন সর্ব্বমদং ততম্।**
**স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬**

**তাৎপর্য্যঃ—** পূর্বশ্লোকে যেভাবে চারিবর্ণের মানুষের কার্য্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেইরূপ কার্য্য নিষ্ঠাবান হয়ে সদ্‌গুরূপদিষ্ট পথে চলে সিদ্ধিলাভ করতে পারলে, সকলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ (গুরূপদিষ্ট প্রাণকর্ম করে আপন দেহক্ষেত্র 'ওঁ'কাররূপী হলের দ্বারা কর্ষণ করে ইন্দ্রিয়জনিত সকল রিপুগণকে দমন করে যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয়, তা হলে ঐ দেহক্ষেত্র দেবক্ষেত্র রূপে পরিণত হয়। একমাত্র প্রাণকর্মরূপী আত্মার অর্চনার দ্বারাই সকল মানবগণ সিদ্ধিলাভ করে থাকে। এই কারণে প্রাণকর্মের দ্বারা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টাই হল প্রকৃত চেষ্টার মূল স্বরূপ। প্রাণ সমগ্র প্রাণীজগৎ ব্যাপিয়া রয়েছে। কর্ম করে এই তিনগুণের অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পথ একমাত্র সদ্‌গুরুই দেখাতে পারেন। আপন আপন চেষ্টার দ্বারা সেই কর্মে ব্রতী হতে পারলে বা আত্মার অর্চনা করতে পারলে আপন আপন ফল লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপ সেবার দ্বারা দেহক্ষেত্র কর্ষণ করে সাধন সমরে জয়লাভ করে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয়)।

**শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।**
**স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭**
**সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।**
**সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।৪৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** গুরূপদিষ্ট এই স্বকর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। বাহ্যিক বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই সকল বিষয় অনুভব করা সম্ভবপর নয়। প্রাণের সেবারূপ প্রাণায়ামাদি দ্বারা কর্ম করলে পাপ প্রাপ্ত হয় না। জন্মের সঙ্গে যে কর্ম আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ সদ্‌গুরুপ্রাপ্ত হলে জীবের পুনর্বার জন্ম হয়। সেই জন্মগ্রহণ হবার পর আত্মকর্মের দ্বারা যদি নিষ্ঠা সহকারে কর্মসকল করা হয়ে থাকে, তা হলে এই হেতু সাধকের পাপ প্রাপ্ত হতে হয় না। আমাদের চিত্ত সর্বদা ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে, তাই স্বধর্ম জানা বা তাতে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাই কেবল পরধর্মে থাকা হয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে থাকার জন্য তা সর্বদা দোষযুক্ত হয়ে থাকে। তাই প্রাণকর্মরূপী প্রাণায়ামাদি আরম্ভ করার সময় তা সর্বাঙ্গসুন্দর কাজ তা আমাদের বোধে আসে না। ক্রমাগতভাবে অভ্যাস করলে, নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে এই কর্মকে ভালবাসলে, তবেই তা দোষ যুক্ত ভাবে অনুষ্ঠান করলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন স্বভাবজাত সকল কর্ম করেও আমরা পাপ প্রাপ্ত হই না। দেহান্তের পর আমরা নতুন জন্ম বা নতুন দেহ ধারণ করে আসি বলে সেই আত্মভাব থেকে চ্যুত হই। তাই মনের মধ্যে এই আত্মকর্মকে সম্পূর্ণ নতুন মনে করি এবং মনমধ্যে নানারূপ শঙ্কা পোষণ করি।

(প্রাণকর্ম শুরু করার সময় প্রথমেই তা নিখুঁত ভাবে করা সম্ভব নয়। আপন মনকে শ্রীগুরুর পদতলে অর্পন করতে পারলেই এই কর্ম সহজ কর্ম রূপে সাধকের বোধে আসে। আমাদের ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে প্রাণের আগম নিগমরূপ কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী এই বহিঃপ্রাণায়াম স্বরূপ কার্য্যে আমরা লিপ্ত থাকি এবং একেই সহজ বোধ করি। তাই বলা হয়েছে "গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।" ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের গমনাগমনের পথ উল্টে যায় এবং সদ্‌গুরুর দ্বারা সেই পথ পুনরায় জানার পর প্রথমেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে ক্রিয়া করা আত্মকর্মীদের সম্ভব হয় না। কারণ বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা তাঁকে বা প্রাণকে গুরূপদিষ্ট পথে আনতে বেগ পেতে হয়। ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা তা আয়ত্ব করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

অনেক প্রাণকর্মী বলে থাকেন। "১৬ বছর / ২০ বছর করেও প্রাণকে সঠিক পথে চালনা করতে পারছি না।" তার কারণ গুরুকরণের পূর্বে বহুদিন যাবৎ এই অনভ্যাস বশতঃ প্রাণ ঐ পথে প্রবিষ্ট হতে চায় না। যেমন আমাদের দেহের মধ্যে এমন বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা পূর্বে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তার কার্য্য না থাকার জন্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে বা শরীর থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিলেও জীব স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে। তাই সেইরূপ বহুদিন যাবৎ প্রাণ ঐ পথমধ্যে প্রবিষ্ট না হবার জন্য সেই অনভ্যাসের কারণবশতঃ তার মুখ বা অন্তপ্রাণায়াম করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাকে পুনর্বার খোলার জন্য ধৈর্য্য সহ অভ্যাস করা প্রত্যেকের একান্ত আবশ্যক।)

**অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জীতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।**
**নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯**
**সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।**
**সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০**

তাৎপর্য্যঃ— প্রাণকর্ম করে কর্মের ফল প্রত্যাশা ত্যাগ করে কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করতে পারলে ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই হল পরর্মসিদ্ধির অবস্থা। বর্ত্তমান চঞ্চলপ্রাণকে স্থিরপ্রাণে পরিণত করে যিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনিই হলেন জীতাত্মা। তাঁর কোনপ্রকার লালসা না থাকার জন্য তিনিই হলেন প্রকৃত নিস্পৃহ ব্যক্তি।

কর্মের অতীতাবস্থায় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়ে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান। সেই অবস্থা সম্পূর্ণ অব্যক্ত, তা ভাষায় বলে বোঝাবার নয়।

**বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।**
**শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১**
**বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।**
**ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২**
**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।**

**বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূযায় কল্পতে।।৫৩**

তাৎপর্য্যঃ—(গুরূপদিষ্ট পথে উত্তমরূপে প্রাণকর্মের দ্বারা ১৪৪টি প্রাণকর্মে যে ধারণা হয়ে থাকে, সেই ধারণার দ্বারা মনকে স্থিরাবস্থায় অবস্থিতি করে, সমস্ত বিষয় সকল পরিত্যাগ করে, রাগ, দ্বেষ অপসারিত করে, কূটস্থ অভ্যন্তরস্থিত স্থানে মনকে বসাতে পারলে 'আমি হারা' ভাব হয়ে থাকে। এইরূপ ধ্যান করলে শরীর ও মনে সংযম ভাব-অবস্থা লাভ করা সম্ভব হয়। কারণ প্রাণের গতি স্থির হওয়াতে মনের চঞ্চলগতি রহিত হয়ে গিয়ে আত্মনারায়ণের প্রকৃত কার্য্য ধ্যানযোগপরায়ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন আত্মনারায়ণকে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষ করে যে ধারণার উৎপন্ন হয়, সেই ধারণায় মন আত্মনারায়ণের রূপ আপন মধ্যে ধারণ করে সেই চিন্তায় লেগে থাকে। তাই প্রকৃত বীতরাগ রূপ আসক্তিশূন্য অবস্থা। এই অবস্থা কেবল সাধন দ্বারা লাভ হয়ে থাকে।

সদ্গুরু প্রদর্শিত সাধন দ্বারা আত্মনারায়ণের রূপ প্রত্যক্ষ হলে মোহ অপসারিত হয় এবং জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধগম্য হয়। এই প্রত্যক্ষরূপে জানবার পর ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন নিত্যবস্তুরূপ আত্মনারায়ণের দর্শনে মন আর কোন বিষয়ে রত হয় না। তখন অহংকার, বল,দর্প, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি পরিত্যাগ করা সাধকের দ্বারা সম্ভব হয়। মন ঐ নিত্যবস্তুর দর্শনে স্থিরভাবে আটকে গেলে এই সকল বিষয় সমূহ (কাম, ক্রোধ ইত্যাদি) আপনা-আপনি রহিত হয়ে যায়। এইভাবে 'আমি-আমার' ভাবশূন্য হয়ে মন ও প্রাণের স্থিরাবস্থা হেতু পরম শান্তভাব প্রাপ্ত হয়ে আপন মনকে স্থির ব্রহ্মে মিলিয়ে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান।)

**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।**
**সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪**
**ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।**
**ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম।।৫৫**
**সর্ব্বকর্ম্মান্যপি সদা কুর্ব্বণো মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ।**
**মৎপ্রাসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬**
**চেতসা সর্ব্বকর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।**

**বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭**

**তাৎপর্য্যঃ—** কর্মের অতীতাবস্থায় আপন প্রাণকে বিলীন করে যে সকল ব্যক্তি আত্মানন্দে সদাসর্বদা বিভোর হয়ে আছেন, তাঁরা সর্বদা জগৎসংসারের সকল বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ পরিলক্ষিত করে থাকেন। এর ফলে তাঁদের দ্বারায় কর্ম করেও কর্মের মধ্যে আবদ্ধ হতে হয় না। কারণ মন লয় প্রাপ্ত হবার জন্য কোনরূপ আসক্তি, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয় না। কারণ ঐ সকল ইন্দ্রিয়রূপী রিপুসকলের উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভবপর হয়েছে।

পরব্রহ্মের পরমপদকমলে আপন মন-প্রাণ স্থির হয়ে গিয়েছে বলে চঞ্চলতা হেতু তাঁর মনের মধ্যে কোনপ্রকার আশার সৃষ্টি হয় না। সেই আত্মময় ভাব লাভ করে, সেই আত্মপ্রেমে আপনার সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়ে বিভোর অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ঐ বিভোরতার হেতু মনের এবং বাক্যের সেইস্থানে অবস্থান হয় না। সেইজন্য এই অবস্থা অব্যক্ত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যিনি এই ব্রহ্মকে জেনে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, তিনি তখন সেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান।

আত্মপরায়ণরূপ এই সকল ব্যক্তিরা তাঁদের সকল কর্ম করেও আত্মপ্রসাদরূপী পরমপদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আর কোন কর্মের মধ্যে আবদ্ধ হন না।

চঞ্চল প্রাণরূপ আত্মাকে শ্রীগুরুর শ্রীচরণপদকমলে সমর্পণ করতে পারলে, এই সকল অবস্থা সাধকের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তবুদ্ধিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আত্মধ্যান থেকে যে সকল ব্যক্তি এক সময়ও চ্যুত হন না, সেই সকল ব্যক্তি 'মচ্চিত্ত' পদবাচ্য।

**মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।**
**অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮**
**যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।**
**মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯**

**তাৎপর্য্যঃ**— এমন এক সময় জীবসকলের মধ্যে আসবে তখন সকল প্রাণী সমুদয়কে এই প্রাণকর্মরূপী কর্মে ব্রতী হতে হবেই হবে। সদ্‌গুরুর কথা শুনে সর্বদা সকল সাধকের চলা উচিৎ। তাঁর দ্বারাই একমাত্র এই পরমপদ লাভ হয়ে থাকে। এর অন্যথা আর কিছু নেই। যে সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুর আদেশ ও উপদেশ মতন কার্য্য করতে পারবে, তার ফল এক সময় না এক সময় অবশ্যই ফলবতী হবে। তাই শ্রীগুরুর আদেশ-উপদেশ শুনে কর্ম করে আপন আধার তৈরী করে নাও। পরজন্মে এই শ্রীগুরু তোমার প্রাপ্ত হবেই হবে। এরপর তখন আবার তাঁর এই আদেশ-উপদেশ শুনে প্রাণকর্ম করলে তুমি উচ্চস্থানে অবস্থান করতে সমর্থ হবে। যে সকল ব্যক্তি তাঁর আদেশ-উপদেশ অমান্য করবে, তাদের দ্বারা প্রাণকর্মে উচ্চাবস্থা কখনই প্রাপ্ত হবে না। চঞ্চল প্রাণের মধ্যেই অবস্থান করে মন এই অধদেশেই পড়ে থাকবে। তাই সময় থাকতে থাকতে আপন প্রবল পুরুষকারের দ্বারা প্রাণকে সদ্‌গুরূপদিষ্ট পথে চালনা করে অগ্রসর হয়ে চল। যা পিছনে পড়ে আছে, সেদিকে দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব সর্বদা এই বিষয়ে একটা কথাই বলতেন — "যো হো চুকা সো হো চুকা, আগে বাঢ়।"

প্রাণকর্ম করতে এসে তুমি মনে তাঁর উপর অছেদ্দা দেখালে একসময় আসবে তখন বিষয়কে বিষতুল্য মনে হবে। সেই সময় তখন তাঁর কথাই তোমার অধিক করে মনে পড়বে। সেই সময় তুমি কি করবে? তাই গুরূপদিষ্ট পথে চলে দেখ না, তোমার জ্বালা নিবারণ হয় কিনা! যখন তোমার 'বিষয়-বিষ' এই ভাব অনুভব হবে, তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। তখন জীবনের শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হবে, তখন আর ক'দিনই বা তুমি পাবে। তাই জীবনের মধ্যাবস্থা থেকেই প্রাণকর্ম করতে শুরু কর, অর্থাৎ কিশোর অবস্থা থেকে। কারণ তুমি

যোগীরত্ন শ্রী শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

ইতিহাস পরিলক্ষণ করলে দেখতে পাবে জগতে যত মুনী, ঋষিরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, সকলেই এই ছোটবেলা থেকে সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। যেমন— শঙ্করাচার্য্য, গৌতম বুদ্ধ, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা, তৈলঙ্গস্বামী ইত্যাদি। তবে জীবনের শেষ সময় এসে উপস্থিত হয়েছে বলে তোমার দ্বারা এই প্রাণক্রিয়া করা সম্ভব নয়, তা বলছি না। একান্ত ভক্তি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে এ জন্মেও তুমি উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হতে পার অথবা আপন আধার তৈরী করে রাখতে পার। তাই হে মনুষ্যরূপী জীব বিষয় চিন্তায় মত্ত না হয়ে আপন প্রাণকে গুরূপদিষ্ট পথে চালনা কর। "যা হচ্ছে হোক, আমি আপন গুরূপদিষ্ট পথরূপী তাঁর ক্রিয়া হতে কখনও চ্যুত হব না" এই মনোভাব মনের মধ্যে নিয়ে আস।

জীবন, যা আজ আছে, কাল হয়তো নেই! তা হলে কি হবে এই মোহ মায়ারূপী ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণিকের আনন্দরূপী বেড়াজালের মধ্যে আটবে থেকে! তোমার কি ইচ্ছা করে না এই সকল বন্ধন ছিন্ন করে গুরূপদিষ্ট পথে আপন প্রাণকর্ম করে প্রাণের উজ্জ্বলতা অনুভব করতে। তা তো তোমার জন্মগত অধিকার। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব বলতেন—"This is my birth right" এবং আমিও বলছি This is our and every one's birth right"।

**স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।**
**কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।৬০**
**ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।**
**ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।।৬১**
**তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।**
**তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২**
**ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।**
**বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩**
**সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।**
**ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪**

**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।**
**মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫**

**তাৎপর্য্যঃ**—(প্রকৃতির মধ্যে আমরা সর্বদা আবদ্ধ হয়ে আছি বলে সর্বদা মোহ-মায়ারূপ পাশে আমরা বাঁধা পড়ে আছি। সেহেতু এমন অনেক কাজ আমরা করে থাকি যা করবার জন্য আমাদের মন চায় না। হাজার অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও অবশের মতন সেই সকল কাজে ব্রতী হই এবং করিও। যখন সেই কাজ করে ফেলি, তখন স্মৃতিগোচরে আসে "এ কাজ তো আমি করতে চাইনি! তাহলে কেন এমন হল!" সর্বদা জানবে এ তোমার পূর্ব সংস্কারের দ্বারা অর্জিত কর্মফল যা তুমি করতে, না চাইলেও তোমাকে তা করতে প্রকৃতি বাধ্য করবে। তাই সাধক পুনরায় যাতে কর্মফল সৃষ্ট না হয় তার চেষ্টা কর এবং আত্মকর্মে ব্রতী হও।)

ঈশ্বর সকল জীবদেহের মধ্যে আপন মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন এবং জগৎ সংসারকে বোঝাচ্ছেন 'এ মায়া প্রপঞ্চময়' অথবা 'মম মায়া দুরত্যয়া' তাই আত্মকর্মের দ্বারা আপন সংস্কার তৈরী কর যাতে পরজন্মে এসে তোমাকে আর এইরূপ বদ্ধ আবর্তনের মধ্যে পড়তে না হয়।

তাই সর্বতোভাবে আপন প্রাণকে শ্রীগুরুর পদতলে ঢেলে দাও। তাতে ভালই হোক বা মন্দই হোক সেইদিকে তাকিও না। তিনি কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারেন না। তাঁর আত্মপ্রসন্নতার দ্বারা তুমি পরম শান্তি এবং যে স্থানে স্থিতি হলে ঐ স্থিতির আর শেষ নেই, সেরূপ স্থান তুমি প্রাপ্ত হবে। এই পরমশান্তি ও ঐ স্থিতির স্থান অত্যন্ত গোপনীয়, কারণ তা প্রাণকর্মরূপী আত্মক্রিয়া করে স্বয়ং নিজেকে জানতে ও বুঝতে হবে। সেই অব্যক্ত জ্ঞান কেউ ব্যক্ত করতে পারবে না। তাই জীব আপন মায়া ভ্রম থেকে প্রাণকর্মের দ্বারা গুরূপদিষ্ট পথে চলে নিজেকে মুক্ত কর। আর ইচ্ছার দাস হয়ে নতুন নতুন কর্মফল সৃষ্টি করো না। বোঝা টেনে টেনে অনেক চলেছ, এবার প্রাণকর্ম করে শান্ত হও।

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। কারণ আমি তোমার মধ্যে অবস্থান

করছি। তুমি আমারই অংশ, আপন পুত্রের জ্বালা পিতা কখনও দেখতে পারে কি? সর্বদা তোমার উপশমের জন্য আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি যদি আমায় না ডাক, আমায় না চাও, আমার সাহায্য তুমি যদি ফিরিয়ে দাও, তা হলে আমি কার কাছে যাব? তোমরা ছাড়া তো আমার কেউ নেই।

আমার পরমগুরুদেব যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, আমাদেরই কর্মফলরূপ কঠিন যন্ত্রণা আপন দেহে ধারণ করে, সেই তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বলে চলেছেন, "তোরা ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই রে।" যে পরমবান্ধব, যে পরমপ্রিয়, তাঁকেই আমরা সর্বদা অবহেলার চোখে দেখি। তাঁর রূপসকল সম্পর্কে আমরা বিদিত নই। সর্বদা নিজের অহঙ্কারই তাঁর কাছে প্রকাশ করে এসেছি। একবার ক্ষণিকের তরেও তাঁর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি নি। সর্বদা তাঁর কথার উপর নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাটিয়েছি।

তাই হে পরমপিতা পরমেশ্বর, আমাদের মতন স্বার্থপর পুত্র-কন্যারা তোমার উপস্থিতি আপন দেহে অনুভব করতে পারি নি এবং এখনও পারি না। কারণ সেই বিশ্বাস আমাদের নেই। সেইহেতু তুমি আমাদের পাপস্খালন করে তোমার দেওয়া কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তার ব্যবস্থা করে তোমার চরণে আমাদের মতন স্বার্থপরদের ঠাঁই দাও প্রভু। আমাদের মারো, বকো যা হোক করে তুমি তোমার মতন করে আমাদের গড়ে নাও প্রভু। কারণ তোমাতে নিমগ্নচিত্ত হতে না পারলে, তোমাতে বিভোর ভক্ত না হতে পারলে, তোমারই আত্মকর্মরূপ যজ্ঞে উপাসক হওয়া যায় না। যায় না তোমায় একটি প্রণাম করাও। যেখানে তুমিই হলে আত্মপ্রাপ্তির সারকথা, সেহেতু তোমাকে সবকিছু অর্পণ করতে না পারলে তোমাকে পাওয়া যায় না, তোমাকে চেনা যায় না। আমাদের মতন স্বার্থান্বেষী মানুষের দল নিজেদের কামনা-বাসনা থেকে প্রাপ্ত পাপের বোঝা শুধু তোমাকে অর্পণ করি, আর তুমি পিতারূপে সবকিছু নিজদেহে ধারণ করে আমাদের মতন জানোয়ারের অধমরূপী হাত-পা ওয়ালা পশুগুলোকে ভাল রাখ, সুস্থ রাখ। তোমার পুত্র বলার মতন, কন্যা বলার মতন যোগ্যতা আমাদের নেই, আছে শুধু আমাদের 'হাম বড়া' ভাব আর আঁতে ঘা লাগলেই ফোঁস

করার শব্দ। একবারও তো তোমার দিকে চেয়ে দেখি না যে আঘাতে আঘাতে তোমাকে কতখানি জর্জ্জরিত করে ফেলেছি। আমরা এমনই স্বার্থপর যে তুমি যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলে, তখনও নিজের কামনাকৃত বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বা তা থেকে উদ্ধার লাভ করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করেছি। একবারও বুঝতে চেষ্টা করিনি তোমার সেই রোগযন্ত্রণার কথা। উঁইপোকার মতন তোমাকে শুধু কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছি আমরা এবং তুমি নিঃস্বার্থরূপে ধূপের মতন নিজেকে পুড়িয়ে গেছ, শেষ করে গেছ নিজেকে। তাই তোমার কাজ, তোমাকেই আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কারণ এই জানোয়াররূপী মানুষরাই তোমার পুত্র-কন্যা। আমাদের এই স্বার্থপর মন নিয়ে তোমার কাজ করা, তোমায় ভালবাসা, তোমার চরণে মন নিবেদন করা শুধু মুখের কথাই হয়ে থাকে। মুখে বলি "তোমায় বড় ভালবাসি", কিন্তু আসল কথা আমাদের এই নিজস্ব দেহ ছাড়া, 'নিজের কি করে লাভ হয়' তা ছাড়া একবারও ক্ষণিকের তরেও তোমার কথা মনে করি না। এই পাপাসক্ত মন নিয়ে তোমাকে একটি নমস্কার করাও যায় না। তাহলে কি করে তোমার কাজ করব?

তাই, হে প্রভু পরমপিতা পরমেশ্বর, তোমার কাছে আমাদের মতন স্বার্থন্বেষী পুত্র-কন্যাদের এই প্রার্থনা যে "কামারের মতন তুমি আমাদের পিটিয়ে, গলিয়ে তোমার মনের মতন করে গড়ে নাও প্রভু।"

**(সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**
**অহং ত্বাং সর্ব্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬)**
**ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।**
**ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।।৬৭**
**য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।**
**ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** আমরা সদাসর্বদা ইন্দ্রিয়দের আশ্রয় করে আপন কর্ম করে থাকি আর আমাদের সকলের পাপ শ্রীগুরুদেব গ্রহণ করছেন। পরমপুরুষ শ্রীগুরুদেব বলেছেন "তুমি আমায় আশ্রয় করিয়া চল, তুমি আমায় পরিত্যাগ

করিও না, তুমি আমাতে আপন মন সমর্পন কর, আমিই তোমায় সকল পাপ, সকল তাপ, সকল ভবরোগ বন্ধন হতে মুক্ত করিব।" এমন অভয়বাণী কেউ কাউকে কখনও দিতে পারেন নি। ভক্ত শিষ্যদের দুঃখযন্ত্রণা, রোগ সকলকিছু আপন শরীরে ধারন করে শুধু তাঁরা নিজেদের ধূপের মতন পুড়িয়ে গেছেন, আর আমরা শুধু নিয়ে গেছি, দিতে পারিনি কিছুই। তাই হে স্বার্থপর মানুষরূপী ইচ্ছার দাস তোমাদের ধিক্-ধিক্-ধিক্।

আমরা মুখে ভালবাসার বড় বড় কথা বলে ভরং দেখাই। প্রকৃতই কি আমরা তাঁকে ভালবাসতে পারি? কখনই নয়। আপন ভালবাসা, আপন মন তাঁকে উজাড় করে দিলে তিনি আত্মধর্মহীনকে আত্মতত্ত্ব, ভক্তিহীনকে ভক্তি, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান, সাধককে পরমপদ প্রদান করেন। তিনিই হলেন সমগ্র গীতাশাস্ত্ররূপী গ্রন্থ। তিনি কখনই সাধারণ ব্যক্তিতুল্য নহেন। তাই হে অন্ধজীব— চোখ খুলে আপন প্রাণকে উত্তোলন করে দেখ তিনি তোমারই জন্য দুই বাহু তুলে দাঁড়িয়ে আছেন এবং শবরীর মতন তোমার প্রতীক্ষা করছেন। শুধু তোমার একটি মনের গহন কন্দর থেকে নিঃসৃত ভালাবাসার ডাক শোনার জন্য। তোমারও কি ইচ্ছা করেনা তাঁকে পিতা বলে ডাকতে, তাঁর সঙ্গে মিশতে, তাঁকে আপন প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে। যদি করে, হে স্বার্থান্বেষী মানব সকল, আপন মেরুদন্ড সোজা করে তাঁর দেখানো পথে ব্রতী হও। তাহলে তোমার দেহের মধ্যে তুমি ভক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে এবং তোমার মনের মধ্যে সকল সংশয়ের বিনাশ হয়ে পরমাত্মারূপী পিতাকে প্রাপ্ত হবে।

**ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।**
**ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯**
**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্মং সংবাদমাবয়োঃ।**
**জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০**
**শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।**
**সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পূণ্যকর্ম্মণাম্।।৭১**
**কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।**

**কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমপিতারূপী পরমেশ্বর গুরদেবই হলেন স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ। তিনিই একমাত্র পারেন পরমতত্ত্ব সাধককে বুঝিয়ে দিতে। জগৎ সংসারের আর কেউ তা পারবে না। তিনিই হলেন আমাদের কাছে সব থেকে প্রিয় এবং আপনজন, তিনিই হলেন আমাদের চিরবান্ধব, হৃদয়ের নাথ। তাঁর চেয়ে প্রিয় জগতে আর কেউ নেই। তাঁর চেয়ে ভাল কেউ কখনও কোনদিন আমাদের বাসতে পারবে না। কারণ তাঁর ভালবাসা নিঃস্বার্থ এবং পবিত্র; সে ভালবাসায় এতটুকু খাদ নেই। তাই হে পরমগুরুদেব — তুমিই আমার অধিক প্রিয় — তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই।

আত্মকর্মের দ্বারা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর এই পথ যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সকল ব্যক্তি হাজার দোষে দোষী হলেও এই কর্মের দ্বারা আপন পাপমুক্ত করে পবিত্রলোকে আসন স্থাপন করতে পারেন। তাঁর নির্দিষ্ট পথে আপন প্রাণকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পার, তাহলে অজ্ঞানজনিত মোহ হতে তুমি মুক্তি পেতে পারবে।

**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।**
**স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩**
**ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।**
**সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪**
**ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।**
**যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫**

**তাৎপর্য্যঃ—** তোমার পথে চললে অর্থাৎ শ্রীগুরূপদিষ্ট পথে চললে দেহস্থিত মোহ নষ্ট হয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। সেই আত্মজ্ঞান শ্রীগুরুর দ্বারা প্রাপ্ত হলে দেহস্থিত সকল ইন্দ্রিয়-আসক্তি, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল ভয়, সকল তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়। তখন তাঁর প্রসাদে আত্মপ্রসন্ন করে সংশয়শূন্য হয়ে স্থির হতে সমর্থ হওয়া যায়। তাই আদেশ পালন করাই হল প্রত্যেক সাধক ও সাধিকার

একান্তরূপে কর্ত্তব্য। (হে গুরুদেব পরমপিতা — তোমার আদেশ যেন সঠিক ভাবে পালন করে সকল কাজ সমাপন করতে পারি। তোমার দেওয়া কাজ সমাপন করে যেন এই দেহত্যাগ করতে পারি। তুমি আমায় এই আশীর্বাদ কর প্রভু। তোমার সঙ্গে যেন জন্ম-জন্মান্তর যুক্ত হয়ে থাকতে পারি এবং ভবিষ্যতে যদি আবার জন্মগ্রহণ করি — তাহলে তোমাকেই যেন পরমপিতা, পরমবন্ধু, পরম আপনজন রূপে পাই)

তুমিই হলে সকল যোগী-ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টি স্বরূপ। তোমার প্রকাশেই তাঁরা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তুমি হলে পরমগুহ্য যোগস্বরূপ, কূটস্থচৈতন্যে তুমি যোগেশ্বর রূপে আপন প্রকাশ ঘটিয়ে যোগতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব সাধককে প্রদান কর এবং সাধককে তোমার আপন তত্ত্ব সম্পর্কে বিদিত করে তুমি তাকে পরমপদ প্রাপ্ত করাও, হে যোগীবর তোমায় নমস্কার।

**রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।**<br>
**কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং, হৃষ্যামি, চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬**<br>
**তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।**<br>
**বিস্ময়ো মে মহান রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭**<br>
**যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।**<br>
**তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম।৭৮**

**তাৎপর্য্যঃ—** পরমপদ সাধকের শ্রীগুরুর দ্বারা প্রাপ্ত হলে সে তাঁর সেই রূপসকল দেখে বা 'পরম আমি'র স্বরূপ দর্শন করে, তাতেই চিত্তের সকল চঞ্চলতা দমন করে থাকেন। তখন সেই ধ্যানেই — সেই অবস্থাতেই মন অধিক বদ্ধ করতে ইচ্ছা করে। তখন সাধকের মনো মধ্যে —

"গুরু জ্ঞান, গুরু ধ্যান<br>
গুরু চিন্তামণি,<br>
গুরু বিনা আমি যেন<br>
মণিহারা ফণী।"

এইরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। চক্ষুতে বা কূটস্থে বায়ু স্থির করতে পারলে সেই স্থির-সৌন্দর্য্যময় সর্বজয়ী অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ঐ সৌন্দর্য্যময় স্থির অবস্থা হল স্থিরপ্রাণশক্তিরূপিনী পরাপ্রকৃতি রাধার প্রকাশ। গুরূপদিষ্ট পথে চিরস্থায়ী আত্মসম্পদ প্রাপ্ত হলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম পালনে একনিষ্ঠ হলে পরমগুরুদেবের আত্মপ্রসন্নতা হেতু তুমি তাঁর রূপসকল সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে এবং মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

।। ইতি মোক্ষযোগ সমাপ্ত ।।

**—ঃ ইতি অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ঃ—**

ওঁ শ্রী গুরুকৃপাহি কেবলম্।

**শ্রী গুরুর পাদপদ্ম একমাত্র ভরসা।**

**ওঁ জয়গুরু, ওঁ জয়গুরু, ওঁ জয়গুরু।।**

**—ঃ সমাপ্ত ঃ—**

*******

*****
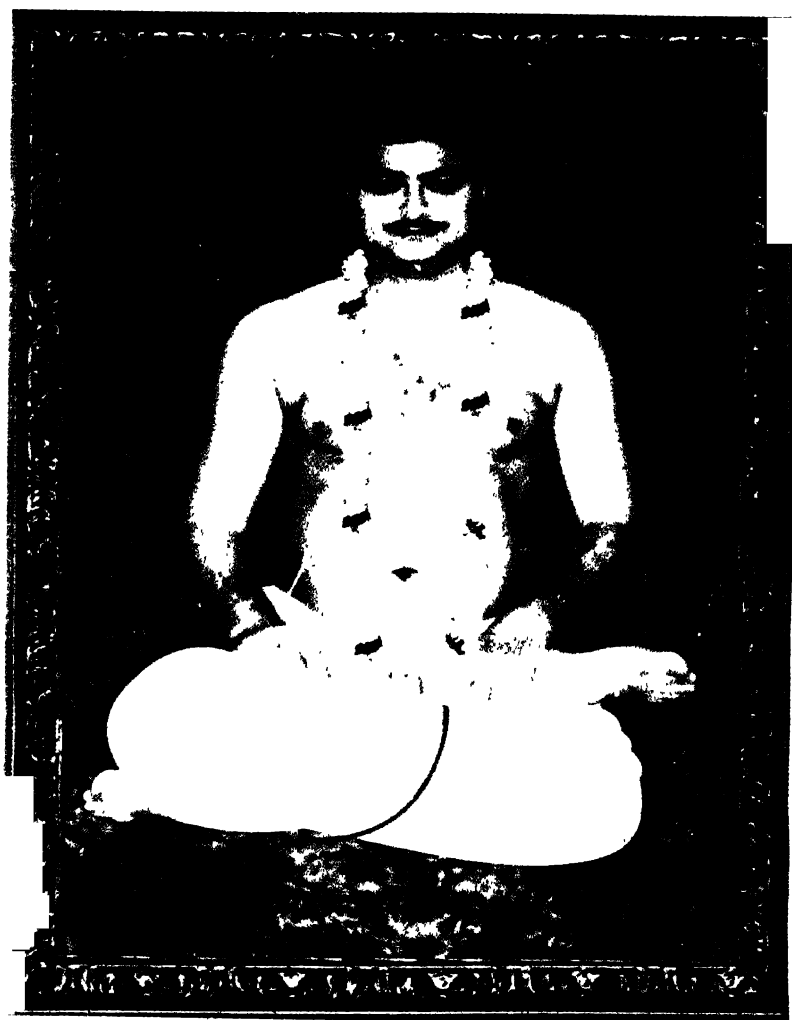
শ্রী সুদীপ কুমার ব্যানার্জ্জী

# শ্রী শ্রী গীতামাহাত্ম্যম্

## ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়ঃ।

### —ঃ গুরু কৃপাহি কেবলম্ ঃ—

পরব্রহ্ম স্বরূপ পরমপিতা শ্রী শ্রী গুরুদেবই হলেন স্বয়ং জ্বলজ্যান্ত গীতা, সাধারণ মানুষকে মোহ মায়ার হাত থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি জীব সকলের ত্রিনয়ন বা তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে তাকে তাঁর স্বরূপ দেখান। তাই তাঁকে তাঁরই উপদিষ্ট পথে তাঁর দেওয়া আত্মকর্মের দ্বারা লাভ করলে; তবেই সাধকরূপে সাধনা করে তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

প্রত্যহ তাঁর দেওয়া কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে দুইবেলা পালন করতে পারলে এবং তাঁর পদতলে পুষ্প স্বরূপ আপন ভক্তি, বিল্বপত্র স্বরূপ শ্রদ্ধা ও চন্দন স্বরূপ ভালবাসা প্রদান করতে পারলে ও তাঁর মুখ নিঃসৃত সকল আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে, তবেই প্রকৃত রূপে গীতা পাঠ করা সম্ভব হয়ে থাকে। প্রাণকর্মের দ্বারা তাঁর প্রকৃত সেবা করলে তবেই তাঁর রূপসকলের মাহাত্ম্য সাধকের দ্বারা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন সাধকের দ্বারা সম্ভব হলে সাধক সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এইভাবে সঠিকরূপে তার গুরুসেবা বা গীতাপাঠ সুসম্পন্ন হয়ে, তিনি তাঁর মাহাত্ম্য সকল উপলব্ধি করতে পারেন এবং সকল পুণ্যফলরূপ তাঁর পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে সাধক বিশেষ সুখ ও শান্তি লাভ করে।

এই প্রাণকর্ম করবার জন্য কোন বিশেষ পদবী বিশিষ্ট ব্যক্তির বা কোন সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ নেই, অর্থাৎ সকল শ্রেণীর সকল ধর্মাবলম্বীর লোক তাঁর সাধনা করতে পারেন। এই প্রাণকর্মের মধ্যে কোন উচ্চ নীচের ভেদ নেই।

পরব্রহ্ম স্বরূপ গুরুদেবই হলেন স্বয়ং এই প্রাণকর্ম। তাঁর কোন জাতি

নেই, কোন ধর্ম নেই। তিনি সকল দেহে প্রাণের উজ্জ্বলতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। পরমপদ স্বরূপ গুরুদেবই হলেন জ্বলন্ত গীতা। তাঁর সকল আদেশ উপদেশ শুনে প্রাণকর্ম করাই হল সকল সাধকের একান্ত কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুর সকল আদেশ উপদেশ বিশেষ আন্তরিকতার সাহায্যে শুনে তাঁর কাজে ব্রতী হন এবং সকল কাজ বা ক্রিয়া বা আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, তাদের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের বিশেষ কৃপা লাভ করা সম্ভবপর হয়। এরফলে ব্যক্তি সকল পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। আর যে সকল ব্যক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না, তারা পরজন্মের জন্য এ জন্মে আধার প্রস্তুত করে যান এবং পরজন্মে মনুষ্য দেহ ধারণ করেই আসেন ও সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হয়ে তাঁর এই কাজ বা ক্রিয়া করে পুনরায় সেই পূর্ব জন্মকৃত অবস্থা অল্প সময়ের মধ্যেই লাভ করেন। এর পর শ্রীগুরুদেবের দ্বারা সাধক ঐ জন্মে পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হতে পারেন।

যে সকল ব্যক্তি তাঁর অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আদেশ, উপদেশ মেনে চলেন না তাঁর প্রতি অবহেলা ও অছেদ্দা দেখান, তাদের দ্বারা প্রাণকর্ম হয় না। এই সকল ব্যক্তি মহাপাপে আবিষ্ট হয়ে, নরকরূপী তমোগুণের মধ্যে অবস্থান করে, আপন প্রাণ ত্যাগ করেন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্ম গ্রহণে সেই সকল ব্যক্তিগণ পশুযোনী প্রাপ্ত হন।

যে সকল ব্যক্তি প্রাণকর্ম না করে পাঠ্য পুস্তক পড়ে তার থেকে গীতার শ্লোক সকল উচ্চারণ করে নিজেকে সবজান্তা পণ্ডিত ব্যক্তি বলে পরিচয় দেন, সেই সকল ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি নন।

প্রাণকর্ম না করবার জন্য তাদের এই শ্লোক উচ্চারণ এবং তার ব্যাখ্যা বৃথা চিৎকার রূপে পরিগণিত হয়। শ্রীশ্রীপরমপদরূপী গুরুদেবের আদেশ উপদেশ মেনে যে সকল ব্যক্তি প্রাণকর্ম করতে পারেন সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা ইহলোকরূপী সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই প্রাণকর্মের দ্বারা আপন প্রাণকে শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করতে পারলে তাঁর দ্বারায় পরমপদ সাধক প্রাপ্ত হয়ে মুক্তাবস্থা লাভ করেন।

প্রাণকর্মই হল শ্রীগীতার তত্ত্ব এবং পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবই হলেন স্বয়ং শ্রীগীতা গ্রন্থ স্বরূপ। আমার শ্রী শ্রী পরম দয়াল গুরুদেব বলতেন "গীতা হল প্রাণকর্মের Theory এবং প্রাণকর্ম হল Practical."।

তাই গীতারূপী শ্রী শ্রী গুরুদেবের সকল আদেশ উপদেশ মেনে যদি প্রাণকর্মীরা প্রাণকর্ম করতে পারেন তাহলে শ্রীগুরুদেবের কৃপার দ্বারায় ঐ প্রাণকর্মীরা প্রথমে সাধক, তারপর তপস্বী এবং তাঁর আলোকমঞ্জরীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞানী হন। এরপর তাঁর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন এবং এই তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে প্রাণকর্মী স্বয়ং 'তিনিময়' হয়ে যান।

তাই প্রাণকর্মের দ্বারাই আপন শ্রীগুরুদেবকে তত্ত্বতঃ জানা সম্ভব হয়। এরপর তত্ত্বাতীত স্থানে অবস্থান করে পরমপদ প্রাপ্তির দ্বারায় তাঁর রূপ সকল সম্পর্কে জানতে পারেন।

তাঁকে জানলেই সকল জানার শেষ; তাঁকে চিনলেই সকল চেনার শেষ; তাঁতে মিশলেই সকল মেশার শেষ হয়ে থাকে।

তাই প্রাণ কর্মের দ্বারা আপন দেহস্থিত চঞ্চলপ্রাণকে শ্রীগুরুর চরণে লয় করতে পারলে তবেই তাঁর বা গীতার মহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। নচেৎ তা অবগত হওয়া সম্ভব হয় না।

# ।। ওঁ শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ ।।

**ওঁ অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্।**

**তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।**

**গুরু বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্।।**

**বন্দে শ্রীগুরু** **জয় শ্রীগুরু**

তোমার শ্রীপদে নমস্কার;
মহামহিম মহিমার্ণব
মহিমার নাহি পারাপার।
গোলকবিহারী নররূপ ধরি
অধম জনারে তরাতে;
এসেছ জগতে প্রেম বিলাতে
তুমি গো প্রেমের অবতার।
চৈতন্যরূপেতে আছ অন্তরেতে
শ্রীগুরুমূরতি ধরি;
মানব আকারে প্রকাশ বাহিরে
সাজায়ে রেখেছ কর্ণধার।
দয়া কর যারে ওগো দয়াময়
সে চিনিতে তোমায় পারে;
যতেক বন্ধন হয় গো খণ্ডন
চিরতরে কাটে অন্ধকার।
ডাকিছে কাতরে এ দাস তোমারে
পড়েছে অগাধ জলে;
হাবুডুবু খায় নাজানি সাঁতার
দিয়ে চরণতরী করো পার।

ভবসাগর - তারণ কারণ হে

রবি নন্দন - বন্ধন খণ্ডন হে।

শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

হৃদি-কন্দর - তামস - ভাস্কর হে

তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।

পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

মন বারণ - শাসন - অঙ্কুশ হে

নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।

গুণগান - পরায়ণ দেবগণে

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে

সুখ - শান্তি - বরাভয় - দায়ক হে।

ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

অভিমান - প্রভাব - বিমর্দ্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
তব নাম সদা শুভ সাধক হে
পতিতাধম - মানব - পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
জয় সদগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে
ভব - রোগ - বিকার বিনাশক হে.
মন যেন রহে তব শ্রী চরণে
গুরুদেব দয়াকর দীন জনে।।

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু